হাকিকাত কিতাব প্রকাশনী :৬

ইসলামের শত্রুদের জন্য জবাব

আল্লামা হুসাইন হিলমী ইশিক (র.)

হাকিকাত কিতাবেভি প্রকাশনা : ৬

ইসলামের শত্রুদের জন্য জবাব

এই বইটি মিসরের আলেম ছদ্মবেশধারী রশীদ রেযা নামের এক লা-মযহাবী/‘সালাফী’র লিখিত ‘মুহাওয়ারাত’ পুস্তকের খণ্ডনে রচিত; ওই পুস্তকে সে ইসলামী উলামাবৃন্দের প্রতি কুৎসা রটনা করেছিল।

আল্লামা হুসাইন হিলমী ইশিক (র.)

[ইমাম দারিমী (রহ:) বর্ণনা করেন মহানবী (দ:)-এর হাদীস: “জেনে রেখো, (সৃষ্টিকুলে) মন্দের মাঝে সবচেয়ে মন্দ হচ্ছে ‘উলামা’(বদমায়েশ আলেম); আর সেরার মাঝে সেরা হলেন উলামা-এ-হক্কানী-রব্বানী (বুযূর্গানে দ্বীন)।” এই হাদীসটি ইমাম মোজাদ্দেদে আলফে সানী (রহ:) নিজ মকতুবাত শরীফের ১ম খণ্ডের ৫৩তম পত্রে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন]

প্রকাশকের কথা:

যদি কেউ ইচ্ছে পোষণ করেন, কিতাবটির সঠিক ভাবে অন্য ভাষায় অনুবাদ করবেন কিংবা প্রকাশ করবেন আমাদের অনুমতির কোনই প্রয়োজন নেই। যারা এই মহৎ কাজে আমাদের সাহায্য করেছেন তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে রহমত প্রার্থনা করছি, আমাদের শুভকামনা এবং ধন্যবাদ তাদের জন্য। যাই হউক অনুমূতি এই সাপেক্ষে দেয়া হচ্ছে যে, প্রকাশনা অবশ্যই উন্নতমানের হতে হবে, লেখার নকশা এবং ধারা বিন্যাস সঠিক এবং পরিপূর্ণভাবে হতে হবে, কোন ভুল ছাড়াই।

মন্তব্য: মিশনারিরা খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচার করছে, ইহুদিরা তাদের ইহুদি রাব্বিস এর ধারণা ছড়ানোর জন্য কাজ করছে। ইস্তানবুলের হাকিকাত কিতাবেভি মানুষের কাছে ইসলাম পৌঁছানোর কাজ করছে। আর ভন্ডরা ইসলামের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। একজন বিজ্ঞ, জ্ঞানী এবং সচেতন মানুষ বুঝতে পারবেন কোনটি সঠিক পথ এবং তা মানবতার কাছে পৌঁছানোর জন্য সাহায্য করবেন। এটির চেয়ে ভালো এবং মূল্যবান কোন উপায় নেই মানবতার সাহায্য করার জন্য।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মুখবন্ধ

আল্লাহতা'লা পৃথিবীর সকল মানবের প্রতি দয়াশীল। তিনি সবার প্রতি প্রয়োজনীয় ও উপকারী জিনিসগুলো মঞ্জুর করেন। তিনি-ই ক্ষতি থেকে বাঁচার এবং সুখ-সমৃদ্ধি অর্জনের পথপ্রদর্শন করে থাকেন। পরকালে গুনাহগার ঈমানদার যাদের ভাগ্যে জাহান্নাম নির্ধারিত, তাদের মধ্যে যাদেরকে তিনি চাইবেন বেহেশ্তে দাখিল করে দেবেন। একমাত্র তিনি-ই সকল জীবিত সত্তার স্রষ্টা; তিনি-ই সকল সত্তাকে প্রতিটি মুহূর্তে অস্তিত্বশীল রাখেন এবং বিপদ-আপদ থেকে রক্ষাও করেন। ওই মহাসম্মানিত আল্লাহতা'লার পবিত্র নামে আস্থা রেখে আমরা এই বই লেখা আরম্ভ করলাম।

আমরা সালাত ও সালাম জানাই আল্লাহতা'লার সবচেয়ে প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি। অতঃপর আমাদের সালাওয়াত রইলো রাসূলে পাক (দ:)-এর খাঁটি আহলে বায়ত (পরিবার-সদস্যবৃন্দ) এবং প্রত্যেক ন্যায়বান ও নিবেদিতপ্রাণ সাহাবী (রা:)-এর প্রতিও।

আল্লাহ পাক তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রতি করুণাশীল। তিনি এরাদা (ইচ্ছে) করেন যে সমগ্র মানবকুল এই পৃথিবীতে সুখ-শান্তিতে বসবাস করবে এবং পরলোকে অনন্ত জীবন দ্বারা আশীর্বাদধন্য হবে। এই নেয়ামত (আশীর্বাদ) অর্জনের জন্যে তিনি তাদেরকে ঈমান স্থাপন করতে আদেশ করেন, মুসলমান হতে বলেন; তিনি তাদেরকে মহানবী (দ:) ও তাঁর সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর পথ ও মত অনুসরণ করতে নির্দেশ দেন; আর পরস্পর পরস্পরকে মহব্বতসহ সহায়তা করতেও বলেন। রাসূলুল্লাহ (দ:) এরশাদ ফরমান: **"অন্ধকার আকাশে তারকারাজি যেভাবে পথ দেখায়, তেমনি আমার সাহাবীবৃন্দও কল্যাণের পথপ্রদর্শক। তোমরা তাঁদের যে কাউকে অনুসরণ করলেই কল্যাণপ্রাপ্ত হবে।"** সকল সাহাবী (রা:)-ই মহানবী (দ:)-এর কাছ থেকে পবিত্র কুরআন শিক্ষা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁরা যখন বিভিন্ন দেশ ঘুরেন, তখন তাঁরা যা শিখেছিলেন তা-ই প্রচার করেন। রাসূলুল্লাহ (দ:) থেকে তাঁরা যা যা শুনেছিলেন, তাতে তাঁরা নিজেদের ধ্যান-ধারণা সন্নিবেশিত করেন নি। এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামী উলামাবৃন্দ-ও তাঁদের বইপত্রে সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) থেকে যা কিছু শুনেছিলেন, হুবহু তা-ই লিপিবদ্ধ করেন। এ সকল বিদ্বান ব্যক্তিকে '**আহল আস্ সুন্নাত-এর উলামা-এ-কেরাম' (উলামায়ে আহলে সুন্নাত)** বলা হয়। পরবর্তী সময়কালে এমন কিছু আলেমের আবির্ভাব হয়, যারা ইসলামের এ সকল শিক্ষায় নতুন বিষয় সংযোজন করে। এরা গ্রীক দার্শনিকদের ধ্যান-ধারণা, ইহুদী ও খৃষ্টানদের বানোয়াট কাহিনী এবং বিশেষ করে বৃটিশ গুপ্তচরদের তৈরি মিথ্যের সংমিশ্রণ করে। নিজেদের যুগের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার যতোটুকু তারা আহরণ করতে পেরেছিল, তার সাথে ব্যক্তিগত মতামত যোগ করে এই সব আলেম নতুন ধরনের ধর্মীয় জ্ঞান আবিষ্কার করে বসে। 'ইসলামী আলেম'-এর নামে বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে তারা ধর্মের ভেতর থেকে একে ধ্বংসের অপপ্রয়াস পায়। এদের মধ্যে যারা 'নস' তথা সুস্পষ্ট আয়াত ও হাদীসকে পরিবর্তন করতে চেষ্টা করেছিল, তারা **কাফের** তথা অবিশ্বাসীতে

পরিণত হয়। যারা গোপন বা ভেদের রহস্যপূর্ণ 'নসের' অপব্যাখ্যা দিতে অপতৎপর হয়, তাদেরকে **বেদআতী ফেরকাহ** তথা ধর্মে নতুন বিষয় সংযোজনকারী দল বা গোষ্ঠী আখ্যা দেয়া হয়। মুসলমান নাম নিয়ে এ ধরনের বেশ কিছু বেদআতী দলের আবির্ভাব ঘটেছে। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বৃটিশরা কুফরী ও গোমরাহীর নতুন নতুন দলের সৃষ্টি করছে এবং মৌলিক ইসলাম ধর্ম বিনাশের অপচেষ্টা করছে। বর্তমানে মুসলমান বিশ্ব মূলতঃ তিনটি দলে বিভক্ত: আহল্ আস্ সুন্নাহ (সুন্নী), শিয়া ও ওয়াহহাবী। এদের আকীদা-বিশ্বাস একে অপর থেকে ভিন্ন। যেহেতু তাদের মধ্যকার এই পার্থক্য দ্ব্যর্থবোধক বা অবোধগম্য 'নস' তথা আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যাগত বিভিন্নতা থেকে সৃষ্ট এবং যেহেতু তারা কেউই সুস্পষ্ট অর্থবোধক 'নস'কে অস্বীকার করে না, সেহেতু তারা একে অপরকে 'কাফের' আখ্যা দেয় না। তথাপি তারা পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করে। প্রকৃত মুসলমান যাদেরকে আহল্ আস্ সুন্নাহ বলা হয়, তাদের উচিত পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখা এবং একে অপরকে সাহায্য করা; একে অপরের প্রতি মোলায়েমভাবে কথা বলা বা লেখা; আর যদি পরস্পর পরস্পরকে সতর্ক করতেও হয়, তাতেও কারো ক্ষতি না করে তা করা; এবং পারস্পরিক সহযোগিতার পাশাপাশি নরম ভাষায় ও লেখায় একে অপরকে উপদেশ দেয়া। মুসলমানদের উচিত একে অপরকে সাহায্য করার সাথে সাথে মানব জাতিকেও সহায়তা করা; আর ইসলাম ধর্মের সুন্দর নীতি-নৈতিকতা পালন করে ফিতনা (অনৈক্য-বিবাদ) একদম পরিহারও তাদের জন্যে অবশ্য করণীয়। তারা যে দেশে বসবাস করে, সে দেশের আইন লঙ্ঘন করা বা বিদ্রোহ করা তাদের উচিত নয়; কিংবা কারো জীবন, মালামাল/সম্পত্তি বা সততাকে আক্রমণ করাও তাদের উচিত নয়। প্রত্যেক মুসলমানের এ সব গুণ থাকা চাই। আমাদের সমস্ত কথা, লেখনী ও ক্রিয়া/কর্ম ইতিবাচক ও সহযোগিতামূলক হওয়া চাই। দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, ধর্ম ও মানবতার শত্রু কিছু নিচু জাতের লোক, যারা কেবল নিজেদের স্বার্থ ও অভিলাষের কথা ভাবে, তারা মুসলমানের ছদ্মবেশে, এমন কি ধর্মীয় পদধারীর ছদ্মবেশেও মুসলমানদেরকে বিভক্ত করার অপচেষ্টায় রত। বৃটিশ গুপ্তচরদের বানানো যতো মিথ্যে, সবই তারা প্রচার করে বেড়াচ্ছে। ধর্মের মধ্যে সংস্কার সাধনের কথা বলে ইসলামকে তারা কলুষিত করতে চাচ্ছে। পক্ষান্তরে, অপর দুই বড় শত্রু, অজ্ঞতা ও অলসতাও জ্ঞানী ও ইসলাম অনুসরণকারী হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ কাজ করে, যার ফলে সঠিক পথ ও ভ্রান্ত মত, ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। উদাহরণস্বরূপ, মিসরে কর্তব্য পালনরত উসমানীয় তুর্কী গভর্নর (প্রাদেশিক শাসনকর্তা) মোহাম্মদ আলী পাশা ছিলেন ভাল ও পুণ্যবান ব্যক্তি। তাঁর উত্তরসূরীরা কিন্তু তা ছিল না। ধর্মীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব অযোগ্য লোকদের কাঁধে ন্যস্ত হয়। আবদুহু নামের জনৈক ফ্রি-ম্যাসন (ফ্রী-ম্যাসন গোষ্ঠী হচ্ছে অন্তর্ঘাতী শত্রু)-কে জামে' আল-আযহার মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা বোর্ডের দায়িত্বে বসানো হয়; অথচ এই মাদ্রাসা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলমানদেরকে শিক্ষিত করে তুলেছে। স্কচ ফ্রী-ম্যাসন গোষ্ঠী মিসরীয় মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিক ও আত্মিকভাবে ধ্বংস করতে থাকে। এই ফ্রী-ম্যাসনদের সাহায্যেই বৃটিশরা উসমানীয় তুর্কী সাম্রাজ্যকে ভেতর থেকে ধ্বংস করে দেয়। ফ্রী-ম্যাসন মোস্তফা রশীদ পাশার শিষ্য প্রধান উজির আলী পাশা ১২৮৪ হিজরী/১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ সালে সার্বীয়দের হাতে বেলগ্রেড দূর্গের চাবি তুলে দেয়। এই প্রধান উজির তার সহ-ফ্রী-ম্যাসন জামালউদ্দীন আফগানীকে ইস্তাম্বুলে নিয়ে আসে এবং তারা একযোগে ইসলামের প্রতি অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতায় জড়িয়ে পড়ে। তারা ফিতনা সৃষ্টিকারী অনেক বইপত্র-ও লিখে।

কায়রোর মুফতী আবদুহুর শিষ্য রশীদ রেযা **'মুহাওয়ারাত আল-মুসলিহ্ ওয়াল্ মুকাল্লিদ'** শিরোনামে একখানা বই লিখে, যা ১৩২৪ হিজরী/১৯০৬ খৃস্টাব্দ সালে প্রকাশিত হয়

(ইস্তাম্বুলের সোলায়মানিয়া লাইব্রেরীর ইযমিরলী শাখায় ৮১০ নং কল নম্বরে ৪০৭ পৃষ্ঠার এই বইটি রক্ষিত)। সে এই পুস্তকে একজন মাদ্রাসা-শিক্ষিত ওয়ায়েয (মুসলমান ধর্মপ্রচারক) এবং একজন আধুনিকতাবাদী ধর্ম সংস্কারকের মধ্যকার (কাল্পনিক) আলাপ তুলে ধরেছে, যাদের বক্তব্য দ্বারা সে নিজেরই ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করেছে। ধর্ম সংস্কারককে সে তরুণ, সংস্কৃতিবান, আধুনিক, উপলব্ধি করার আগ্রহ তীব্র ও যুক্তিতে তীক্ষ্ণ হিসেবে উপস্থাপন করেছে; অপর দিকে ধর্ম প্রচারককে উপস্থাপন করেছে গোঁড়ামিপূর্ণ, অনুকরণশীল, বোকা ও শ্লথ চিন্তা-ভাবনাকারী ব্যক্তি হিসেবে। অতঃপর সে ধর্ম সংস্কারকের মুখ দিয়ে ধর্ম প্রচারককে উপদেশ-বাণী বিতরণ করেছে এবং তাঁর মাঝে অনবধানতা থেকে অবধানতায় ফেরার এক অনুভূতি প্রদর্শন করেছে। রশীদ রেযা তার এ বইতে বলে সে উপদেশ দিচ্ছে, কিন্তু আদতে সে ইসলামী উলামাবৃন্দকে আক্রমণ করেছে। এরই বিপরীতে সে গোমরাহ-পথভ্রষ্ট, যিনদিক (মোনাফেক) ও মুলহিদ (বিভ্রান্ত মুসলমান) ব্যক্তিবর্গকে গভীর জ্ঞানী আলেম হিসেবে উপস্থাপন করেছে। ধূর্ততা ও সম্পূর্ণ ফ্রী-ম্যাসন চিন্তাধারায় লিখিত এই বইটি সহজ ও সরল বিশ্বাসী তরুণ সম্প্রদায়কে ফাঁদে ফেলার ঝুঁকি বহন করে। উসমানীয় তুর্কী ধর্ম অধিদপ্তরের প্রধান কর্মকর্তা হামদী আকসেকী, যিনি সে সব তুর্কীদের একজন যারা আবদুহু ও তার শিষ্যদের এই সব ধোকাপূর্ণ বইপত্র পাঠ করে বিভ্রান্ত হন, তিনি রশীদ রেযার বইটি তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং তাতে দীর্ঘ একটি মুখবন্ধ লিখে তুর্কী সংস্করণের নাম দেন **মযাহিবীন তালফিকী ওয়া ইসলামিন বির নকতাএয়া জামী**'; বইটি ১৩৩৪ হিজরী/১৯১৬ সালে ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক ইযমিরলী ইসমাইল হাক্কী নামের আরেক ধর্ম সংস্কারক এই অনুবাদটির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এর ব্যাপক প্রচারও করেন। কিন্তু সুলতান আবদুল হামীদ খান ২য়-এর শাসনামলের প্রকৃত ইসলামী জ্ঞান বিশারদগণ উপলব্ধি করেন যে এই বইটি অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে, তাই তাঁরা এর প্রচার-প্রসার রোধ করেন। আর আজকে আমরা আবারও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এই মর্মে যে যুব ও তরুণ সমাজ এই বিষাক্ত বইটি এবং এর মতো অন্যান্য ক্ষতিকর বইপত্র পড়ে ইসলামী উলামাবৃন্দ ও চার মযহাবের ইমামগণের মাহাত্ম্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে। আমরা আমাদের বিভিন্ন পুস্তকে ইতোমধ্যেই লিখেছি যে চার মযহাবের যে কোনো একটির তাকলিদ মান্য করা বা অনুসরণ করা সঠিক এবং লা-মযহাবী মতবাদের অনুসরণ করা গোমরাহী (পথভ্রষ্টতা)।

অমুসলমান বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজেদের শিক্ষক ও পিতা-মাতাকে অনুসরণ করে এবং ইসলামের বিধি-বিধান তথা আদেশ-নিষেধ মানে না; এটি তারা করে তাদেরই ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের কারণে। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায় এ সকল আইন-কানুনকে আঁকড়ে ধরেন। অনুরূপভাবে, লা-মযহাবী/'সালাফী' গোষ্ঠী নিজেদের পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের কাছ থেকে গৃহীত ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের দরুন এ সকল বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকারী চার মযহাবের কোনো একটিকে অনুসরণ করে না। অথচ প্রকৃত মুসলমানগণ, যাঁদেরকে আহল্ আস্ সুন্নাহ নামে সম্বোধন করা হয়, সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) ও মযহাবের ইমামবৃন্দ হতে প্রাপ্ত জ্ঞানের ওপর ভিত্তিশীল তাঁদের সঠিক ঈমানের কারণে তাঁরা চার মযহাবের কোনো একটিকে অনুসরণ করেন। সুন্নী মুসলমান সমাজ এমন বিষয়ের তাকলিদ (অনুকরণ/অনুগমন) করেন যা সঠিক। এক্ষণে আমরা নির্মল আত্মার তরুণ বয়সী দ্বীনী ভাইদের সামনে **'মুহাওয়ারাত'** পুস্তকটির পরিবেশিত সমস্ত মিথ্যে ও কুৎসা প্রকাশ করার কথা মনঃস্থির করেছি, যে বইটি অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে লেখা হয়েছে, যাতে মুসলমানদেরকে ধোকা দিয়ে সঠিক তাকলিদ থেকে সরিয়ে ভ্রান্ত মতের অনুসরণে প্রবৃত্ত করা যায়। আমরা এ সব মিথ্যে ও কুৎসার প্রত্যেকটির জবাব আহলে সুন্নাহ'র আলেম-উলেমাবৃন্দের বইপত্র থেকে প্রদান করবো এবং অন্তহীন পারলৌকিক অকল্যাণ ও অশান্তি হতে মুসলমান সমাজকে

রক্ষা করার মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্রতী হবো। এরই ফলশ্রুতিতে **’ইসলামের এক শত্রুর প্রতি জবাব’** বইটির কাজ সুসম্পন্ন হয়। এই বই লেখার একনিষ্ঠ উদ্দেশ্য ও মুসলমান ভাইদের প্রতি এই ক্ষুদ্র খেদমতকে আমরা আমাদের গুনাহ মাফের মাধ্যম মনে করি এবং একে আল্লাহতা’লার অশেষ রহমতের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও অন্যতম অসীলা হিসেবে বিবেচনা করি।

আমরা আশা করি, ধর্মীয় পদে আসীন আমাদের তরুণ বয়সী মুসলমান ভাইয়েরা রশীদ রেযার মিথ্যাচার ও কুৎসাগুলো এবং আহলুস্ সুন্নাতের উলেমাবৃন্দ কর্তৃক সেগুলোর খণ্ডন মনোযোগসহ পড়বেন; অতঃপর এ ব্যাপারে সুস্থ বিবেক দ্বারা বিচার করবেন এবং সত্য উপলব্ধির পর তা আঁকড়ে ধরবেন; ভ্রান্ত মতকে জানার পর তাতে আর বিশ্বাস করবেন না এবং এর চাকচিক্যেও বিভ্রান্ত হবেন না।

এই মহান খেদমত ও উপদেশবাণী উপহার দেয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের এই বইয়ের বর্তমান সংস্করণটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহতা’লার দরবারে আমাদের হামদ্ (প্রশংসা) পেশ করছি।

ইমাম দারিমী বর্ণিত একখানা হাদীসে মহানবী (দ:) এরশাদ ফরমান:

“জেনে রেখো, (সৃষ্টিকুলে) মন্দের মাঝে সবচেয়ে মন্দ হচ্ছে ‘উলামা’(বদমায়েশ আলেম); আর সেরার মাঝে সেরা হলেন উলামা-এ-হক্কানী-রব্বানী (বুযূর্গানে দ্বীন)।”

এই হাদীসটি ইমাম মোজাদ্দেদে আলফে সানী (রহ:) নিজ মকতুবাত শরীফের ১ম খণ্ডের ৫৩তম পত্রে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।

হুসাইন হিলমী ইশিক

১৪১৪ হিজরী সাল

ইসলামের শত্রুদের জন্য জবাব

এই বইটি নিজেকে আলেম হিসেবে চালিয়ে দেয়া মিসরীয় লা-মযহাবী রশীদ রেযার প্রণীত **‘মুহাওয়ারাত’** পুস্তকে ইসলামী উলামাবৃন্দের প্রতি আরেপিত মিথ্যে অপবাদ ও কুৎসা রটনার জবাবে রচিত। ওই পুস্তকে সে চার মযহাবের তালফিক তথা একত্রীকরণের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে। রশীদ রেযা বলে:

১/ – “আসর আস্ সাআদা, অর্থাৎ, ইসলামের স্বর্ণ (তথা আশীর্বাদধন্য প্রাথমিক) যুগে ঈমান কিংবা আমল (ধর্ম অনুশীলন)-সম্পর্কিত বিধানে কোনো মতপার্থক্য ছিল না।” [১-৪ নং উদ্‌ধৃতি: হামদী আকসেকী অনূদিত ‘**মুহাওয়ারাত**’ পুস্তকের তুর্কী সংস্করণের মুখবন্ধ]

এ বক্তব্যের কয়েক লাইন পরেই সে বলে,

“কোনো বিষয়ে ‘নস’ (শরয়ী দলিল) না থাকলে সাহাবায়ে কেরাম (রা:) তাঁদের এজতেহাদের সাহায্যে (অর্থাৎ, গবেষণার মাধ্যমে) সিদ্ধান্ত নিতেন।”

ফলে সে তার ওপরের বক্তব্যকেই খণ্ডন করে দিয়েছে। তার দ্বিতীয় বক্তব্যে সে সত্য কথাটি লিখেছে। যে সকল বিষয়ে ’নস’ থাকতো না, সেগুলোর ব্যাপারে সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) এজতেহাদের সাহায্যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন; আর এমন বিষয়গুলোতে মতপার্থক্য দেখা দিতো।

২/ – “ইসলামের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দীতে মুসলমানগণ কোনো নির্দিষ্ট মযহাবের অনুসরণ করতেন না; কোনো নির্দিষ্ট ইমামের মযহাবের সাথে তাঁরা নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতেন না। যখন নতুন কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতেন, তাঁদের ধারে-কাছে যে কোনো মুফতীর (ফতোওয়াবিদ) সহায়তা নিয়ে তাঁরা তা সমাধান করতেন। এই মযহাব, না ওই মযহাব, তাঁরা তার খোঁজ করতেন না। ইবনে হুমাম তাঁর **‘তাহরির’** গ্রন্থে তা-ই লিখেছেন।”

উলামাবৃন্দ এ ব্যাপারে যা লিখেছেন, তার সাথে ওপরের বক্তব্যের কোনো মিল-ই নেই। মওলানা দাউদ ইবনে সুলাইমান বাগদাদী (রহ:) ইবনে আমির হাজ্জের কথা উদ্‌ধৃত করেন, যিনি বলেন: “আমার শিক্ষক ইবনে হুমাম বলেছেন কোনো মুকাল্লিদ তথা অনুসরণকারীর জন্যে চার মযহাবের যে কোনো একটির অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক” [দাউদ ইবনে সুলাইমান কৃত **‘আশাদ্দুল জ্বিহাদ’**, ১৬ পৃষ্ঠা]। ইবনে নুয়াইম আল-মিসরী লিখেন, “ইবনে হুমামের **‘তাহরির’** গ্রন্থে যেমনটি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, উলেমাবৃন্দের মাঝে এই বিষয়টি সম্পর্কে ঐকমত্য রয়েছে যে চার মযহাবের যে কোনোটির সাথে যার মিল বা সঙ্গতি নেই, তা-ই বাতিল বা ভ্রান্তি” [**’আশবাহ’** গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ‘এজতেহাদ’ শীর্ষক ১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য]। মওলানা আবদুল গণী নাবলুসী (রহ:) এই বিষয়ে ইবনে হুমামকে উদ্‌ধৃত করেন এবং আরও যোগ করে বলেন, “অতএব,

এটি বোঝা যায় যে চার মযহাব ভিন্ন অন্য কোনো মযহাবের অনুসরণ অনুমতিপ্রাপ্ত নয়। বর্তমানে মহানবী (দ:)-এর ইসলাম ধর্ম পালন করা একমাত্র চার মযহাবের যে কোনো একটির অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব। 'তাকলীদ' মানে হচ্ছে কারো কথা গ্রহণ করা, তাঁর দালিলিক প্রমাণের খোঁজ না করেই। আর এটি অন্তরের ইচ্ছে পোষণ তথা নিয়্যত দ্বারা-ই করতে হয়। নিয়্যত ছাড়া যা কিছু করা হয় সবই বাতিল হয়ে যায়। প্রামাণ্য দলিল বোঝার (এবং খোঁজ করার) দায়িত্ব ও কর্তব্য মুজতাহিদের। মুকাল্লিদের দায়িত্ব হচ্ছে তাঁর সমস্ত কাজে চার মযহাবের যে কোনো একটির অনুসরণ-অনুগমন করা। অধিকাংশ উলামার মতানুযায়ী, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে মুকাল্লিদ (ওই চার মযহাবের মধ্যে) ভিন্ন ভিন্ন মযহাব অনুসরণ করতে পারবেন। এ কথা **'তাহরির'** পুস্তকে লেখা রয়েছে। কিন্তু এই কথা সর্বসম্মতিক্রমে ব্যক্ত হয়েছে যে মুকাল্লিদ তাঁর কোনো কাজ কোনো একটি মযহাব অনুযায়ী আরম্ভ করলে তাঁকে সেই মযহাবের নিয়ম-কানুন মেনেই তা সম্পন্ন করতে হবে; অন্যান্য মযহাবের বিধানগুলোকে এ ক্ষেত্রে একত্র করা চলবে না [৩৩তম অনুচ্ছেদ দেখুন]। আরও কয়েকজন আলেম এ ব্যাপারে বলেন যে, কেউ কোনো মযহাবের অনুসরণ আরম্ভ করলে তিনি তাঁর সমস্ত কাজেই ওই মযহাব ছাড়া অন্য কোনো মযহাবকে অনুসরণ করতে পারবেন না; একমাত্র শক্ত জরুরি প্রয়োজন দেখা দিলেই তার ব্যতিক্রম করতে পারবেন।" [মওলানা নাবলুসী রচিত **'খুলাসাতুত্ তাহকিক'**]

আয়েম্মা-এ-মযাহিব (চার মযহাবের ইমামবৃন্দ) একে অপরের মযহাব অনুযায়ী এবাদত-বন্দেগী পালন করলেও ধর্ম সংস্কারকরা যা ভেবে নিয়েছে ঠিক তার বিপরীত, তাঁরা একে অপরের মযহাবের অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে তা করেন নি। বরঞ্চ তাঁরা তা করেছেন নিজেদের এজতেহাদের অনুসরণে, ওই বিশেষ বিষয়ে, ওই বিশেষ মুহূর্তে। মুজতাহিদবৃন্দের এ ধরনের উদাহরণ দেখিয়ে সবাই এ রকম করেছেন বলা মোটেও ঠিক নয়। সঠিক উদাহরণ না দেখিয়ে কোনো আলেমের পক্ষে এ কথা বলা তার পদের সাথে মানানসই নয়।

৩/ – "রাজনৈতিক বিতর্ক ও মতবিরোধ যা পরবর্তীকালে আবির্ভূত হয় এবং যা দ্বীনের সুবিধার্থে বলে দাবি করা হয়, তা মযহাবগুলোর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।"

রশীদ রেযার এই বক্তব্য অত্যন্ত মারাত্মক একটি ভ্রান্তি, যা ক্ষমার অযোগ্য। সে ফেকাহ শাস্ত্রের উলামাবৃন্দের প্রতি ওই দোষ চাপাতে চাইছে, যে দোষে তার মতো লোকেরা মযহাব ত্যাগ করার এবং মযহাবকে কলুষিত করার অপচেষ্টার দায়ে দুষ্ট। অতি পুরোনো এবং সাম্প্রতিক প্রকাশিত উলামাদের বইপত্র সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে; এ সব বইয়ের কোনোটিতেই এমন ফতোওয়া বা বিবৃতি নেই যা আইম্মায়ে মযাহিব (চার মযহাবের ইমামবৃন্দ)-এর এজতেহাদকে পরিবর্তন করবে। আবদুহু ও তার অনুসারীদের মতো লা-মযহাবী/'সালাফী' লোকেরা নিশ্চিতভাবে ওই মহান আলেমমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এই লা-মযহাবীরাই মযহাবকে উলট-পালট করে দিতে চায়। কিন্তু বর্তমানের কোনো ফেকাহগ্রন্থে এই লা-মযহাবীদের কোনো কথাবার্তা সন্নিবেশিত নেই। ফেকাহর বইপত্র ফেকাহবিদদের দ্বারা লিখিত। অজ্ঞ-মূর্খ ব্যক্তিবর্গ, লা-মযহাবী/'সালাফী' গোষ্ঠী কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্ম ব্যবহারকারী লোকদের দ্বারা লিখিত বইপত্রকে 'ফেকাহর কেতাব' বলা হয় না। তাদের দূষণীয় লেখনী ফেকাহর উলামাবৃন্দকে দোষী সাব্যস্ত করার ভিত্তি বা কারণ হতে পারে না।

৪/ – রশীদ রেযা ক্ষমার অযোগ্য এক আজব মিথ্যে কথা বলে: “সকল আয়েম্মা-এ-মযাহিব বলেন, ’আমাদেরকে অনুকরণ (তাকলীদ) করো না। বরং আমাদের দলিল-প্রমাণের সদ্ব্যবহার করো। যারা আমাদের কথার ভিত্তিস্বরূপ প্রামাণিক দলিলগুলো সম্পর্কে জানে না, তাদের অধিকার নেই আমাদের তাকলীদ (অনুসরণ) মান্য করার’।”

বস্তুতঃ এ ধরনের কথাবার্তা আয়েম্মা-এ-মযাহিববৃন্দ বলেন নি; এগুলো বরং লা-মযহাবীরা-ই বলে থাকে। চার মযহাবের ইমামমণ্ডলী বলেন, “মুকাল্লিদ তথা অনুসারীদের জন্যে মুজতাহিদের দালিলিক প্রমাণ জানার প্রয়োজন নেই। মযহাবের ইমামের কথা-ই তাঁর জন্যে দলিলস্বরূপ।”

৫/ – ”মানবতার বিবর্তনের সাথে সাথে সময়ের পরিক্রমণে মানুষের বুদ্ধিরও বিকাশ হয়েছে।” [রশীদ রেযা প্রণীত **‘মুহাওয়ারাত’** পুস্তকের আরবী মুখবন্ধের ৫-৯ নং উদ্‌ধৃতি]

এই মন্তব্যটি বিবর্তনবাদের পক্ষে রশীদ রেযার ধারণা প্রতিফলন করে, যে ধারণা ম্যাসন চক্র-ই পোষণ করে থাকে। তার মতে, প্রাথমিক যুগের মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা কম ছিল, আর বর্তমানকালের অবিশ্বাসীরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। সে বলতে চাচ্ছে যে পূর্ববর্তী আম্বিয়া (আ:)-বৃন্দ ও তাঁদের উম্মতগণ বুদ্ধিহীন ছিলেন। এই রকম ধারণা যে ব্যক্তি পোষণ করবে, সে কাফেরে পরিণত হবে। সর্ব-হযরত আদম (আ:), শীষ (আ:), ইদ্রিস (আ:), নূহ (আ:)-সহ অনেক আম্বিয়া (আ:)-ই প্রাথমিক সময়কালের। তাঁদের সবাই বর্তমানকালের সমস্ত মানুষের চেয়ে ঢের বেশি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন। একটি হাদীস শরীফে বিবৃত হয়েছে, প্রত্যেক শতাব্দী ওর পূর্ববর্তী শতাব্দী থেকে মন্দ হবে। রশীদ রেযা এই হাদীসটির সাথে দ্বিমত পোষণ করেছে।

৬/ – “ইতিহাসের বইপত্র পড়লে জানতে পারবেন আহলে সুন্নাত এবং শিয়া ও খারেজীদের মধ্যকার যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে; এমন কি আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন মযহাবের মধ্যকার সংঘাত সম্পর্কেও! শাফেয়ী ও হানাফীদের মধ্যে বৈরিতার সুযোগে মোঙ্গল জাতি মুসলমানদেরকে আক্রমণ করতে পেরেছিল।”

রশীদ রেযার মতো লা-মযহাবী/’সালাফী’ লোকেরা আহলে সুন্নাতের চার মযহাবকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে এ ক্ষেত্রে একটি ধূর্ত চালের আশ্রয় নিয়ে থাকে। বাহাত্তরটি বাতিল ফেরকাহ যাদেরকে হাদীসে জাহান্নামী বলা হয়েছে, আহলে সুন্নাতের বিরুদ্ধে পরিচালিত তাদের আক্রমণ ও রক্তপাতের ঘটনাগুলো লা-মযহাবীরা আগে বর্ণনা করে। অতঃপর তারা হীন মিথ্যে এর সাথে যোগ করে বলে, আহলে সুন্নাতের চার মযহাবও নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িয়েছিল। অথচ আজ পর্যন্ত কোথাও, কখনোই হানাফী ও শাফেয়ীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে নি। তাঁরা আহলে সুন্নাতের অনুসারী হয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে কীভাবেই বা জড়াতে পারেন? তাঁদের আকীদা-বিশ্বাস তো একই। তাঁরা সব সময়ই একে অপরকে ভালোবেসেছেন এবং ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব নিয়ে সহাবস্থান করেছেন। লা-মযহাবীরা যারা দাবি করে মযহাবের অনুসারীগণ আত্মকলহে লিপ্ত হয়েছেন, তারা এর মাত্র একটি উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত সামনে পেশ করতে পারে কি-না তা-ই আমরা দেখতে চাই! তারা তা পারবে না। উদাহরণস্বরূপ তারা লা-মযহাবীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আহলে সুন্নাতের চার মযহাবের সমন্বিত জ্বিহাদের কথা লিখে থাকে। এ ধরনের মিথ্যে কথা বলে তারা সাধারণ মুসলমানদেরকে ধোকা দিতে

অপতৎপর। যেহেতু আহলে সুন্নাতের ‘শাফেয়ী’ নামটি এবং ’শিয়া’ শব্দটি প্রায় একই রকম শোনায়, সেহেতু তারা হানাফী ও লা-মযহাবীদের মধ্যকার লড়াইকে হানাফী ও শাফেয়ীদের মধ্যে যুদ্ধ হিসেবে চালিয়ে দিতে চায়। চার মযহাবের অনুসারী মুসলমানদের প্রতি কালিমা লেপনের অসৎ উদ্দেশ্যে লা-মযহাবীরা কিছু বিশেষ শব্দেরও অপব্যাখ্যা করে থাকে। যেমন, খৃষ্টান ধর্মযাজকদের প্রণীত **‘আল-মুনজিদ’** অভিধান হতে তারা আরবী ‘তা’আসসুব’ শব্দটির অর্থ করে এভাবে – “বিজ্ঞান অ-সম্মত, ধর্মবহির্ভূত ও অযৌক্তিক কারণসমূহের দ্বারা প্রভাবান্বিত কোনো দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ।” তাদের মতে, মযহাবের শিক্ষা-দীক্ষাই হলো ‘তা’আসসুব’ এবং এরই কারণে মযহাবগুলোর মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছিল। অথচ উলামা-এ-ইসলামের মতে, **‘তা’আসসুব’** মানে হলো বৈরিতা যার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।’ অতএব, মযহাবের অনুসরণ করা, মযহাব যে সুন্নাতের কিংবা খুলাফা-এ-রাশেদীনের সুন্নাতের ওপর ভিত্তিশীল, তা প্রমাণের চেষ্টা করা কখনোই তা’আসসুব হতে পারে না। বরঞ্চ কোনো মযহাবের কুৎসা রটনা করাই হলো তা’আসসুব। এ কাজ চার মযহাবের অনুসারীদের কেউই করেন নি। ইসলামের ইতিহাসে মযহাবগুলোর অভ্যন্তরে তা’আসসুবের কোনো নজির-ই নেই।

লা-মযহাবীরা যারা বাহাত্তরটি ভ্রান্ত দলের একটির অনুসারী, তারা উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলীফাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা’আতের পথ থেকে বিচ্যুত করার যথেষ্ট অপপ্রয়াস পেয়েছিল। এ কাজে যারা সফল হয়, তারা অনেক রক্তারক্তির ঘটনা ঘটিয়েছিল। ইসলামী উলামাবৃন্দের প্রতি তা’আসসুবের অপবাদ জঘন্য কুৎসা বৈ কিছু নয়, কেননা তাঁরা-ই লা-মযহাবীদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে খলীফাদেরকে উপদেশ দিতেন এবং তাঁদেরকে আহলে সুন্নাতের চার মযহাবের যে কোনো একটির অনুশাসন মেনে চলতে আহ্বান জানাতেন। আজকাল চার মযহাবকে আক্রমণ করার একটি নতুন চক্রান্ত হলো, আরবীতে কিছুটুকু জ্ঞানসম্পন্ন (লা-মযহাবী) যে কেউই ইতিহাসের বইপত্রকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে দেখে তাতে দৈবাৎ যে সব অতীত ঘটনার সাক্ষাত পায়, তা-ই নিজের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ব্যাখ্যা করে সুন্নী মুসলমানদের প্রতি তার আরোপিত তা’আসসুবের ক্ষতির ’ঐতিহাসিক দলিল’ হিসেবে তরুণ ও যুব সম্প্রদায়ের সামনে পেশ করে। নিজেদেরকে সঠিক প্রমাণ করতে মযহাব-বিরোধীদের কেউ কেউ বলে যে তারা মযহাবের বিরুদ্ধে নয়, বরং মযহাবের অভ্যন্তরে তা’আসসুবের বিরুদ্ধে। তবে ‘তা’আসসুব’ শব্দটির অপব্যাখ্যা করে তারা মযহাবের পক্ষে প্রমাণ পেশকারী ফেকাহ’র উলামাদের প্রতি কুৎসা রটনা করে বেড়ায় এবং আরও দাবি করে যে এই উলামাগণ-ই ইসলামের ইতিহাসে রক্তক্ষয়ী ঘটনার হোতা। এই কূটচাল দ্বারা যুব ও তরুণ সম্প্রদায়কে তারা মযহাব-বিরোধী বানাতে অপতৎপর।

’কামুস্ আল-আলম’ বইটিতে লেখা আছে, সেলযুকী সুলতান তুগরুল বেগের প্রধানমন্ত্রী আমীরুল মুলক্ মোহাম্মদ আল-কুনদুরী এই মর্মে এক ফরমান জারি করেন যে লা-মযহাবীদেরকে প্রতিটি মিম্বরে লা’নত তথা অভিসম্পাত দিতে হবে। এমতাবস্থায় আলপ্ আরসালানের সময়কালে খোরাসানের অধিকাংশ ’উলামা’ অন্যান্য এলাকায় বসতি স্থানান্তর করে। ইবনে তাইমিয়ার মতো লা-মযহাবীরা এই ঘটনাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে বলে, “হানাফী ও শাফেয়ীরা যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং আশ’আরীদেরকে লা’নত দেয়া হয়।” তারা এই সব মিথ্যে এবং ইমাম সৈয়ুতী (রহ:)-এর বইপত্রের ভুয়া অনুবাদ প্রকাশ করে যুব সমাজকে ধোকা দিতে চেষ্টা করে, আর চার মযহাবের ধ্বংস সাধন করে ওর স্থলে লা-মযহাবী মতবাদকে প্রতিষ্ঠার অপপ্রয়াস পায়।

নিম্নবর্ণিত কাহিনীটি সে সকল কাহিনীর একটি, যেটি তা'আসসুবের সাথে সম্পৃক্ত, যে তা'আসসুবকে অন্যায়ভাবে মযহাবগুলোর প্রতি আরোপ করা হয় এবং দাবি করা হয় যে মুসলমানদের ইতিহাসে এটি ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সূত্রপাত করেছিল: এয়াকুত আল-হামাভী ৬১৭ হিজরী সালে 'রাঈ' নগরী সফর করেন। তিনি নগরীটিকে ধ্বংসপ্রাপ্ত দেখতে পেয়ে ওখানে যাদের সাক্ষাত পান তাদেরকেই এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। তাকে বলা হয় ওই নগরীতে হানাফী ও শাফেঈদের মধ্যে তা'আসসুবের উদ্ভব হয় এবং তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে; আরও জানানো হয় শাফেঈরা যুদ্ধে জয়ী হলেও নগরীটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই কাহিনীটি এয়াকুতের **'মু'জাম আল-বুলদান'** পুস্তকে উদ্ধৃত হয়েছে। তবে এয়াকুত কোনো ঐতিহাসিক ছিলেন না। তিনি বয়সে যখন একজন বিজেনটিন (রোমান) বালক, ঠিক তখনই তিনি (মুসলমানদের হাতে) আটক হন এবং বাগদাদের এক সওদাগরের কাছে তাকে বিক্রি করা হয়। তার ব্যবসায়ী মালিকের ব্যবসা-বাণিজ্য দেখাশুনার জন্যে তিনি অনেক শহর ও নগরী ভ্রমণ করেন। সওদাগর মালিকের মৃত্যুর পর এয়াকুত বইপত্র বিক্রি আরম্ভ করেন। **'মু'জাম আল-বুলদান'** হলো তার ভৌগোলিক অভিধান (সফরনামা), যার মধ্যে তিনি যেখানে যেখানে গিয়েছিলেন সেখানে যা যা দেখেছিলেন এবং শুনেছিলেন তারই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। এই বই থেকে তার বেশ মুনাফা হয়। রাঈ নগরী বর্তমান তেহরান (ইরানের রাজধানী) হতে ৫ কিলোমিটার দূরে এবং আজো এটি ধ্বংসস্তূপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই নগরী ২০ হিজরী সালে খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা:)-এর নির্দেশে সেনাপতি হযরত উরওয়াত ইবনে যায়দ আত্ তাঈ (রা:) জয় করেন। খলীফা আবূ জা'ফর মনসূরের শাসনামলে এ নগরীর উন্নয়ন সাধিত হয় এবং এটি মহান জ্ঞান বিশারদদের আবাসস্থল ও সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। কিন্তু ৬১৬ হিজরী সালে অমুসলমান মোঙ্গল শাসক চেঙ্গিস খান ও তার সৈন্যবাহিনী এই মুসলিম জনপদের ধ্বংস সাধন করেন এবং এর পুরুষদের শহীদ করে নারী ও শিশুদের বন্দী করেন। এয়াকুত যে ধ্বংসাবশেষ দেখেছিলেন, তা এক বছর আগে চেঙ্গিস খানেরই করা। এয়াকুত যে সব লা-মযহাবীর কাছে ধ্বংসের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তারা এর দায় আহলে সুন্নাতের ওপর চাপিয়ে দেয়; আর এয়াকুতও তাদের কথায় বিশ্বাস করেন। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তিনি কোনো ইতিহাসবিদ ছিলেন না, বরং একজন অজ্ঞ পর্যটক ছিলেন। লা-মযহাবীরা যখন মযহাবের অনুসারী মুসলমান ও সম্মানিত ফেকাহবিদদের প্রতি কালিমা লেপনের কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ বা ঐতিহাসিক দলিল পায় না, তখন তারা পারসিক উপন্যাসের ওপর ভিত্তিশীল কথাবার্তা ও লেখনীর আশ্রয় নেয়। এ ধরনের কাহিনী উলামায়ে আহলে সুন্নাতের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বকে মোটেও ক্ষতিগ্রস্ত করে না, বরং এ সত্য প্রতিফলিত করে যে ধর্মীয় পদে অধিষ্ঠিত লা-মযহাবী ব্যক্তিবর্গ দ্বীন ইসলামে কর্তৃত্বসম্পন্ন নয় এবং তারা ধর্মের শত্রু অজ্ঞ-গোমরাহ চক্র। এটি উপলব্ধি করা যায় যে তারা মুসলমানদেরকে ধোকা দিতে অপতৎপর এবং ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সেজে মযহাবগুলোকে ভেতর থেকে বিনাশ সাধনে লিপ্ত। চার মযহাবের বিনাশ মানে আহলে সুন্নাতেরই বিনাশ সাধন, কেননা আহলে সুন্নাত (সুন্নীয়ত) আমল/ফিকাহ তথা অনুশীলনের ক্ষেত্রে চার মযহাব দ্বারা গঠিত। এই চার মযহাবের বাইরে কোনো আহলে সুন্নাত নেই। আর আহলে সুন্নাতের বিনাশ সাধনের মানে হলো সঠিক ধর্ম (দ্বীন) ইসলামেরই বিলোপ সাধন, যে ইসলাম ধর্ম মহানবী (দ:) নিয়ে এসেছিলেন মহান আল্লাহতা'লার কাছ থেকে; কেননা আহলে সুন্নাহ হলেন সে সকল মুসলমান যাঁরা সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর পথের ওপর হাঁটেন (অর্থাৎ, তাঁদের পথ অনুসরণ করেন)। সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর পথ হলো মহানবী (দ:)-এর পথ, যিনি হাদীসে এরশাদ ফরমান, **"আমার সাহাবীরা হলো আসমানের তারা সমতুল্য। তোমরা তাদের যে কাউকে অনুসরণ করলে সঠিক পথ পাবে।"** এ হাদীস দ্বারা তিনি আমাদেরকে সাহাবী (রা:)-দের অনুসরণ করতে আদেশ

করেছেন।
তাকলীদ (অনুসরণ/অনুগমন) দুইটি ক্ষেত্রে করা হয়। প্রথমটি হলো এ'তেকাদ তথা আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে। আর দ্বিতীয়টি আ'মল তথা ইসলামী অনুশাসন অনুশীলনের ক্ষেত্রে। সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-কে অনুসরণের মানে আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাঁদেরকে অনুসরণ করা। আরেক কথায়, তাঁরা যা যা বিশ্বাস করেছেন, তা-ই বিশ্বাস করা। তাঁদের বিশ্বাসের মতো যে সমস্ত মুসলমান বিশ্বাস পোষণ করেন, তাঁদেরকে বলা হয় আহলে সুন্নাহ। আ'মল অর্থাৎ যে সব কাজ পালন এবং যেগুলো বর্জন করতে হবে, সেগুলোর ক্ষেত্রে সকল সাহাবী (রা:)-কে অনুসরণ জরুরি নয়, আর তা সম্ভবও নয়। সাহাবা-এ-কেরাম প্রতিটি আ'মল কীভাবে পালন করেছিলেন তাও জ্ঞাত নয়। অধিকন্তু, বহু বিষয় (মাসআলা) তাঁদের সময় অস্তিত্বশীল ছিল না, যা পরবর্তী যুগে উদ্ভূত হয়। হযরত ইমামুল আ'যম আবূ হানিফা (রহ:)-ই আহলে সুন্নাতের জনক। চার মযহাবের সবগুলোই তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) থেকে তিনি যা যা শুনেছিলেন তা-ই মেনে নিয়েছে। ইমামুল আ'যম কয়েকজন সাহাবী (রা:)-এর সমসাময়িককালের ছিলেন। তিনি তাঁদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিলেন। এ ছাড়া তিনি অন্যান্য শিক্ষকদের কাছ থেকেও বহু বিষয় শিক্ষা করেন। ইমাম শাফেঈ (রহ:) ও ইমাম মালেক (রহ:) আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে (তাঁর থেকে) কিছু ভিন্ন মন্তব্য করার মানে এই নয় যে তাঁরা ইমামুল আ'যমের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। এটি এ কারণে যে তাঁরা ইমামুল আ'যমের কথা থেকে নিজেরা যেভাবে বুঝেছিলেন, সেভাবে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের সবার কথার সারমর্ম একই, ব্যাখ্যা করার পন্থা ভিন্ন। আমরা চার আইম্মা-এ-মযাহীব (রহ:)-কে বিশ্বাস করি এবং তাঁদেরকে ভালোবাসি।
লা-মযহাবীদের একটি বড় ধোকা হলো আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়ে মতপার্থক্যের বাজে দিকগুলো সম্পর্কে লিখে তা চার মযহাবের (আ'মল সংক্রান্ত) পার্থক্যের ওপর লেপন করা। ঈমানী বিষয়ে বিভিন্ন দলে বিভক্তি অবশ্যই খারাপ। যে ব্যক্তি আহলে সুন্নাহ থেকে ঈমানী বিষয়ে পৃথক হয়, সে **কাফের** হয়ে যায়; নতুবা গোমরাহ **বেদআতী** হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর বিভিন্ন হাদীসে এই দুই ধরনের লোককে জাহান্নামী বলা হয়েছে। কাফের চিরকাল জাহান্নামে থাকলেও বেদআতী পরবর্তী সময়ে মাফ পেয়ে হয়তো জান্নাতে যেতে পারে।

আহলে সুন্নাহ'র সাথে দ্বিমত পোষণকারীদের কেউ কেউ কাফেরে পরিণত হয়েছে; কিন্তু তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে চালিয়ে দেয়। এরা দুই ধরনের। প্রথম ধরন হলো যারা নিজেদের মস্তিষ্ক ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা করে এমন ভুল করে যে ফলশ্রুতিতে কুফরী করে বসে। তারা নিজেদেরকে প্রকৃত মুসলমান ও সঠিক পথের পথিক ধারণা করে থাকে; অথচ তারা যে ঈমানহারা তা কিন্তু তাদের উপলব্ধিতে আসে না। এই শ্রেণীভুক্তদের বলা হয় 'মুলহিদ'। দ্বিতীয় ধরনের লোকেরা ইতোমধ্যেই ইসলাম ধর্ম থেকে খারিজ হয়ে গিয়েছে এবং দ্বীনের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন। মুসলমানদেরকে ধোকা দিয়ে ধর্মের মধ্যে অন্তর্ঘাতমূলক অপতৎপরতার জন্যে তারা মুসলমান হবার ভান করে। ধর্মের সাথে নিজেদের মিথ্যে ও কুৎসা মেশানোর অসৎ উদ্দেশ্যে তারা কুরআন-হাদীস ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ভুল ও দূষণীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে থাকে। এই অন্তর্ঘাতী শত্রুদের বলা হয় 'যিনদিক'। মিসরের ধর্মীয় পদে সমাসীন ফ্রী-ম্যাসন এবং বর্তমানে গজিয়ে ওঠা তথাকথিত সমাজতন্ত্রী মুসলমানরা এই শ্রেণীভুক্ত। এদেরকে 'বিজ্ঞানের একগুঁয়ে সমর্থক' বা 'ধর্ম সংস্কারক'ও বলা হয়।

ঈমানী বিষয়াদির ক্ষেত্রে দলবিভক্ত হওয়াকে কুরআন-হাদীসে খারাপ বলা হয়েছে এবং কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। একটি বা একক ঈমানের (বিশ্বাসের) ওপর মুসলমানদের একতাবদ্ধ হতে শরীয়তে আদেশ করা হয়েছে। কুরআন-হাদীসে যে বিভক্তি নিষিদ্ধ, তা ঈমান-সংক্রান্ত। বস্তুতঃ সকল নবী-রাসূল (আ:)-ই একক ঈমানের প্রকাশক ছিলেন। হযরত আদম (আ:) থেকে আরম্ভ করে (পৃথিবীর) শেষ ঈমানদার ব্যক্তি পর্যন্ত সবাই ওই একই ঈমানের অধিকারী। কিন্তু যিনদিক্ক ও মুলহিদরা দাবি করে থাকে, যে সমস্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীসে ঈমানী বিষয়ে বিভক্তিকে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলো নাকি আহলে সুন্নাহ'র চার মযহাবকেই উদ্দেশ্য করেছে। অথচ কুরআন মজীদ চার মযহাবে বিভক্তিকে আদেশ করেছে। একটি হাদীসে ঘোষিত হয়েছে যে এই মতপার্থক্য মুসলমানদের প্রতি আল্লাহতা'লার রহমতস্বরূপ।
মুসলমান রাজ্যগুলোতে মোঙ্গল আক্রমণ এবং বাগদাদ নগরীর ধ্বংস সাধন ও তাতে রক্তপাতের ঘটনাকে 'হানাফী-শাফেঈ বিরোধের জের' হিসেবে বর্ণনা করা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও জঘন্য মিথ্যে এবং কুৎসা রটনা বৈ কিছু নয়। এ ধরনের 'বিরোধ' অতীতেও ঘটে নি, ভবিষ্যতেও ঘটবে না। এই দু'টি মযহাবের ঈমান একই এবং এদের অনুসারীরা একে অপরকে ভালোবাসেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে তাঁরা একে অপরের ভাই এবং তাঁদের মধ্যকার আ'মল তথা শরীয়তের অনুশীলনগত যে তাৎপর্যহীন (ছোটখাটো) মতপার্থক্য বিরাজমান, তা আল্লাহতা'লার রহমত-স্বরূপ। তাঁরা আরও বিশ্বাস করেন যে এই মতপার্থক্য একটি সহজসাধ্যতা (সুযোগ-সুবিধা) ছাড়া কিছু নয়। কোনো মুসলমান নিজ মযহাবে থেকে কোনো আ'মল পালনে অসুবিধার মুখোমুখি হলে তিনি অন্য তিনটি মযহাবের যে কোনো একটির অনুশাসন অনুযায়ী তা সম্পন্ন করতে পারেন। চার মযহাবের বইপত্র কিছু শর্তের ভিত্তিতে সর্বসম্মতভাবে এই সুযোগ গ্রহণের সুপারিশ করেছে। এই চার মযহাবের উলেমাবৃন্দ তাঁদের মযহাবের দলিলগুলো লিপিবদ্ধ ও ব্যাখ্যা করেছেন, আল্লাহ মাফ করুন, একে অপরকে আক্রমণ ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি অপবাদ দেবার জন্যে নয়, বরং লা-মযহাবী গোষ্ঠীর কুৎসা থেকে আহলে সুন্নাহ'কে রক্ষাকল্পে এবং তাঁদের মযহাবের অনুসারীদের আস্থা বহাল রাখার উদ্দেশ্যে। তাঁরা এ মর্মে তা-ই লিখেছেন এবং বলেছেন যে অসুবিধার সময় অন্য কোনো মযহাবের নিয়ম মোতাবেক কোনো আ'মল সম্পন্ন করা যাবে। লা-মযহাবী/'সালাফী' চক্র, অর্থাৎ মুলহিদ ও যিনদিক্ক গোষ্ঠী আহলে সুন্নাত'কে আক্রমণ করার আর কোনো উপায়ন্তর না দেখে এই সব সত্য ও সঠিক লেখনীতে নাক গলিয়েছে এবং এগুলোর অপব্যাখ্যা করছে।

উপরন্তু, তাঁতার ও মোঙ্গল জাতি কর্তৃক মুসলিম দেশগুলোতে হামলার কারণ সম্পর্কে ইতিহাস পুস্তকগুলো স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছে। যেমন ইতিহাসবিদ আহমদ জওদাদ পাশা লিখেন:
"শেষ আব্বাসীয় খলীফা মুসতা'সিম বিল্লাহ একজন পরহেযগার সুন্নী মুসলমান ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রধান উজির ইবনে আল-কামী ছিল এক লা-মযহাবী এবং সে খলীফার প্রতি অনুগত ছিল না। রাজ্যের সমস্ত শাসনভার ছিল এই উজিরের কর্তৃত্বে। আব্বাসীয় খেলাফত বদলে নতুন একটি রাষ্ট্র পত্তনের ভাবনা তার অন্তরে ছিল। সে মোঙ্গল-রাজ হালাকু খানের হাতে বাগদাদের পতন দেখতে চেয়েছিল; আর তার মনে মোঙ্গল-রাজের প্রধানমন্ত্রী হবার আশাও লালিত হচ্ছিল। সে হালাকু খানকে এই রাজ্য আক্রমণের উস্কানি দেয়। হালাকু'র চিঠির কড়া প্রত্যুত্তর দিয়ে সে তাকে উস্কে দেয়। নাসিরুদ্দীন তুসী নামের আরেক গোমরাহ লা-মযহাবী ছিল হালাকু খানের উপদেষ্টা। সে-ও হালাকু'কে বাগদাদ আক্রমণের প্ররোচনা দেয়। এই দুই গোমরাহ লোকের কলকাঠি নাড়ার দরুনই হালাকু খান বাগদাদ অবরোধ করে। দুই লক্ষ তাঁতার সৈন্যের তীর নিক্ষেপের সামনে খলীফার বিশ হাজারে সৈন্য দাঁড়াতে পারে নি। হালাকু খান কয়লার আলকাতরামিশ্রিত আগুন ও বড় গুলতি-

পাথর দ্বারা বাগদাদ আক্রমণ করে। পাঁচ দিনের অবরোধশেষে ইবনে আল-কামী শান্তিচুক্তির অজুহাতে হালাকু খানের শিবিরে যায় এবং তার সাথে চুক্তি করে। অতঃপর খলীফার কাছে ফিরে এসে সে বলে তিনি আত্মসমর্পণ করলে সবাইকে মুক্ত করে দেয়া হবে। খলীফা তাকে বিশ্বাস করে ৬৫৬ হিজরী (১২৫৮ খৃষ্টাব্দ) সালের ২০ শে মহররম তারিখে হালাকু খানের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁকে তাঁর সহযোগীদের সাথে হত্যা করা হয়। চার লক্ষেরও বেশি মুসলমান এ সময় প্রাণ হারান। লক্ষ লক্ষ ইসলামী বইপত্র তাইগ্রিস নদীতে ফেলে দেয়া হয়। মনোরম বাগদাদ নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। **'খিরকাত-এ-সায়াদা'** (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আলখাল্লা মোবারক কয়েকজন মুসলমানকে তিনি দান করেছিলেন; খলীফাবৃন্দ প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে এগুলো রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন; আজো এ রকম দুটি জুব্বা ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত আছে) এবং **'আসা আন্ নববী'** (ক্ষুদ্র লাঠি মোবারক) পুড়িয়ে সেগুলোর ভস্ম তাইগ্রিস নদীতে ফেলে দেয়া হয়। পাঁচ'শ চব্বিশ বছরের ঐতিহ্যবাহী আব্বাসীয় খেলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে এভাবে। ইবনে আল-কামীকে কোনো পদ দেয়া হয় নি এবং অধঃপতিত অবস্থায় ওই একই বছর সে মৃত্যুবরণ করে। ওই বছরই উসমানীয় তুর্কী সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনকারী উসমান গাজী সোগুত শহরে জন্মগ্রহণ করেন" (কেসাস-এ-আম্বিয়া, ৮৯০ পৃষ্ঠা)। অতএব, পরিদৃষ্ট হলো যে মোঙ্গলদের দ্বারা মুসলমান রাজ্যগুলোতে হামলার কারণ আহলে সুন্নাতের বিরুদ্ধে লা-মযহাবীদের বিশ্বাসঘাতকতা। হানাফী ও শাফেঈদের মধ্যে সংঘর্ষের কোনো ঘটনা-ই ইতিহাসে ঘটে নি। চার মযহাবের অন্তর্গত মুসলমানবৃন্দ একে অপরকে ভাইয়ের মতো ভালোবেসেছেন। আহলে সুন্নাতের বিরুদ্ধে রশীদ রেযার এই কুৎসা সাঈদ কুতুব নামের আরেক ধর্ম সংস্কারকও রটনা করেছিল; কিন্তু তাকে আমাদের প্রকাশিত **'ইসলামে ধর্ম সংস্কারক'** বইটিতে জবাব দেয়া হয়েছে।
৭/ – "অনেক দেশে দেখা যায়, হানাফীরা শাফেঈদের সাথে (একত্রে) নামায পড়ে না। ইমামের পেছনে জোরে 'আমীন' বলা এবং (বসে) 'তাহিয়্যা' পাঠের সময় আঙ্গুল উঁচু করা নিয়ে শত্রুতার সূত্রপাত হচ্ছে।"

মযহাবের বইপত্রে স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে কোনো এক মযহাবের অনুসারী মুসলমান অপর কোনো মযহাবের অনুসারীর পেছনে (ইমামতিতে) নামায পড়তে পারবেন। এবাদতের ক্ষেত্রে চার মযহাবের মধ্যকার ছোটখাটো মতপার্থক্য থেকে শত্রুতার সূত্রপাত হতে পারে মর্মে ধারণাটি মযহাব-বিরোধী মুলহিদ ও যিনদিক্কদের দিবাস্বপ্ন ও কুৎসা ছাড়া আর কিছু নয়। পৃথিবীর সর্বত্র চার মযহাবের মুসলমানবৃন্দ একে অপরের পেছনে নামায পড়ছেন; কেননা তাঁরা সবাই একে অপরকে ভাই বলে জানেন এবং ভালোবাসেন। মহান ওলী ও হক্কানী আলেম মওলানা জিয়াউদ্দীন খালেদ আল-বাগদাদী (বেসাল – ১২৪২ হিজরী/১৮২৬ খৃষ্টাব্দ) ছিলেন শাফেঈ মযহাবের অন্তর্গত। তাঁর পীর ও মুর্শেদ (আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক) হযরত আবদুল্লাহ দেহলভী, যিনি তাঁকে ফয়েয (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) ও খেলাফত (অন্যদের মাঝে আধ্যাত্মিকতা প্রচারের সনদ) দান করেছিলেন, তিনি ছিলেন হানাফী। বড় পীর গাউসুল আ'যম হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহমতুল্লাহে আলাইহে: বেসাল ৫৬১ হিজরী/১১৬৫ খৃষ্টাব্দ) ছিলেন শাফেঈ। হাম্বলী মযহাবকে বিস্মৃত হতে দেখে তিনি একে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার জন্যে এর অনুসরণ আরম্ভ করেন। ইমাম জালালউদ্দীন মোহাম্মদ মহল্লী (বেসাল – ৮৬৪ হিজরী/১৪৫৯ খৃষ্টাব্দ), যিনি **'জালালাইন'** তাফসীরগ্রন্থের লেখক, তিনি শাফেঈ ছিলেন; মালেকী মযহাবের অনুসারী ইমাম আহমদ ইবনে সাবী (বেসাল – ১২৪১ হিজরী/১৮২৫ খৃষ্টাব্দ) এই তাফসীরগ্রন্থের একখানি ব্যাখ্যা (শরাহ) লিখে এটিকে সর্বত্র প্রচার-প্রসারের সুযোগ করে দেন। সূরা ফাতিরের ৬ষ্ঠ আয়াত ব্যাখ্যাকালে ইমাম সাবী লেখেন, "আরবের হেজাযে বসবাসকারী

(ওহাবী) লা-মযহাবীরা দাবি করে যে তারাই একমাত্র মুসলমান। তারা এও বলে যে আহলে সুন্নাতের অনুসারী মুসলমানবৃন্দ নাকি মুশরিক (মূর্তি পূজারী), যদিও সুন্নীরা-ই হলেন প্রকৃত মুসলমান। এই লা-মযহাবী ওহাবীরা আসলে মিথ্যুক! আমরা আশা করি, আল্লাহতা'লা এ সব গোমরাহ লোকদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন।" তাফসীর বই '**আল-বায়দাবী**'র ওপর কৃত ইমাম সাবীর 'হাশিয়া' (টীকা)-ও যথেষ্ট প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত আলেম-এ-দ্বীন ইমাম বায়দাবী (বেসাল – ৬৮৫ হিজরী/১২৮৬ খৃষ্টাব্দ) ছিলেন শাফেঈ মযহাবের অনুসারী। তাঁর লেখা তাফসীরগ্রন্থটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তাফসীরগুলোর মধ্যে অন্যতম। চার মযহাবের বেশির ভাগ আলেম-ই এই তাফসীরের প্রশংসা করেছেন এবং এর ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ লিখেছেন। উদাহরণস্বরূপ, হানাফী আলেম শায়খযাদা মোহাম্মদ আফেন্দী কৃত ব্যাখ্যাটি অত্যন্ত মূল্যবান ও বিখ্যাত। সকল মুসলমান-ই জানেন, চার মযহাবের উলেমাবৃন্দ কর্তৃক একে অপরের প্রতি প্রশংসা ও মহব্বত প্রকাশ করে লেখা বইপত্র হাজার হাজারেরও বেশি হবে ['আঙ্গুল উঁচু' করার ব্যাপারে বিস্তারিত আছে ৩৬ অনুচ্ছেদে]।

৮/ – "ইসলামী উম্মাহ'র অনেকে গভীর জ্ঞানী আলেম হয়েছিলেন। এ রকম মোর্শেদদের মধ্যে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী এবং শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া অন্যতম।"

রশীদ রেযা এখানে ইবনে তাইমিয়ার মতো একজন লা-মযহাবীকে ইসলামী আলেম ও মোর্শেদ হিসেবে উপস্থাপন করেছে এবং তাকে মহান ইসলামী বুযর্গ-আলেম ইমাম গাযযালী (রহ:)-এর মতোই একজন মুজতাহিদ বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছে। অথচ এই ইবনে তাইমিয়া-ই বলেছিল যে আল্লাহ পাক হলেন বস্তু; সে অমুসলমানদের চিরস্থায়ী দোযখ-বাসের ইসলামী আকীদায় বিশ্বাস-ই করে নি; সে দাবি করেছিল ফরয নামায বাদ পড়লে তা কাযা পড়ার প্রয়োজন নেই; অনুরূপ আরও অনেক বদ-আকীদা দ্বারা ইসলাম ধর্মকে সে ভেতর থেকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা করেছিল। এই দু'টি নাম পাশাপাশি লেখা একটি বিভ্রান্তিকর উদ্ভাবন, যার নমুনা হলো কোনো হীরার পাশে একখানি কালো পাথরের খণ্ড স্থাপন করা। মালেকী আলেম ইমাম সাবী (রহ:) লিখেন: "আহলে সুন্নাতের উলামা-এ-কেরাম বর্ণনা করেন যে ইবনে তাইমিয়া নিজে সঠিক পথ হতে গোমরাহ হয়ে গিয়েছিল এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছিল। মালেকী মযহাবের আলেম ইমাম আশহাবের সাহচর্য তার ছিল মর্মে যে দাবি করা হয়, তা সর্বৈব মিথ্যে।" [**'জালালাইন'** তাফসীরগ্রন্থের ব্যাখ্যামূলক পুস্তকে সূরা বাকারার ২৩০ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য]
৯/ – রশীদ রেযা বলে: "**আল-মানার** সাময়িকীতে ১৩১৫ হিজরী/১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ সালে আমার প্রকাশিত (বিভিন্ন) লেখায় আমি লিখেছিলাম যে তাকলীদ গ্রহণ একটি ভ্রান্তি। ইমাম আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম আল-জাওযিয়্যার অনুসরণে আমার ওই লেখাগুলোর সার-সংক্ষেপ নিয়ে আমি এই বই **মুহাওয়ারাত** প্রকাশ করেছি।"

তাকলীদ তথা চার মযহাবের যে কোনোটির অনুসরণ ভ্রান্তিমূলক আখ্যা দিয়ে এই ধর্ম সংস্কারক গত চৌদ্দ'শ বছর যাবত এ পৃথিবীতে আগমনকারী কোটি কোটি সুন্নী মুসলমানকে কলুষিত করার অপপ্রয়াস পেয়েছে। সে বোঝাতে চেয়েছে, তাঁরা সবাই জাহান্নামে যাবেন। এ অপবাদ তো হতেই হবে, কেননা লা-মযহাবী যিনদিক ও মুলহিদ তথা ধর্ম সংস্কারকরা ভাল করেই জানে নিজেদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে এই মর্মে যে, তারা প্রকাশ্যে আহলে সুন্নাতকে আক্রমণ করতে অপারগ। তাই তারা মিথ্যে, ছলচাতুরী ও ধোকাপূর্ণ কথার মার-প্যাঁচে পর্দার আড়াল থেকে কলকাঠি নেড়ে থাকে। কোনো ইমামুল মযহাবের অনুসরণকে ভ্রান্তি কীভাবে বলা যায়? আল্লাহতা'লা সূরা নহল ও সূরা

আম্বিয়ায় এরশাদ ফরমান, “***ফাসয়ালূ আহলায্ যিকরে ইন কুনতুম লা তা' আলামূন***”, মানে **“যাঁরা জানেন তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করে শেখো!”** এবং “**তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর তথা আদেশদাতা (ঐশী আজ্ঞার), তাঁদেরকে মান্য করো**।” এই কারণেই কোনো ইমামুল মযহাবের অনুসরণ ওয়াজিব। তাঁকে অনুসরণ করা ভ্রান্তি বলে এই গোমরাহ লা-মযহাবী/’সালাফী’ এ কথা বুঝিয়েছে যে, “তাঁকে অনুসরণ করো না, বরং আমাকে করো!” সে মুসলমানদেরকে সঠিক পথের অনুসরণ/অনুকরণ ছেড়ে নিজের গোমরাহ পথের দিকে টেনে নিতে অপতৎপর। লা-মযহাবী/’সালাফী’রা ভ্রান্ত পথের অনুসরণ/অনুকরণকারী। তাকলীদ (অনুসরণ/অনুকরণ) দুই ধরনের হয়ে থাকে। প্রথমটি অমুসলমানদের দ্বারা তাদের পিতামাতা ও পাদ্রী-পুরোহিতদের অনুসরণ এবং ফলশ্রুতিতে অবিশ্বাসীতে রূপান্তর। এই ধরনের তাকলীদ অবশ্যই বাতিল (ভ্রান্তি)। কুরআন-হাদীস এই তাকলীদকে নিষেধ করেছে। আর স্রেফ পিতামাতাকে অনুসরণ করে কোনো মুসলমানের পক্ষে নিজেকে মুসলমান দাবি করাও যথেষ্ট নয়। যে ব্যক্তি ঈমানের ছয়টি মৌলনীতির অর্থ জানেন, স্বীকার করেন এবং তাতে বিশ্বাস করেন, তিনি-ই হলেন মুসলমান। এটি নিশ্চিত যে ঈমানী বিষয়ে (বাতেলপন্থী) কাউকে অনুসরণ ভ্রান্তি। অতএব, আহলে সুন্নাতের সাথে দ্বিমত পোষণ করে লা-মযহাবী/’সালাফী’দের বিশ্বাস করা ভুল অনুকরণ। উপরন্তু, এ ধরনের অনুসরণকে আ’মলের ক্ষেত্রে তাকলীদের সাথে তুলনা করাও আরেক ভ্রান্তি। এই দ্বিতীয় ধরনের তাকলীদ কুরআন-হাদীসে আদিষ্ট হয়েছে। সত্যপন্থী উলামাবৃন্দ যে সঠিক কথাটি লিখেছেন, তার প্রমাণবহ হলো নিম্নের হাদীস – “***লা তাজতামিউ উম্মাতী আলাদ্ দালালাত***”, অর্থাৎ, **“আমার উম্মত (মুসলমান সম্প্রদায়) গোমরাহী তথা বিচ্যুতিতে ঐকমত্য পোষণ করবে না”** [এই হাদীস শরীফ উদ্ধৃত হয়েছে মওলানা আবদুল গণী নাবলুসী (বেসাল – ৯৭৩ হিজরী/১৫৬৫ খৃষ্টাব্দ) প্রণীত ‘**খুলাসাতুত্ তাহকিক ফী বয়ানি হুকমিত্ তাকলীদ**’ গ্রন্থে; ইমাম আবদুল ওয়াহহাব শারানী রচিত ‘**আল-মিযানুল কুবরা’** পুস্তকের মুখবন্ধে; ইমাম মুজাদ্দেদে আলফে সানী (বেসাল – ১০৩৪ হিজরী/১৬২৪ খৃষ্টাব্দ) কৃত ‘**মকতুবাত শরীফ**’ বইয়ের বিভিন্ন পত্রে; এবং মওলানা ইউসূফ নাবহানী লিখিত **‘হুজ্জাত-আল্লাহি ’আলাল ‘আলামীন’** পুস্তকের শেষে]। কাজেই যারা এর বিরোধিতা করে, তারা অন্যায় ও ভ্রান্তিতে অধঃপতিত। বিগত চৌদ্দ’শ বছরের ইসলামী ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক আহলে সুন্নাতের বুযূর্গানে দ্বীন, হক্কানী আলেম-উলেমা ও আউলিয়া কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে অ-মুজতাহিদ মুসলমানদের প্রতি এটি ওয়াজিব হয়েছে যে তাঁরা তাঁদের বিশ্বাস ও আস্থাভাজন এবং পছন্দণীয় কোনো মুজতাহিদ ইমামকে অনুসরণ করবেন, যাতে তাঁরা নিজেদের এবাদত-বন্দেগী ও আ’মল (ধর্ম অনুশীলন) সঠিক ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন। যে ব্যক্তি এই সর্বসম্মতিকে অস্বীকার করবে, সে ওপরের হাদীস শরীফেরও অস্বীকারকারী হবে। এই সর্বসম্মতি আরও প্রতীয়মান করে যে কোনো মুজতাহিদকে নিজের এজতেহাদ (গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত) অনুযায়ী চলতে হবে এবং তিনি অন্য মুজতাহিদকে অনুসরণ করতে পারবেন না। প্রত্যেক সাহাবী (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জীবনে অন্ততঃ একবার দেখেছেন এমন মুসলমান)-ই মুজতাহিদ ছিলেন। এই কারণেই কিছু কিছু আমলের ব্যাপারে তাঁরা একে অপরের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন। অনুরূপভাবে, এক শুক্রবারে (জুমু’আর নামাযে) ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ:)-এর পুনরায় ওযূ না করা কিংবা ইমাম আবূ হানিফা (রহ:)-এর মাযার যেয়ারতকালে নামায আদায়রত অবস্থায় ইমাম শাফেঈ (রহ:)-এর রুকুর পর হাত না তোলার ঘটনাগুলো অন্য কারো তাকলীদ ছিল না; তাঁরা এ সব ক্ষেত্রে নিজেদের এজতেহাদকেই অনুসরণ করেছিলেনমাত্র।

১০/ – ধর্ম প্রচারক ও ধর্ম সংস্কারকের কথপোকথনের প্রথমেই রশীদ রেযা বলে: "পুণ্যবান তরুণ ধর্ম সংস্কারক মুসলমানদের সুখ-শান্তি অর্জনের জন্যে তাঁদেরকে তাকলীদের উপদ্রব থেকে রক্ষা করতে ইচ্ছুক, যে তাকলীদ পরবর্তীকালে আবির্ভূত হয়েছিল; অতঃপর সে তাঁদেরকে কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফ আস্ সালেহীনের পথ অনুসরণে সহায়তা করতে আগ্রহী। ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে এমন কি মেষপালকরাও কুরআন-সুন্নাহ থেকে সরাসরি ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ করতো।"

রশীদ রেযার ভাঁড়ামি দেখুন! সে তার মতোই একজন গোমরাহ লোককে 'পুণ্যবান' আখ্যা দিয়েছে। অজ্ঞ ধর্ম সংস্কারকের মুখ দিয়ে সে প্রবীণ সম্মানিত ধর্মপ্রচারককে উপদেশ দেয়ার অপপ্রয়াস পেয়েছে। নেয়ামতপূর্ণ (আশীর্বাদধন্য) তাকলীদ, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (দ:)-এর আদেশ এবং ইসলামী উলামাবৃন্দের সর্বসম্মতি অনুযায়ী জরুরি, তাকে সে 'উপদ্রব' বলেছে। কিন্তু সে অনুধাবন করতে পারছে না যে চার মযহাবের কোনো একটির অনুসরণ/অনুগমন হলো সঠিক পথে চলা; আর একজন লা-মযহাবীকে অনুসরণ করে চার মযহাবের কোনো একটির সাথে ভিন্নমত পোষণ হলো ভ্রান্তি। সে সম্মানিত ধর্মপ্রচারক ও নেয়ামতপূর্ণ 'ওয়ায়েয' শব্দটিকে নিয়ে উপহাস করেছে। কিন্তু সে জানে না, যে ব্যক্তি ধর্মীয় দায়িত্বসম্পন্ন উলেমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট নেয়ামতপূর্ণ শব্দগুলো নিয়ে বিদ্রূপ করে, সে অমুসলিমে পরিণত হয়। **"মুসলমানদেরকে শাসন করবে সবচেয়ে জালেম ও হীন প্রকৃতির ব্যক্তিবর্গ"** – এই হাদীসটি সম্পর্কে আমরা যদি না জানতাম, তাহলে আমরা বিস্মিত হতাম এই দুঃখজনক বাস্তবতা দেখে যে মিসরের মতো একটি মুসলমান দেশে এই লোকটি (রশীদ রেযা) ফতোওয়া জারি করার পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। ওহে হীন যিনদিক্ক! মুসলমানদেরকে উপহাস না করে এবং ধর্মপ্রচারকদেরকে নাটকে অভিনয় না করিয়ে সততার সাথে অগ্রসর হয়ে তুমি ইহুদী, খৃষ্টান মিশনারী, ফ্রী-মেইসন ও সমাজতন্ত্রীদেরকে চ্যালেঞ্জ করো না কেন? না, তুমি তো তাদের দিকে সন্দেহের চোখে তাকাতেও সক্ষম নও। ফ্রী-মেইসন চক্র হলো তোমার প্রভু, তোমার-ই পৃষ্ঠপোষক।

তুমি নিজেকে কী মনে করো যখন তুমি ধোকাপূর্ণ এ কথা বলো, "মুসলমানদেরকে তাকলীদের উপদ্রব থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে……এবং তাঁদেরকে কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফবৃন্দের পথের অনুসারী করার উদ্দেশ্যে?" তোমার কথা পরস্পরবিরোধী। কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফ আস্ সালেহীনের পথের অনুসরণ/অনুগমন কি তাকলীদ নয়? আর তুমি যে তাকলীদের কথা বলছো, তা একমাত্র সম্ভব আয়েম্মা-এ-মযাহিব (চার মযহাবের ইমামবৃন্দ)-কে অনুসরণ করেই। এই তাকলীদ, যাকে তুমি 'উপদ্রব' বলছো, তাকে ছেড়ে দেয়ার মানে হবে কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফবৃন্দের পথের তাকলীদকে বর্জন করা এবং ফলশ্রুতিতে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়া, যে ভুল তাকলীদ তুমি (মনে-প্রাণে) চাও। মহানবী (দ:) এরশাদ ফরমান, **"যে ব্যক্তি নিজের মতানুযায়ী কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা করবে, সে অমুসলিম হয়ে যাবে।"** তুমি মুসলমান সমাজকে ভ্রান্ত তাকলীদের দিকে টানতে চাও। তোমার মুখ থেকে মুখোশ সরাও! তুমি যে ইসলামের শত্রু, এ সত্যটি স্বীকার করো; যাতে আমরা তোমার জবাব দিতে পারি। আপাততঃ আমরা তোমার সহযোগী এক ফ্রী-মেইসনের কথা উদ্ধৃত করবো: "তুমি কি মনে করো সবাই চোখে দেখে না এবং সবাই বোকা?"
প্রথম শতাব্দীর মুসলমানদেরকে 'মেষপালক' বলে অপমান করো না! তাঁদেরকে অজ্ঞ হিসেবে উপস্থাপন করো না! তাঁরা সবাই জ্ঞানী ও শিক্ষিত ছিলেন, চাই তাঁরা হোন মেষ পালনকারী, যোদ্ধা বা সেনাপতি। তাঁরা সবাই ছিলেন মুজতাহিদ। নিশ্চয়ই তাঁরা সরাসরি কুরআন মজীদ থেকে জ্ঞান

আহরণ করতে সক্ষম ছিলেন।
হিজরী ১১৫০ (১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ) সাল হতে লা-মযহাবী/’সালাফী’ মতবাদ, অর্থাৎ, আহলে সুন্নাতের উলেমাবৃন্দকে অমান্য করার বেদআত সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সউদী আরবের গণ্ডমূর্খরা এই ধ্বংসাত্মক ও বিভেদ সৃষ্টিকর আচরণে নেতৃত্ব দিচ্ছে, যেটি ভেতর থেকে ইসলাম ধর্মের ক্ষতি সাধন করছে এবং মুসলমান ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রুতা সৃষ্টি করছে। লা-মযহাবী/‘সালাফী’রা আহলে সুন্নাতের মুসলমানদেরকে আক্রমণ ও হাজার হাজার নিরপরাধ মুসলমান নর-নারী ও শিশুকে জুলুম-অত্যাচার করে হত্যা এবং তাঁদের সম্পদ-সম্পত্তি লুঠপাট করার পর বৃটিশের সহায়তায় ১৩৫০ হিজরী মোতাবেক ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ সালে তাদের রাজতন্ত্র কায়েম করে; অতঃপর তারা তাদের এই বাতেল মতবাদ প্রচার-প্রসারের অসৎ উদ্দেশ্যে কূটনৈতিক প্রভাব ও প্রতি বছর ব্যয়কৃত কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রার শক্তিবলে বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। মিথ্যে ও কুৎসায় পূর্ণ তাদের প্রকাশনা দ্বারা অজ্ঞ-মূর্খদেরকে তারা ধোকা দিচ্ছে এবং ইসলামে অন্তর্ঘাতমূলক অপতৎপরতা অব্যাহত রেখেছে।

ওহাবী মতবাদ প্রবর্তন করেছিল মোহাম্মদ ইবনে আব্দিল ওয়াহহাব। তার জন্ম ১১১১ হিজরী/১৬৯৯ খৃষ্টাব্দ সালে আরবের নজদ অঞ্চলে; মৃত্যু হয় ১২০৬ হিজরী/১৭৯২ খৃষ্টাব্দ সালে। তার বাবা ও ভাই সুলাইমান ইবনে আব্দিল ওয়াহহাব ছিলেন সুন্নী মুসলমান ও আলেম। হেজাযের অন্যান্য উলামাবৃন্দের মতাে তাঁরাও মুসলমানদের কাছে ব্যাখ্যা করেন যে ওহাবী মতবাদ একটি ভ্রান্ত পথ। প্রকৃত ইসলামের রূপরেখা আহলে সুন্নাতের আকীদা-বিশ্বাসকে সমুন্নত রাখতে অনেক বইপত্র লেখা হয়। উদাহরণস্বরূপ, সুলাইমান ইবনে আব্দিল ওয়াহহাব তাঁর ভাই (মোহাম্মদ ইবনে আব্দিল ওয়াহহাব)-কে উপদেশ দিতে নিজ পুস্তকের প্রারম্ভে লিখেন:

”আল্লাহ পাক তাঁর মহানবী (দ:)-কে সমগ্র মানব জাতির জন্যে রাসূল করে পাঠিয়েছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর প্রতি প্রেরিত তাঁর ঐশীগ্রন্থ **আল-কুরআনে** মানুষের জন্যে যা যা প্রয়োজনীয় তার সবই ব্যাখ্যা করেছেন। নবী করীম (দ:)-কে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তিনি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আল্লাহতা’লা ঘোষণা করেন যে তিনি মহানবী (দ:)-এর মাধ্যমে প্রেরিত ইসলাম ধর্মকে দুনিয়ার শেষ সময় পর্যন্ত পরিবর্তন ও বিকৃতি থেকে হেফাযত করবেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে বিশ্বনবী (দ:)-এর উম্মত-ই হলেন মানব জাতির মাঝে শ্রেষ্ঠ; আর হুযূর পূর নূর (দ:) শুভ সংবাদ দেন যে এই উম্মত দুনিয়ার অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত (সামগ্রিকভাবে) বিচ্যুত হবেন না। তিনি আমাদের প্রতি তাঁর সুন্নাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার আদেশ করেছেন। আল্লাহ পাক সূরা নিসার ১১৫ আয়াতে এরশাদ ফরমান: **‘আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের পথ থেকে আলাদা পথে চলে, আমি তাকে তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবো এবং তাকে দোযখে প্রবেশ করাবো; আর তা প্রত্যাবর্তন করার কতোই মন্দ স্থান!’** অতএব, এতদ্বারা ইসলামী উলেমাবৃন্দের **‘এজমা’** (ঐকমত্য, সর্বসম্মতি) ধর্মীয় জ্ঞানের জন্যে হুজ্জা (প্রমাণ) ও দলিল হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। এই এজমা’ থেকে বিচ্যুতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যারা এই এজমা’ সম্পর্কে জানে না, তাদের উচিত এ বিষয়ে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করে শেখা, যা সূরা নহলের ৪৩ আয়াতে আদিষ্ট হয়েছে। এই আয়াতটি একটি হাদীস শরীফে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে, **’তোমরা যা জানো না তা যাঁরা জানেন, তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করো। অজ্ঞতার চিকিৎসা (আরোগ্য) জিজ্ঞেস করে শেখার মধ্যেই নিহিত।’**
”উলামা-এ-ইসলামের সর্বসম্মত ভাষ্যানুযায়ী, মুজতাহিদ হলেন সেই মহান আলেম, যিনি আরবী

শব্দভাণ্ডার মুখস্থ করেছেন এবং শব্দের বিভিন্ন অর্থ, আক্ষরিক ও রূপক অর্থও বোঝেন; যিনি ফেকাহবিদ ও হাফেয (কুরআন মুখস্থকারী) এবং কের'আতের পদ্ধতিগুলো জানেন; যিনি কুরআন মজীদের সকল আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এবং মোহকাম (স্পষ্ট আজ্ঞা) ও মোতাশাবেহ (দ্ব্যর্থবোধক, অস্পষ্ট), নাসেখ (রহিতকারী) ও মানসুখ (রহিতকৃত), কাসাস ও অন্যান্য আয়াতের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে সক্ষম এবং সহীহ, মুফতারী, মুততাসিল, মুনকাতী', মুরসাল, মুসনাদ, মাশহুর ও মওকুফ হাদীসগুলোও চেনেন; যিনি ওয়ারা (কৃচ্ছ্রব্রত)-এর অধিকারী এবং তাযকিয়া-এ-নফস্ (আত্মিক পরিশুদ্ধি) অর্জন করেছেন; এবং যিনি সাদেক্ব (সত্যনিষ্ঠ) ও আমীন (বিশ্বাসভাজন)। এই ধরনের মহৎ গুণাবলীসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ইসলামী জ্ঞান বিশারদগণই কেবল তাকলীদ বা অনুসরণযোগ্য এবং তাঁরাই ফতোওয়া জারি করার এখতেয়ারসম্পন্ন। এর মধ্যে কোনো একটি গুণ যদি কারো না থাকে, তবে তিনি মুজতাহিদ হতে পারবেন না এবং তাকে অনুসরণ করাও যাবে না। এমতাবস্থায় তাকেই অপর কোনো মুজতাহিদের অনুসারী হতে হবে। অতএব, একজন মুসলমান হয় **মুজতাহিদ**, নয়তো **মুকাল্লিদ** (তাকলীদ অনুশীলনকারী)। তৃতীয় কোনো শ্রেণী এখানে নেই। মুকাল্লিদদের জন্যে কোনো একজন মুজতাহিদকে অনুসরণ করা ফরয। এটি সর্বসম্মতভাবে ঘোষিত হয়েছে। এমন কি ইবনে কাইয়্যেম আল-জাওযিয়্যা (মৃত্যু: ৭৫১ হিজরী/১৩৫০ খৃষ্টাব্দ), যাকে ওহাবীরা 'আল্লামা' বলে প্রশংসা করে এবং যার প্রতিটি কথাই তাদের কাছে দলিল, সে-ও নিজের **'এ'লাম আল-মুকি'ন'** শীর্ষক পুস্তকে বলেছে, 'যে ব্যক্তি এজতেহাদের জন্যে প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণে ব্যর্থ, কুরআন-হাদীস থেকে সিদ্ধান্ত নেয়ার অনুমতি তার নেই।' বর্তমানকালের মানুষেরা কুরআনের আয়াত ও হাদীস আবৃত্তিকারী এবং ওগুলোকে নিজেদের মতানুযায়ী (মনগড়া) ব্যাখ্যাকারী লোকদেরকে আলেম হিসেবে গণ্য করে। যাঁরা আহলে সুন্নাতের উলেমাবৃন্দকে নিজেদের বইপত্রে উদ্‌ধৃত করেন, তাঁদের কোনো কথা মানুষেরা শুনছে না। আজকে এজতেহাদের একটিমাত্র পূর্বশর্ত পূরণেও অক্ষম গণ্ডমূর্খ ও গোমরাহ লোকদেরকে ধর্মীয় কর্তৃত্বসম্পন্ন আলেম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আল্লাহতা'লা মুসলমানদেরকে এই বালা- মসীবত থেকে রক্ষা করুন, আমীন!" [সুলাইমান ইবনে আব্দিল ওয়াহহাব কৃত **'আস্ সাওয়াইকুল ইলাহিয়্যা ফীর-রাদ্দি 'আলাল ওয়াহহাবিয়্যা'**, নুহবাতুল আহবার, বাগদাদ, ১৩০৬ হিজরী/১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ; ফটোগ্রাফিক পুনর্মুদ্রণ, ইস্তাম্বুল, ১৩৯৫ হিজরী/১৯৭৫ খৃষ্টাব্দ]
পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে যেমনটি উদ্‌ধৃত হয়েছে, রশীদ রেযা লা-মযহাবী ইবনে কাইয়্যেম আল-জাওযিয়্যাকে 'ইমাম' ও 'আল্লামা' হিসেবে প্রশংসা করেছে এবং বোঝাতে চেয়েছে সে তারই পদাংক অনুসরণ করছে। আর ওপরে উদ্‌ধৃত হয়েছে যে ইবনে কাইয়্যেম আল-জাওযিয়্যা কুরআন-হাদীস থেকে অ-মুজতাহিদদের সিদ্ধান্ত নেয়াকে নিষেধ করেছে। এমতাবস্থায় রশীদ রেযা তার মতের বিরোধিতা করেছে; আর এটি-ই প্রতীয়মান করে সে দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান নয় এবং প্রকৃতপক্ষে সে একজন দ্বীনের শত্রু নিশ্চয়; এমন এক শত্রু যার উদ্দেশ্য হলো পর্দার অন্তরালে থেকে ইসলামের বিনাশ সাধনের অপচেষ্টা করা।

১১/ – রশীদ রেযা কলম হাতে ধর্ম সংস্কারক ও ওয়ায়েয (ধর্ম প্রচারক)-এর মধ্যকার কথপোকথন লিপিবদ্ধ করতে থাকে। সে ধর্ম সংস্কারকের প্রশংসা করে একদিকে যেমন তাকে আসমানে ওঠায়, অপর দিকে সকল ক্ষেত্রেই ধর্ম প্রচারককে তেমনি হেয় প্রতিপন্ন করে এবং তাঁর প্রতি ঘৃণাও প্রকাশ করে। সে তার নিজের ঝোঁকের মাথায় বলা বোকামিপূর্ণ কথাবার্তা ধর্মপ্রচারকের প্রতি আরোপ করে।

রশীদ রেযা তার এই বইয়ে কী লিখেছে না লিখেছে, তা নিয়ে আমরা ব্যাপৃত হবো না, বরং আমরা সেই সব উত্তর লিখবো, যা ধর্ম প্রচারকের মুখ থেকে আশা করা যায়, যা তাঁর জিহ্বার সাথে মানানসই। রশীদ রেযা যে উত্তর তাঁর কাছ থেকে যথাবিহিত বলে আশা করে, আমরা তা লিখবো না। আমরা বিশ্বাস করি, মনোযোগের সাথে পড়লে আমাদের প্রিয় পাঠক এবং নির্মল অন্তরের ধর্মীয় দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ ফ্রী-মেইসন চক্রের ধোকাবাজি সম্পর্কে স্পষ্ট বুঝতে পারবেন।

কোনো ধর্ম প্রচারক নিশ্চয় এতো অজ্ঞ নন যে তিনি যুক্তিবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, জীবদেহের গঠনসংক্রান্ত বিজ্ঞান, এবং এমন কি ফেকাহ ও তাসাউফশাস্ত্রে ঈমানের সংজ্ঞা একই বলে মনে করবেন, কেননা, তাঁকে হতে হবে বিদ্বান যিনি মাদ্রাসায় অগ্রসর/উচ্চতর বিদ্যাচর্চার সময় এগুলো অধ্যয়ন করেছেন এবং বুঝেছেন। কিন্তু তিনি যদি মাদ্রসায় শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে কায়রোর মুফতী আবদুহ্ (মৃত্যু: ১৩২৩ হিজরী/১৯০৫ খৃষ্টাব্দ) ও তার আনাড়ী শিষ্যদের দ্বারা সংস্কৃত জামেউল আযহার বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি এ সব সংজ্ঞার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে বিভ্রান্ত হবেন। এটি এ কারণে যে, ফ্রী-মেইসন গোষ্ঠী উসমানীয় সাম্রাজ্যে এবং মিসরে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বৈজ্ঞানিক ও অগ্রসর/উচ্চতর ধর্মীয় কোর্সগুলো ছেঁটে ফেলে দিয়েছে। তারা গড়ে তুলেছে আধুনিকতাবাদী ধর্ম সংস্কারকবর্গ, যারা দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ।
কোনো ধর্ম প্রচারক হলেন এমন এক মুসলমান, যিনি গীবত বা পর-নিন্দার অর্থ ভাল করেই জানেন। তিনি জানেন, কোনো দলের বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কোনো কথা বল্লে গীবত হয় না, যদিও এই ধর্ম সংস্কারকের (রশীদ রেযার) এ কথা জানা নাও থাকতে পারে।

১২/ – ধর্ম সংস্কারক রশীদ রেযা বলে: “এজমা তথা ’ঐকমত্যের’ মতো ভিত্তিহীন কথাবার্তার খাতিরে আমরা যা প্রত্যক্ষ করি, তা অস্বীকার করা কি যুক্তি ও বিচার-বিবেচনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়?”

এখানে সে ইসলামের মৌলিক শিক্ষার প্রতি বিদ্রূপ করছে এবং দাবি করছে যে **‘এজমা’** শব্দটির কোনো ভিত্তি-ই নেই। ফেকাহ’র উলেমাবৃন্দ এই শব্দটি সম্পর্কে জেনেছেন নিচের হাদীস শরীফ থেকে; রাসূলে পাক (দ:) এরশাদ ফরমান: **“লা তাজতামিউ উম্মাতী আলাদ্ দালালাত”**, অর্থাৎ, “আমার উম্মত গোমরাহী তথা পথভ্রষ্টতায় ঐকমত্য পোষণ করবে না।” কিন্তু এই তথ্য ধর্ম সংস্কারক জানবে কী করে? সে তো তার তথাকথিত আধুনিক প্রভুদের কাছ থেকে এটি শোনে নি!

’এজমা’ (ঐকমত্য) ছিল (ইসলামের প্রাথমিক যুগের) কোনো এক শতাব্দীর সমসাময়িক মুজতাহিদবৃন্দের এজতেহাদসমূহের পারস্পরিক ঐক্য। হিজরী চতুর্থ শতকের পর আর কোনো মুজতাহিদ মুতলাক্ব (৪০ নং অনুচ্ছেদে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য) এ পৃথিবীতে আসেন নি; তাই সেই সময় হতে আর কোনো এজমা-ও হয় নি। পূর্ববর্তী শতকের এজমা’গুলোকে পরবর্তী শতকগুলোর মুজতাহিদবৃন্দ প্রামাণ্য দলিল হিসেবে ব্যবহার করতেন। মুকাল্লিদ, অজ্ঞ-মূর্খ এবং বিশেষ করে ধর্ম সংস্কারকদের ঐকমত্যকে এজমা’ বলা যায় না। সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-বৃন্দের এজমা’-ই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান। তাঁদের পরে আগত উলেমাবৃন্দ এজমা’ হিসেবে বর্ণিত বিষয়গুলো সংগ্রহ করে নিজেদের বইপত্রে লিপিবদ্ধ করেন। যে সব বিষয়ে এজমা’ হয় নি সেগুলোকে এবং অ-মুজতাহিদদের কথাবার্তাকে এজমা’ আখ্যায়িত করা হতে নিবৃত্ত করা হয়।

আহলে সুন্নাতের উলামা-এ-কেরামের মতে **আল-আদীল্লাত আশ্ শরীয়ত**, অর্থাৎ, ইসলামী আইন-কানুন বের করার উৎস হচ্ছে চারটি: কেতাব, সুন্নাহ, কিয়াস আল-ফুকাহা এবং এজমা' আল-উম্মাহ। কেতাব হলো আল-কুরআন, সুন্নাহ হাদীস শরীফ। এই দুটোকে **'নস্'**-ও বলা হয়। কেয়াস আল-ফুকাহা হলো মুজতাহিদ উলামাদের এজতেহাদের সমষ্টি। যে ব্যক্তি বলে এজমা' কোনো প্রামাণ্য দলিল নয়, সে কাফেরে পরিণত হয় না বটে, কিন্তু সে বেদআতী হয়ে যায়; কেননা সে দ্ব্যর্থবোধক 'নস'গুলোর তা'বিল তথা ভিন্নতর ব্যাখ্যা প্রদানের সময়ই ও কথা বলে থাকে। খারেজী ও অন্যান্য লা-মযহাবীরা এই শ্রেণীভুক্ত। তাদের এজমা'-বিরোধী কথাবার্তা কুফরী তথা অবিশ্বাসের জন্ম দেয় না। তবে তা'বিলের ব্যাপারে অনবধান যে সব অজ্ঞ-মূর্খ লোক এজমা'র সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নিজেদের ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করে থাকে, তারা কুফরীর জন্ম দেয়।
কোনো ধর্ম প্রচারক কল্পনা বা অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলেন না। তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত সম্ভাবনার ওপর নির্ভর করে নেন না। তিনি জানেন, পর্যাপ্ত জ্ঞান ছাড়া কথা বলার কিংবা অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার অনুমতি নেই। তিনি যা দেখেন তা অস্বীকার করেন না, কিন্তু তিনি অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন। কারণ কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফ মুসলমানদেরকে চিন্তা ও অধ্যয়ন এবং গবেষণা করতে আদেশ করে; আর যাঁরা তা করেন, তাঁদের প্রশংসাও করে। **'আকা'য়েদ-এ-নাসাফী'** শীর্ষক বইটি, যেটি ধর্ম সংস্কারকের মাদ্রাসায় শিক্ষা করা উচিত ছিল এবং যেটি সম্পর্কে সে হয়তো শুনেই নি, সেটির প্রথম পৃষ্ঠাতেই জ্ঞানার্জনের বিভিন্ন পন্থা বা উপায় সম্পর্কে বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

১৩/ – রশীদ রেযা ধর্ম প্রচারককে ভূগোল শাস্ত্রে বা খবরের কাগজে অবিশ্বাসী ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছে এবং বিধর্মীদের পরিবেশিত তথ্য বা বিবরণের অস্বীকারকারী হিসেবেও চিত্রায়নের অপপ্রয়াস পেয়েছে। ধর্ম প্রচারকের প্রতি তার কুৎসা রটনা দেখুন! মুসলমান সমাজ বিজ্ঞান-চর্চায় আস্থা রাখেন, কিন্তু তাঁরা বিজ্ঞানের মুখোশ পরিহিত অ-মুসলমান শত্রুদের পরিবেশিত মিথ্যায় বিশ্বাস করে ধোকাপ্রাপ্ত হন না। যে সব বিধর্মী মুসলমানদেরকে ধোকা দিতে ও ইসলাম ধর্মের প্রতি কলংক লেপন করতে অপচেষ্টারত এবং যারা বিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন না হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানীর ভান করছে, আর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আবরণে মিথ্যের বেসাতি করছে, তাদের বলা হয় **'বিজ্ঞানের গোঁড়ামিদুষ্ট'**, কিংবা **ধর্ম সংস্কারক** বা **যিনদিক্ব**। এরা হলো বিচ্ছিন্নতাবাদী যারা ইসলাম ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়েরই প্রতি অপবাদ দেয়। মুসলমানবৃন্দ ভূগোলে বিশ্বাস না করলে তাঁরা কি এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন? মুসলমানদের এই ক্ষেত্রে গবেষণা ও আবিষ্কার ভূগোলের যে সব বইপত্রে জ্ঞাত হয়েছে, সেগুলোর নাম ও লেখকের নাম লিপিবদ্ধ আছে **'কাশফ আয্ যুনূন'** ও **'মওদু'য়াত আল-উলূম'** শীর্ষক গ্রন্থে এবং ব্রকেলম্যানের জার্মান **Geschichte der Arabischen Literatur** পুস্তকেও। ধর্ম সংস্কারকের প্রতি আমাদের জিজ্ঞাস্য: সিনজার মরুভূমিতে পৃথিবীর এক মধ্যরেখার দৈর্ঘ্য (দ্রাঘিমা) সর্বপ্রথম কে মেপেছিলেন? তাঁরা কি আহলে সুন্নাহ'র অন্তর্গত চার মযহাবের কোনো একটির অনুসারী ছিলেন না? তাঁদের (বৈজ্ঞানিক) পথের অনুসারী ও তাঁদের মতো কোনো মুসলমান কি বিজ্ঞানে অবিশ্বাস করতে পারেন?

উপরন্তু, 'ভূগোল এমন একটি জ্ঞানের শাখা যা অ-মুসলমানদের অধিকারে, তাই তা গ্রহণযোগ্য নয়', এই মন্তব্যটিকে ধর্মপ্রচারকের প্রতি আরোপ করা মুসলমানদের প্রতি জঘন্য কুৎসা রটনা বৈ কিছু নয়। কোনো অজ্ঞ লোক, যিনদিক্ব বা ধর্ম প্রচারকের ছদ্মবেশধারী কোনো ধর্ম সংস্কারক-ই এ

রকম আজে-বাজে কথাবার্তা বলতে পারে। কিন্তু চার মযহাবের কোনো একটির অনুসারী একজন সম্মানিত মুসলমানের প্রতি এই বাজে কথা বলার অভিযোগ আনা ধর্মের প্রতি বৈরিতারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

মযহাবগুলো বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, হিসাববিজ্ঞান বা পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে নিষেধ করে না; তাহলে কেন কোনো মযহাবের অনুসারী ব্যক্তি তা নিষেধ করবেন? চার মযহাব এই জ্ঞানের শাখাগুলোকে প্রশংসা করে এবং মুকাল্লিদদের এগুলো শিক্ষা করতে বলে। যে ব্যক্তি এগুলোতে বিশ্বাস করে না বা শিক্ষা করে না, সে কোনো ইমাম আল-মযহাবের অনুসারী হতে পারে না। কোনো মযহাবের অনুসারীর প্রতি এই ধরনের আজে-বাজে কথা আরোপ করা কেবল মযহাবগুলোর শত্রুদের পক্ষেই শোভা পায়।

১৪/ – কোনো ধর্মপ্রচারক নিশ্চয় এতো মূর্খ নন যে তিনি মুসলমানদের (বর্তমান) অবহেলিত, করুণ ও অবজ্ঞেয় (অধঃপতিত) অবস্থাকে কেয়ামতের আলামত বা পূর্ব-লক্ষণ বলে মনে করবেন। কেননা, যে ইমাম আল-মযহাবকে তিনি অনুসরণ করেন, তিনি বর্ণনা করেছেন যে কেয়ামত-দিবস আসন্ন হবার সময় অর্থের প্রাচুর্য, সব কিছুর মাত্রা ছাড়ানো, অসংখ্য উঁচু ভবন (ইমারত) এবং অবৈধ যৌনাচার দেখা দেবে। একজন মুকাল্লিদেরও এ সব তথ্য জানা আবশ্যক। না জানলে সে কোনো মযহাবেরই অনুসারী নয়। আয়েম্মা-এ-মযাহিব তথা চার মযহাবের চার ইমাম বলেছেন যে ইমাম মাহদী (আমার **'সায়াদাতে আবাদিয়্যা'** এবং **'ঈমান ও ইসলাম'** শীর্ষক পুস্তকে বিস্তারিত দেখুন)-এর পরে মানুষেরা বদকার হয়ে যাবে, কিন্তু এর আগে বহু সুখ-শান্তির দিন অতিবাহিত হবে। মুসলমানদেরকে এই সব সুখের দিনগুলোতে ভালভাবে বেঁচে থাকা উচিত এবং কাজ করে বৈষয়িক ও আত্মিকভাবে উন্নতি করাও আবশ্যক। যে ব্যক্তি কাজ করেন, আল্লাহতা'লা তাঁকে নিশ্চয় পুরস্কৃত করবেন।

১৫/ – ইমাম মাহদী (আ:) সম্পর্কে ধর্ম সংস্কারক 'আল-মাহদীর ধারণা' বাক্যটি ব্যবহার করেছে। সে বলে ইমাম মাহদী (আ:) ভবিষ্যতে আসবেন কিনা এ সম্পর্কে সে সন্দিহান। ধর্ম সংস্কারকরা যেহেতু যিনদিক, সেহেতু তারা এতে বিশ্বাস নাও করতে পারে; কিন্তু মুসলমান সমাজের এতে বিশ্বাস করা একান্ত আবশ্যক, কেননা উলামা-এ-ইসলাম সর্বসম্মতভাবে লিখেছেন যে তিনি আবির্ভূত হবেন। ইমাম সৈয়ুতী (রহ:) ও ইমাম ইবনে হাজর মক্কী (বেসাল: ৯৭৪ হিজরী/১৫৬৬ খৃষ্টাব্দ))-এর মতো মহান আলেমবৃন্দ ইমাম মাহদী (আ:) সম্পর্কে বই লিখেছেন। তাঁর ব্যাপারে এবং ভবিষ্যতে তাঁর আবির্ভাব সম্পর্কে বর্ণিত দু'শরও বেশি হাদীস উক্ত আলেমবৃন্দ নিজেদের বইপত্রে লিপিবদ্ধ করেন।

১৬/ – ধর্ম সংস্কারক বলে: "যে সব বিষয়ে এজমা' (ঐকমত্য) হয় নি, সেগুলোর ক্ষেত্রে প্রত্যেকের উচিত নিজের সন্তুষ্টি মাফিক প্রামাণিক দলিলের অনুসরণ করা। বস্তুতঃ কোনো মুজতাহিদকে অনুসরণ করার মানে হলো তাঁর দলিলগুলোরই অনুসরণ।"

হ্যাঁ, কোনো মুজতাহিদের তাকলীদ মানে তাঁর দালিলিক প্রমাণেরই অনুসরণ, যে দলিল হচ্ছে কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফ। কিন্তু কোনো বিষয়ের প্রামাণিক দলিল তো মুজতাহিদ-ই খুঁজে বের করেছেন আগে। বস্তুতঃ এই দলিলাদি খুঁজে বের করার ক্ষেত্রেই মযহাবগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। যে কোনো বিষয়ের দলিল খুঁজে বের করতে হলে এজতেহাদের

মর্যাদাসম্পন্ন আলেম হতে হয়, অর্থাৎ, মুজতাহিদ হতে হয়। সত্য বটে, এ ধরনের আলেম অপর কারো অনুসারী হতে পারতেন না; তাঁকে নিজের এজতেহাদ অনুযায়ী চলতে হতো।

১৭/ – রশীদ রেযা লিখেছে প্রলয় দিবসসম্পর্কিত আউলিয়া কেরামের কাশফ (দিব্যদৃষ্টি)-এর প্রতি সে বিশ্বাস করে। অথচ আয়েম্মা-এ-মযাহিব (চার মযহাবের চার ইমাম) বলেছিলেন প্রলয় দিবস কবে হবে তা জানানো হয়নি; একমাত্র আল্লাহতা'লা ছাড়া আর কেউই এ বিষয়ে জানেন না; আউলিয়ার কাশফ শরীয়তের দলিল নয়। আয়েম্মা-এ-মযাহিবকে যাঁরা অনুসরণ করেন, তাঁরা সবাই এই মতের হবেন। ধর্মপ্রচারকের প্রতি এর পরিপন্থী কোনো কথা আরোপ করা একদম অসত্য বিবরণ, একেবারেই জঘন্য কুৎসা রটনা। [**অনুবাদকের নোট**: আউলিয়ার কাশফ তাঁদের প্রতি আল্লাহতা'লার খাস্ রহমত। তাঁরা এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে যা জানেন, তা আল্লাহ ও তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাঁরা তা প্রকাশও করেন না। এটি মা'রেফত তথা ভেদের রহস্য। অতএব, প্রলয় দিবস সম্পর্কে তাঁরা আল্লাহর কাছ থেকে জানলেও সর্বসাধারণ্যে তা প্রকাশিত নয়]

১৮/ – ধর্ম সংস্কারক **'কালবী'** শীর্ষক তাফসীরগ্রন্থে জাল হাদীস আছে বলে যে অভিযোগ করেছে, তা অবশ্য সঠিক। কিন্তু সে আরও বলে, "আল-বায়দাবীর তাফসীর পুস্তকেও অনুরূপ জাল হাদীস বিদ্যমান।" তার এ কথাটি একেবারেই ভুল। মহান আলেমে হক্কানী হযরত আবদুল হাকিম-ই আরওয়াসী (বেসাল: ১৩৬২ হিজরী/১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ) বলেন, "ইমাম কাজী আল-বায়দাবী (বাইএয়াদ-আল্লাহু ওয়াজহাহু – আল্লাহ তাঁর চেহারা মোবারককে আরও জ্যোতির্ময় করুন) তাঁর নাম ও তাঁর প্রতি প্রেরিত সালামের মতোই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। মোফাসসিরবৃন্দ তাঁকে ভালোবাসতেন এবং সর্বোপরি তাঁকে সম্মান করতেন। তিনি তাফসীর-শাস্ত্রে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন। ইসলামী জ্ঞানের সকল শাখায় তিনি ছিলেন সনদ (কর্তৃত্ব)। প্রতিটি মযহাবেই তিনি ছিলেন উজ্জ্বল নক্ষত্র ও প্রতিটি ভাবনায় একজন পথপ্রদর্শক। তাঁকে সবাই জানেন প্রতিটি জ্ঞানের শাখায় একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে; সকল ধরনের উসূলে দিগদর্শক হিসেবে; আর প্রাথমিক ও পরবর্তী যুগের উলেমাবৃন্দের কাছে তিনি পরিচিত নির্ভরযোগ্য, কর্তৃত্বসম্পন্ন ও বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণীজন হিসেবে। এ ধরনের একজন মহান জ্ঞান বিশারদের বইপত্রে জাল বা বানোয়াট হাদীস আছে বলা চরম দুঃসাহস বৈ কী! এটি দ্বীন ইসলামে বড় একখানা খাদ সৃষ্টির অপপ্রয়াস। যে ব্যক্তির জিহ্বায় এ রকম কথা উচ্চারিত হয়, যার অন্তর এ কথায় বিশ্বাস করে এবং যার কান শোনে, সবগুলোই আগুনে ভস্মীভূত হবার যোগ্য। এই মহৎ জ্ঞানী ব্যক্তি কি সহীহ ও মওদু (বানোয়াট) হাদীসের পার্থক্য বুঝতে সক্ষম ছিলেন না? তিনি এ ক্ষেত্রে অপারগ ছিলেন যারা বলে, তাদেরকে কী বলা উচিত? নাকি তিনি ধর্মীয় নীতিবোধে বা খোদাভীরুতায় এতোই দুর্বল ছিলেন যে জাল হাদীস তাঁর বইপত্রে লিপিবদ্ধ করেছিলেন এর চরম শাস্তির ব্যাপারটি অগ্রাহ্য করেই, যে শাস্তি এ রকম কর্ম সংঘটনকারীদের প্রতি বলবৎ হবার ব্যাপারে মহানবী (দ:) ইতিপূর্বে সতর্ক করেছিলেন। ইমাম বায়দাবী (রহ:) এ রকম করেছেন বলা কতোই না মন্দ ও ঘৃণিত কাজ। যেহেতু এ সব হাদীসের অর্থ তাঁর কুৎসা রটনাকারীর মতো সংকীর্ণ মস্তিষ্কসম্পন্ন ও মোটা বুদ্ধির লোকদের উপলব্ধির বাইরে, সেহেতু এগুলোকে মওদু (জাল) বলা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায়ন্তর নেই।"
১৯/ – ধর্ম সংস্কারক বলে, "আমরা কেউই পরবর্তী জগত (পরলোক) প্রত্যক্ষ করিনি; তাহলে কেমন করে আমরা আশ্ শারানীর কথার সাথে 'মওকিফ' নামক স্থানের ভৌগোলিক অবস্থানের যোগসূত্র স্থাপন করবো? আর কেমন করেই বা তাঁর সীরাত, মীযান, বেহেস্ত-দোযখের মানচিত্রের সাথে পরকালকে সম্বন্ধযুক্ত করবো? আমরা কুরআন, সুন্নাহ, আকল (বিচার-বুদ্ধি) বা হেকমত (সূক্ষ

জ্ঞান)-এর মধ্যে এই সবের পক্ষে কোনো প্রমাণ দেখিনি। এটি সত্যি আজব যে তোমাদের পীর-মাশায়েখবৃন্দ বিশ্বের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও প্রয়োজনীয় ভূগোলশাস্ত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে মৃত্যু-পরবর্তী জগতের এমন সব মানচিত্র এঁকেছেন, যা বাস্তবে দেখা যায় না।”

এই কথা বলে রশীদ রেযা আল্লাহর মহান আউলিয়া (আল্লাহর ভালোবাসা ও হেফাযতপ্রাপ্ত বান্দা)-বৃন্দ ও তাঁদের কারামত (আল্লাহপ্রদত্ত ক্ষমতাবলে কৃত অলৌকিক কর্ম)-কে আক্রমণ করেছে এবং তাঁদের প্রতি মুসলমানদের বিশ্বাসকে ধ্বংস করতে চেয়েছে। অথচ তার কোনো অধিকার নেই এটি করার, কেননা আল্লাহ পাক তাঁর কুরআনুল করীমে এরশাদ ফরমান, **“ঘন ঘন আল্লাহর যিকর পালন করো; যিকরের মাধ্যমেই অন্তর এতমিনান তথা প্রশান্তি অর্জন করে।”** হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (দ:) এরশাদ ফরমান, **“আল্লাহকে ভালোবাসার আলামত বা চিহ্ন হলো তাঁকে বেশি বেশি স্মরণ করা।”** মোহাদ্দীস উলেমাবৃন্দ বলেন, “বিশ্বনবী (দ:) প্রতিটি মুহূর্তে যিকর করতেন (অর্থাৎ, কলব্ জারি ছিল)।” এই কারণেই উম্মতের মহান বুযূর্গমণ্ডলী বেশি বেশি যিকর পালন করতেন এবং ইসলামের এতদসংক্রান্ত আদেশ পালনেও সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। ঘন ঘন যিকর পালন করে তাঁদের পবিত্র অন্তর এতমিনান অর্জন করে। আর যেহেতু বিভিন্ন হাদীসে এরশাদ হয়েছে, **“প্রত্যেক রোগেরই ওষুধ আছে; অন্তরের ব্যাধির চিকিৎসা হলো আল্লাহর যিকর”** এবং **“তাকওয়া (খোদাভীরুতা/পুণ্যদায়ক কাজ পালন ও হারাম বর্জন)-এর উৎস হলো আ’রেফ (খোদা সম্পর্কে জ্ঞানী)-বৃন্দের অন্তর”**, সেহেতু আউলিয়াবৃন্দের অন্তর (কলব্) ওর ব্যাধি তথা পাপ থেকে মুক্তি পায়। তাঁরা আল্লাহতা’লার ভালোবাসা ও রেযামন্দি হাসেল করেন। তাকওয়া-সম্পন্ন ও নির্মল আত্মার এই মহান বুযূর্গ আলেমবৃন্দ-ই বলেছেন, ঘন ঘন যিকর পালনকালে তাঁরা দুনিয়া ও এর যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে বিস্মৃত হন এবং তাঁদের অন্তর আয়নাসদৃশ রূপ লাভ করে, যার দরুন ঘুমে যেমন সব কিছু বিস্মৃত হয়, তেমনি এই জযবার হালতে তাঁদের অন্তরে (বর্ণনাতীত) বিষয়াদি প্রকাশিত (মুকাশাফা) হয়। তাঁরা এগুলোর নাম দিয়েছেন “**কাশফ**”, “**মুকাশাফা**” বা “**শুহূদ**”। প্রতিটি শতাব্দীর সহস্র সহস্র আউলিয়াবৃন্দ এই একই কথা বলেছেন। ঘন ঘন যিকর পালন করা একটি এবাদত। যাঁরা এটি বেশি বেশি পালন করেন, তাঁদেরকে আল্লাহ পাক ভালোবাসেন এবং তাঁদের অন্তর তাকওয়ার উৎসে পরিণত হয়। কুরআন মজীদ ও সুন্নাহ এই কথা ব্যক্ত করে। এই বিষয়গুলোকে **উমূর আত্ তাশরি’ইয়্যা** (ইসলামী বিষয়াবলী) বলে। যে ব্যক্তি এতে অবিশ্বাস করে, সে কুরআন-সুন্নাহতে অবিশ্বাসকারী হিসেবেই সাব্যস্ত হবে। প্রকৃত (পুণ্যবান) মুসলমানবৃন্দ যাঁদেরকে আল্লাহতা’লা ভালোবাসেন, তাঁরা জানিয়েছেন যে কাশফ ও শুহূদ কলব্ তথা অন্তরে প্রকাশিত হয়। হুযূর পূর নূর (দ:) এরশাদ ফরমান, **“ঘন ঘন যিকর পালনকারীর অন্তরে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব (অবিশ্বাস) থাকে না।”** যাঁরা এ সব তথ্য প্রকাশ করেছেন, তাঁরা মোনাফেক ছিলেন না, বরং কথায় ও চিন্তায় প্রকৃত মুসলমান ছিলেন। এঁদের দ্বারা বর্ণিত কাশফ ও কারামত মুসলমানদের মাঝে তাওয়াতুর (সর্বত্র এমন প্রসিদ্ধ ও জ্ঞাত যে তা নির্ভরযোগ্য এবং অস্বীকার করা অসম্ভব) হয়ে গিয়েছে। অধিকন্তু, যেহেতু এগুলো **উমূর আল-উইজদানিয়্যা** অথবা **উমূর আয্ যওকিয়্যা** (ইসলামে অপ্রদর্শিত কিন্তু নিজ বিবেক দ্বারা বিচার্য বিষয়)-এর অন্তর্ভুক্ত এবং অন্যান্যদের জন্যে দলিল নয়, তথাপি মুসলমানদেরকে এতে বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাস করতে আদেশ করা হয় নি। আল্লাহর ভালোবাসাপ্রাপ্ত পুণ্যবান বান্দাগণ যা তাওয়াতুর হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তাতে অবিশ্বাসের চেয়ে বিশ্বাস করাই উত্তম। কোনো মুসলমান সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখা উচিত এবং তাঁর আচরণে আস্থাও রাখা উচিত; এমন কি তাঁর এবাদত-সংক্রান্ত বক্তব্যেও তা রাখা উচিত। “যে ব্যক্তি অস্বীকার করেছে, সে বঞ্চিত হয়েছে” – এই প্রবাদটি শাশ্বত স্বতঃসিদ্ধ। [**অনুবাদকের নোট**: আকাইদের কেতাবে লেখা আছে, **কারামাতুল**

আউলিয়ায়ে হাক্কুন, অর্থাৎ, আউলিয়ার কারামত সত্য। এতে বিশ্বাস করা অত্যাবশ্যক]
হযরত আবদুল ওয়াহহাব শারানী (রহ:) ছিলেন গভীর জ্ঞানী এক আলেমে হক্কানী ও ওলী। তিনি শাফেঈ মযহাবের অন্যতম ভিত্তিস্তম্ভ ও আহলে সুন্নাতের নয়নমণি। তাঁর পঠিত ও মুখস্থকৃত বইপত্রের সংখ্যা অগণিত। এগুলোর কিছু কিছু তাঁর **'আল-মিযানুল কুবরা'** শীর্ষক পুস্তকের মুখবন্ধে লিপিবদ্ধ আছে। তাঁর শত শত কর্ম **'কাশফ আয্ যুনূন'** কেতাবে তালিকাবদ্ধ আছে। তাঁর প্রতিটি গ্রন্থ-ই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। হানাফী জ্ঞান বিশারদগণও তাঁর গভীর জ্ঞান, কাশফ ও শুহূদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাঁরা বলেছেন যে ইমাম শারানী (রহ:) 'ধরণীর বুকে নক্ষত্ররাজির মধ্যে একটি।' একটি হাদীস শরীফে নবী পাক (দ:) এরশাদ ফরমান, **"শেষ বিচার দিবসে সর্বপ্রথমে আম্বিয়া (আ:), অতঃপর উলামা-এ-হক্কানী/রব্বানীবৃন্দ এবং তারপর শহীদগণ শাফায়াত তথা সুপারিশ করবেন"** (মেশকাত)। এই হাদীস শরীফকে আঁকড়ে ধরেই আমরা তাঁর শাফায়াতের প্রত্যাশী। এটি সুস্পষ্ট যে আহলে সুন্নাতের এ সকল নয়নমণিকে যারা আক্রমণ করে, তারা যিনদিক। যিনদিক ও অবিশ্বাসীরা মুসলমানদের পথপ্রদর্শক মহানবী (দ:)-কেও আক্রমণ করেছিল। ইসলামের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন ভলটেয়ার-ও বিশ্বনবী (দ:)-কে তার ঘৃণ্য নাটকগুলোর বিষয়বস্তুতে পরিণত করার মতো নিচুতায় নেমেছিল। তাই হুযূর পাক (দ:)-এর উত্তরাধিকারী আহলে সুন্নাতের উলেমাবৃন্দের প্রতি এ ধরনের হীন আক্রমণ পরিচালিত হওয়াই স্বাভাবিক। শত্রুদের নোংরা মুখ ও বক্র কলমের বিষয়বস্তুতে পরিণত হওয়াতে এই মহান ব্যক্তিদের ভাবমূর্তি কলুষিত হবে না। হীরে মাটিতে পড়ে গেলেও মূল্য কমে যায় না।
আল্লাহর রেযামন্দি হাসিলকারী আবদুল ওয়াহহাব শারানী (রহ:) ও তাঁর মতো অন্যান্য আউলিয়া বলেছিলেন, তাঁরা মওক্কিফ, সীরাত, বেহেস্ত ও দোযখ নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন; তবে এগুলো পৃথিবীতে চর্মচক্ষে দেখা যাবে না। এগুলো তাঁদেরকে স্বপ্নের মতো এমন পন্থায় দেখানো হয়েছে এবং এমনভাবে তাঁদের অন্তরে প্রকাশ করা হয়েছে, যা অজ্ঞাত, অবোধগম্য ও ব্যাখ্যাতীত। তাঁরা এ সব বিষয় তাঁদের ঘনিষ্ঠজনদের কাছে প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, **"মান লাম এয়াযূক লাম এয়াদরি"** [যে ব্যক্তি স্বাদ গ্রহণ করেনি, সে জানে নি]। অবোধগম্য কোনো বিষয়কে অস্বীকার করা একদম মূর্খতা, নয়তো স্রেফ বেওকুফি। আর এ ধরনের অবোধগম্য বিষয় সম্পর্কে যদি কেউ বলে, "অসম্ভব, হতেই পারে না", তাহলে এটি হবে প্রতিক্রিয়াশীলতা, একগুঁয়েমি ও উগ্রবাদিতার বহিঃপ্রকাশ। এ কারণেই আমরা ধর্ম সংস্কারককে 'বিজ্ঞানের গোঁড়াপন্থী' সম্বোধন করে থাকি। মুসলমান উলেমাবৃন্দের সূক্ষ ঐশী জ্ঞান যা বিজ্ঞান ও যুক্তিতর্কের ঊর্ধ্বে, এমন বিষয়কে তাঁরা মানচিত্র অঙ্কন করেছেন বলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ যিনদিক্ক ও দ্বীনের শত্রুরা ছাড়া আর কে-ই বা করতে পারে?
২০/ – রশীদ রেযা নিজ 'মুহাওয়ারাত' পুস্তকে মহাপ্রলয় দিবসসম্পর্কিত হাদীস উদ্‌ধৃত করে। কিন্তু সে হাদীসের নামে যিনদিক্কদের বানোয়াট কথাবার্তা ধর্মপ্রচারকের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করায়। আর ধর্ম সংস্কারককে দিয়ে ওই সব কথা হাদীস নয় প্রমাণ করিয়ে সে ধর্ম সংস্কারকের মুখে সেই সব কথা প্রচার করে যেগুলো লিপিবদ্ধ আছে উলামা-এ-আহল-এ-সুন্নাতের বইপত্রে। এই ধূর্ত চালের মাধ্যমে সে চার মযহাবের অনুসারী ধর্ম প্রচারক ও মুসলমানদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার অপপ্রয়াস পায় এবং তাঁদেরকে অজ্ঞ-মূর্খ হিসেবে মিথ্যেভাবে উপস্থাপনের পাশাপাশি নিজেকে ও তার মতো ধর্ম সংস্কারকদেরকে জ্ঞানী-গুণী ও বুদ্ধিমান ইসলামী পণ্ডিত হিসেবে প্রকাশের অপচেষ্টা চালায়। যে সকল মুসলমান ইসলামী বইপত্র অধ্যয়ন করেছেন এবং ভালভাবে বুঝেছেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে এ সমস্ত ঘৃণ্য কুৎসায় বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু আমরা এখানে দু'কলম লিখছি যাতে সত্য যারা জানেন না, তাঁরা যেন ধর্ম সংস্কারকের কথাকে সত্য মনে করে ধোকাপ্রাপ্ত না হন। আমরা জোর

দিয়ে বলবো, আমাদের যুব ও তরুণ মুসলমান ভাইয়েরা যেন আহলে সুন্নাতের উলেমাবৃন্দের বইপত্র পাঠ করে ধর্ম সংস্কারকের মিথ্যে প্রচারণায় ধোকাপ্রাপ্ত হওয়া থেকে নিজেদের রক্ষা করেন।

২১/ – রশীদ রেযা ধর্ম প্রচারকের মুখ দিয়ে ইসলামের সাথে সম্পর্কহীন হুরুফী, দ্রুয ও বাতেনী (আমার প্রণীত **'সায়াদাতে আবাদিয়্যা'** পুস্তকের ২য় খণ্ডে 'বিকৃত ধর্মসমূহ' শীর্ষক অধ্যায় দেখুন)-দের কথাবার্তা বলায় এবং ইসলাম বিষয়ে ধর্ম প্রচারকের জ্ঞান হিসেবে একে মিথ্যেভাবে উপস্থাপন করে; অতঃপর ধর্ম সংস্কারককে দিয়ে সে অভিমত ব্যক্ত করে যে আমাদের দ্বীনে এ সমস্ত জিনিসের কোনো স্থান-ই নেই। ফলে সে ধর্ম প্রচারককে একজন মূর্খ হিসেবে প্রদর্শন করে। ধর্ম সংস্কারকের প্রতি পাঠকদের আস্থা অর্জনে চেষ্টা করার পাশাপাশি আহলে সুন্নাতের মানুষদেরকে অজ্ঞ হিসেবে দেখাতেও সে অপতৎপর।

২২/ – ধর্ম সংস্কারক বলে, "সম্প্রতি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলে যারা নিজেদের অভিহিত করে, তারা বাতেনী ও অন্যান্য (বাতেল) দল-উপদলের বানানো বেদআত হতে নিজেদের রক্ষা করতে পারে নি। তারা নামে ভিন্ন মাত্র। আপনারা যদি বাতেনীদের কথাবার্তার সাথে হিজরী চতুর্থ শতক ও তৎপরবর্তী শতকগুলোতে আগত তাসাউফপন্থীদের বিভিন্ন বাণীর তুলনা করেন, তাহলে খুব কম পার্থক্যই দেখতে পাবেন।"
ধর্ম সংস্কারক আবারও এখানে ইসলাম সম্পর্কে নিজের মূর্খতা প্রকাশ করেছে। সে যা বলছে ঠিক তার উল্টো, **'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত'** শব্দটি রাসূলে পাক (দ:)-এর হায়াতে জিন্দেগীর পরবর্তী সময়ে আবিষ্কৃত নয়; মহানবী (দ:)-ই এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন এবং মুসলমানদেরকে এর পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান করেছিলেন। তিনি এরশাদ ফরমান, **"আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরো!"** অন্যত্র ফরমান, **"জামাআত থেকে বিচ্যুত হয়ো না!"** এই দুটো হাদীস-ই তাঁর ওই আহ্বানের প্রামাণ্য দলিল। ধর্ম সংস্কারক তার এই মিথ্যে দ্বারা আহলে সুন্নাতের বুযূর্গ-আলেমবৃন্দ ও আউলিয়া কেরামকে আক্রমণ করেছে এবং তাঁদের মান-মর্যাদাকে কলুষিত করতে চেয়েছে। আহলে সুন্নাতের উলামা-এ-কেরামের বইপত্র এখনো তা-ই আছে, যেমনটি ছিল সহস্র বছর আগে সেগুলোর প্রণয়নের সময়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায়, মনুষ্য সমাজের বিভিন্ন স্তরে অজ্ঞ-মূর্খ ও গোমরাহ লোক থাকতেই পারে; কিন্তু এ ধরনের কিছু লোকের উদাহরণ টেনে 'আহলুস্ সুন্নাহ' শব্দটিকে আক্রমণ করা মহা অন্যায়। আর তাসাউফের মহান ব্যক্তিত্বদেরকে বাতেনী সম্প্রদায়ের সাথে তুলনা করার কূটচাল ধর্ম সংস্কারকরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকে। 'বাতেন' (অপ্রকাশ্য, ভেদের রহস্য)-বিষয়ক জ্ঞানের শাখার বুযূর্গ-উলামাদেরকে বাতেনী নামের যিনদিকদের সাথে তালগোল পাকিয়ে ফেলা হচ্ছে আলোকে অন্ধকার, সঠিককে ভুল এবং সৎকে অসৎ বলার মতোই ব্যাপার। রশীদ রেযার এই বই জ্ঞান-বিজ্ঞানভিত্তিক হওয়া থেকে যোজন যোজন দূরে; এটি মূলতঃ কোনো ভেল্কিবাজের প্রস্তুতকৃত এমন এক লেখনী যা মানুষদেরকে ধোকা দেবার জন্যে রচিত হয়েছে।

২৩/ – রশীদ রেযা ধর্ম প্রচারকের মুখ দিয়ে বলে: "আমি বুঝি না কেন কালামশাস্ত্রের আলেমবৃন্দ ও ফকীহমণ্ডলী নাশকতায় জড়িত শিয়াদের প্ররোচনার বিরুদ্ধে নীরব, যে শিয়া গোষ্ঠী নিজেরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং অন্যান্যদের বিচ্যুতির কারণও হয়ে দাঁড়িয়েছে; এর কোনো ব্যাখ্যা আমি নিজের জন্যে খুঁজে পাই নি। কালামশাস্ত্রের জ্ঞান বিশারদগণ সব সময়ই মো'তাযেলা দলটির

বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন; তাঁরা ওই দলকে খণ্ডন করেছিলেন এবং কঠোরভাবে ওর ধ্যান-ধারণাকে রদ করেছিলেন। ফলশ্রুতিতে মো'তাযেলা মতবাদ ও তার অনুসারীরা ইতিহাসের গর্ভে হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ফেকাহবিদগণ যদিও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি তাঁরা একে অপরের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত, একে অপরকে খণ্ডনে ব্যস্ত।"
ধর্ম প্রচারককে দিয়ে রশীদ রেযা কালামশাস্ত্র ও ফেকাহশাস্ত্রের উলামা-এ-কেরামের বিরুদ্ধে যে কুৎসা রটনা করেছে, তাতে অবশ্যই কেউ বিশ্বাস করবেন না। আহলে সুন্নাতের উলেমাবৃন্দের লেখা খণ্ডনমূলক বইপত্র বিভিন্ন পাঠাগারকে পরিপূর্ণ করেছে। এ সম্পর্কে ফারসী (পারসিক) ভাষায় লিখিত বইয়ের সংখ্যা আরবীর চেয়ে কম নয়। রশীদ রেযা ফারসী জানলে এবং শাহ আব্দুল আযীয দেহেলভীর রচিত **'তোহফা-এ এসনা আশারিয়্যা'** বইটি পড়লে আশ্চর্য হতো এই বাস্তবতা দর্শনে যে লা-মযহাবীদেরকে কীভাবে সুন্নী উলামা-এ-কেরাম রদ করেছেন। হযরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী (রহ:)-এর **'রদ্দে রাওয়াফিয'** শীর্ষক পুস্তকটি, যেটি উজবেক সুলতান আবদুল্লাহ শাহের পরিচালিত রাফেযী শিয়া-বিরোধী যুদ্ধাভিযান ও তাদের দমনের কারণগুলো ব্যাখ্যা করে, সেটি কেউ পড়লে এবং আস্ সুওয়াইদী কৃত **'হুজাজ-এ-কাতেয়া'** শিরোনামের পুস্তকটি, যা'তে পারসিক সম্রাট নাদের শাহের দরবারের শিয়া পণ্ডিতদের সাথে বইয়ের লেখকের বাহাস ও শিয়াদের রদ করার বিবরণ বিধৃত হয়েছে, তা জ্ঞানান্বেষী যে কেউ পড়লে ভালভাবে বুঝতে পারবেন আহলে সুন্নাতের উলেমাবৃন্দ ঠিকই শিয়াদেরকে পরাভূত করেছিলেন। 'মকতুবাত' শীর্ষক গ্রন্থের ৮০তম পত্রের শেষে বত্রিশজন সুন্নী আলেমের নাম লিপিবদ্ধ আছে যাঁরা লিখেছিলেন যে লা-মযহাবী চক্র গোমরাহ এবং ইসলামের মধ্যে অন্তর্ঘাতী তৎপরতায় রত। অধিকন্তু, ফেকাহ'র আলেমবৃন্দ পরস্পর কোন্দলে লিপ্ত মর্মে অভিযোগটি এমনই এক অপবাদ যা লা-মযহাবীরা প্রতিনিয়ত দিয়ে থাকে। এর জবাব ইতোমধ্যেই ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে দেয়া হয়েছে।

২৪/ – ধর্ম সংস্কারক বলে: "উলেমাদের একে অপরের মধ্যকার পাল্টাপাল্টি খণ্ডন ও বিরোধ মূলতঃ তাদের নিজেদের নফসানীয়াত থেকে সৃষ্ট। কালাম-শাস্ত্রীয় জ্ঞানের জন্মের একমাত্র কারণ ছিল মো'তাযিলা সম্প্রদায়। তারা (কালাম-শাস্ত্রজ্ঞ) এমন কিছু বিষয়ে ডুব দেন, যেগুলোতে সালাফবৃন্দও জড়ান নি। তারা এ সব বিষয়ে কিছু আপত্তি উত্থাপন করেন। আর অন্যান্যরা তাদের আপত্তির তীরের লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ান। প্রকৃত জ্ঞানীদের তিরোধান এবং চিন্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুণাবলী হারিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী প্রজন্ম পূর্ববর্তীদের কথা তোতা পাখির মতো হুবহু আওড়ানো আরম্ভ করে। সময়ের পরিক্রমণে এ সবও অকার্যকর হয়ে যায়। এই অনুকরণকারীরা ইমাম আল-আশআরী ও তার অনুসারীদের মতো আলেমবৃন্দের পরে আগত বেদআত ও কুসংস্কারের ব্যাপারে চুপ ছিল; উপরন্তু, এ সব কুপ্রথা সম্পর্কে যারা প্রশ্ন তুলেছিলেন, এই অনুকরণকারীরা তাদের প্রতি দালালাতের (গোমরাহীর)-ও ফতোওয়া আরোপ করেছিল। আর যখন এই সমস্ত বেদআত ও গোমরাহীকে ধর্মীয় লেবাস বা আবরণে পরিবেশন করা হয় এবং এর পক্ষে দালাল ও সমর্থকও জুটে যায়, তখন কালাম-শাস্ত্রের উলামাবর্গ এগুলোকে ভিন্নতর ব্যাখ্যা দিয়ে সমর্থন জোগাতে চেষ্টা করেন। অধিকন্তু, গোমরাহীর অভিযোগ তাদের-ই প্রতি উত্থাপন করা হয় যারা এ সমস্ত শেরক-বেদআতের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন; আর তাদের-ই প্রতি আরোপ করা হয় কুফরী ও গোমরাহীর ফতোওয়া। এটি প্রতিটি প্রজন্মে, প্রতিটি জাতিতেই দেখা সম্ভব।

"ফেকাহবিদদের আচরণ সম্পর্কে ইমাম গাযযালী (রহ:) কী বলেছেন তাও আমরা শুনবো। তিনি তাঁর **'এহইয়া'** গ্রন্থে 'কিতাবুল এলম' বিষয়ে বলেন: 'ফেকাহবিদরা নিজেদের মধ্যে যে ঝগড়া-

বিবাদে লিপ্ত হন, তা ছিল শাসকবর্গের তোষামোদী করে উচ্চপদ ও কাজী (বিচারক)-এর পদ লাভের উদ্দেশ্যে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে এই কারণেই শাফেঈ ও হানাফীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রেষারেষি হয়েছিল। কেননা, এই সব উচ্চপদে সব সময় এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী-ই অধিষ্ঠিত ছিল'।" [রশীদ রেযা কৃত 'মুহাওয়ারাত']

এই উদ্ধৃতিতে রশীদ রেযা দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ফেকাহ-শাস্ত্র অধ্যয়নকারী বদ লোকদেরকে দুনিয়াবাসী ও দুষ্ট লোকদের সৎ পথে ফিরিয়ে আনার কাজে জড়িত প্রকৃত ফেকাহবিদদের সাথে মিলিয়ে ফেলেছে এবং ফলশ্রুতিতে ফকীহ উলেমাবৃন্দ ও আয়েম্মা-এ-মযাহিব (চার মযহাবের চার ইমাম)-কে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। এটি তার ইসলামের মধ্যে অন্তর্ঘাতমূলক যুদ্ধ-পরিকল্পনারই অংশ-বিশেষ, যা দ্বারা সে মযহাব ও তাকলীদ রহিত করে ধর্মের বিনাশ সাধন করতে অপতৎপর। উপরন্তু, সে ইমাম গাযযালী (বেসাল: ৫০৫ হিজরী/১১১১ খৃষ্টাব্দ)-এর কথার অপব্যাখ্যা করে এই মহান আলেমকে নিজের জন্যে মিথ্যে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। সে যা লিখেছে ঠিক তার উল্টো, ইমাম গাযযালী (রহ:) কখনোই ফকীহ উলেমাবৃন্দকে দোষারোপ করেন নি। উক্ত পুস্তকের (এহইয়া) 'এলম' বিষয়ের ৪র্থ অধ্যায়ে তিনি ফেকাহ'র উলেমাবৃন্দ ও পার্থিব স্বার্থে ফেকাহ-শাস্ত্র ব্যবহারকারী বদমায়েশ লোকদের মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেন: "ফেকাহবিদ উলেমাবৃন্দ শাসকবর্গ থেকে দূরে সরে থেকেছেন। তাঁদেরকে কাযা (বিচারের রায়) ও ফতোওয়া জারি করার আহ্বান জানানো হতো, কিন্তু তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করতেন। এই সকল পদের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখে বদমায়েশ লোকেরা মুফতী হিসেবে শাসকবর্গের আনুকূল্য পেতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। যেহেতু শাসকবর্গ মযহাবগুলোকে মূল্যায়ন করতেন এবং হানাফী না শাফেঈ মযহাব বেশি উপযোগী তা অনুসন্ধানরত ছিলেন, সেহেতু যারা শিক্ষিত ছিল না তারা এগুলোর মধ্যকার পার্থক্যের বিষয়গুলো শিক্ষা করা আরম্ভ করে। তারা নিয়ম লঙঘন ও বিতর্কে জড়িয়ে যায়। ধর্মীয় পদে সমাসীন এই বদমায়েশ লোকেরা শাসকবর্গের সমস্ত (খামখেয়ালি) কর্মে ইন্ধন জোগাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।" ধর্ম সংস্কারক ইমাম গাযযালী (রহ:)-এর এই উদ্ধৃতি, যেটি বদমায়েশ উলেমার বিরুদ্ধে ছিল, সেটিকে বিকৃত করে ফেকাহবিদ উলেমাবৃন্দের প্রতি আরোপ করেছে; হানাফী ও শাফেঈগণ পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়েছিলেন মর্মে মিথ্যে চিৎকার-চেঁচামেচি করার জন্যে সে মোটেও লজ্জিত নয়।

ধর্ম সংস্কারকের আরোপিত অপর একটি মিথ্যে হচ্ছে উলেমাবৃন্দ নাকি নিজেদের 'নফস'কে অনুসরণ করেছিলেন। অথচ ফকীহ-মণ্ডলী ও আয়েম্মা-এ-মযাহিব কখনোই কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফের বিরোধী কোনো কথা বলেন নি। যেহেতু তাঁরা যা কিছু বলেছিলেন সবই কুরআন-হাদীসভিত্তিক ছিল, সেহেতু তাঁদের কথার অনুসারীদের নফসে আম্মারা (একগুঁয়ে সত্তা) মোতমাইন্না তথা প্রশান্ত সত্তাতে পরিণত হয়। তাঁদের অনুসারীরা যদি এ রকম হতে পারেন, তাহলে তাঁদের সত্তা প্রশান্ত না হওয়া কি আদৌ সম্ভব? চার আয়েম্মা-এ-মযাহিব এবং সকল মুজতাহিদের নফস তথা সত্তা মোতমাইন্না (প্রশান্ত) ছিল। তাঁদের প্রত্যেকেই ওলী ছিলেন, যিনি যাহেরী তথা প্রকাশ্য জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হওয়ার পাশাপাশি বাতেনী বা অপ্রকাশ্য, আধ্যাত্মিক জ্ঞানেও পূর্ণতা লাভ করেছিলেন। তাঁরা নিজেদের নফসকে অনুসরণ করেছিলেন বলা সকল মসুলমানের এবং দ্বীন ইসলামেরও কুৎসা রটনা করা ছাড়া আর কিছু নয়।

পরবর্তী প্রজন্মের ধর্মীয় পদে কর্তব্যরত উলেমাবৃন্দের প্রতি অপবাদ দিয়ে এই ধর্ম সংস্কারক নিম্নের হাদীস শরীফকে অস্বীকার করেছে। রাসূলুল্লাহ (দ:) এরশাদ ফরমান, "**প্রতি (ইসলামী) শতাব্দীতে**

একজন মোজাদ্দেদ (ধর্মের নবায়নকারী বা পুনর্জাগরণ সৃষ্টিকারী) আসবেন, যিনি এই দ্বীনকে শক্তিশালী করবেন।" এ কথা সত্য যে অনেক মুসলমান গোমরাহ তথা বিচ্যুত হয়েছে এবং ৭২টি ভ্রান্ত ফেরকাহ বা গোষ্ঠীরও আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু এই বিচ্যুতির মানে এই নয় যে ইসলাম ধর্ম কলুষিত হয়েছে। সব সময়ই এক দল প্রকৃত মুসলমানের অস্তিত্ব ছিল এবং এখনো আছে যাঁরা সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর অনুসরণ বাদ দেন নি। এই মুসলমানদেরকে বলা হয় **আহল আস্ সুন্নাত ওয়াল জামাআত।** আহলে সুন্নাতের উলেমাবৃন্দ প্রতি শতাব্দীতেই, পৃথিবীর সকল অঞ্চলেই মানুষদেরকে সত্য, সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁরা কোনো প্রশ্ন-ই উত্তরবিহীন ফেলে রাখেন নি। তাঁরা যিনদিক্ক, বেদআতী ও ধর্ম সংস্কারকের মিথ্যে ও কুৎসায় বিশ্বাস করা হতে মুসলমানদেরকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন যে ইসলাম ধর্ম দুনিয়ার লয়প্রাপ্তি অবধি নিষ্কলুষ থাকবে।

২৫/ – ধর্ম সংস্কারক নিজের এবং তার সম্পাদিত **আল-মানার** পত্রিকার অতি প্রশংসা করে আসমানে উঠিয়ে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাই নিম্নের প্রবাদটি প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ: "হুরুফীর কারামত (অলৌকিকত্ব) তার নিজেরই বর্ণিত।" অথচ এই পত্রিকাটিতে সে ফ্রী-মেইসন ও ধর্ম সংস্কারকদেরকে ইসলামী জ্ঞান বিশারদ হিসেবে উপস্থাপন করেছে; আর তারাই ধর্মকে নবায়ন করবে কথাটি বলে সে বোঝাতে চেয়েছে যে ইসলাম ধর্মের হিরন্ময় অতীতের হৃত গৌরব তারাই পুনরুদ্ধার করবে। সে অভিযোগ করে, ইসলাম ধর্মকে কলুষিত করা হয়েছে এবং ইসলামী বইপত্র পরিবর্তিত বা বিকৃত করা হয়েছে। তার মতে, ধর্ম সংস্কারকরাই এর সংশোধন করবে। কিন্তু তার কথার ভেতর যে বিষবাষ্প উদগীরণ করা হয়েছে, তা আহলে সুন্নাত ও সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর পদাংক অনুসারী এই মতাদর্শের বইপত্র ধ্বংসের উদ্দেশ্যেই কৃত; আর সে এর দ্বারা সুন্নী আকীদা-বিশ্বাসের বইপত্রের বদলে ইসলামের অন্তর্ঘাতী শত্রু ফ্রী-মেইসন ও ধর্ম সংস্কারক চক্রের বইপত্র চালু করতে ইচ্ছুক। সংক্ষেপে এর অর্থ হলো, সে রাসূলুল্লাহ (দ:) ও সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর পথ ও মত ইসলাম ধর্মকে দূষিত ও ফলশ্রুতিতে ধ্বংস করতে চায়। এটি-ই হচ্ছে ধর্ম সংস্কারকদের অন্তরে লালিত বাসনা, যারা ধর্মে সংস্কার সাধনের কথা বলে থাকে। সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর পদাংক অনুসরণের দিকনির্দেশনা যে সুন্নী আলেমবৃন্দ আমাদেরকে দিয়েছেন, তাঁদেরকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার দরুন-ই এ সব শত্রুদের হীন উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ ধরনের ইসলামের অন্তর্ঘাতী শত্রু যারা মুসলমানের ছদ্মবেশে তাদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর, তাদেরকে বলা হয় '**যিনদিক্ক**'। তারা অনেক মুসলমানকে বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত করতে সক্ষম হলেও ইসলামকে কলুষিত করতে পারবে না। আল্লাহতা'লা ওয়াদা করেন তিনি-ই আমাদের ধর্মকে রক্ষা করবেন।

২৬/ – রশীদ রেযা ধর্ম সংস্কারকের মুখ দিয়ে বলে: "মুজতাহিদ ইমামবৃন্দের গুণাবলী ও জ্ঞান আমি অস্বীকার করি না। তাঁদের গুণাবলী ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা প্রশংসারও ঊর্ধ্বে। কিন্তু এই মুজতাহিদদের যমানার আগে প্রত্যেক মুসলমান-ই দলিল-আদীল্লার খোঁজ করতেন। যারা পরবর্তী যুগে এসেছে, তারা এই সব প্রামাণ্য দলিল অন্বেষণ না করে মুজতাহিদ ইমামদেরকে আম্বিয়া (আ:)-গণের মর্যাদায় উন্নীত করেছে। তারা কোনো হাদীসের চেয়ে মুজতাহিদদের কথাকেই বেশি মূল্যায়ন করেছে। তারা বলেছে, ওই হাদীস হয়তো মনসুখ (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রথমাবস্থায় বলেছিলেন, পরবর্তীকালে রহিত করেন), কিংবা তাদের ইমামের কাছে হয়তো আরেকটি হাদীস আছে যা ওই হাদীসের চেয়েও বেশি নির্ভরযোগ্য। মুজতাহিদ ইমামগণ কিন্তু ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত মহানবী (দ:)-এর হাদীসকে এড়িয়ে এমন লোকের কথানুযায়ী আমল করেন নি যার ভুল করার

সম্ভাবনা ছিল, বা যে লোক বিষয়বস্তু সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল, অথবা ক্রুটি থেকে মুক্ত ছিল না।
মুকাল্লিদরা (অনুসারীবৃন্দ) সুস্পষ্ট পথপ্রদর্শক ও চূড়ান্ত প্রামাণিক দলিল কুরআন মজীদের সাথেও ভিন্নমত পোষণ করে। তারা বলে, ধর্ম (সরাসরি) আল-কুরআন থেকে শেখার অনুমতি নেই এবং একমাত্র মুজতাহিদ ইমামগণই কুরআনের অর্থ বুঝতে সক্ষম ছিলেন। তারা এও দাবি করেছিল যে মুজতাহিদের আদেশ-নিষেধ অগ্রাহ্য করে সরাসরি কুরআন অনুযায়ী আমল পালন করার কোনো অনুমতি-ই নেই। তারা বলেছিল, 'আল্লাহ এ কথা বলেন', বা 'রাসূলুল্লাহ (দ:) ও কথা বলেন' এমনটি বলারই নাকি কোনো অনুমতি নেই, বরং আমাদের নাকি বলতে হবে 'ফেকাহ'র উলেমা বিষয়টিকে এভাবে বুঝেছেন'। অধিকাংশ মানুষের বোঝার সাধ্যাতীত এমন কোনো জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা নেই যা কোনো বিশেষ যুগের বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষের উপলব্ধির আওতাতেই কেবল সীমাবদ্ধ থাকবে। এটি খোদায়ী আইনের একটি আবশ্যকীয় নীতি যে প্রাথমিক যুগের জ্ঞান বিশারদদের চেয়ে পরবর্তী যুগের পণ্ডিতেরা জ্ঞান-গরিমায় বেশি অগ্রসর হবেন। কেননা, পরবর্তীকালের বিদ্বানরা সেই জায়গা থেকে আরম্ভ করেন যেখানে পূর্বসূরীরা রেখে গিয়েছেন। ফেকাহ'র কেতাবপত্র থেকে কুরআন ও হাদীস বেশি বোধগম্য। যে ব্যক্তি আরবী ভালভাবে শিখেছেন তিনি এগুলো সহজেই বুঝতে সক্ষম। আল্লাহতা'লা কি তাঁর ঐশী ধর্ম ফেকাহবিদদের চেয়ে আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নন? আল্লাহ যা বুঝিয়েছেন, তা সবার চেয়ে রাসূলুল্লাহ (দ:)-ই ভাল বুঝেছেন; আর তিনি তা পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সমস্ত বিষয়-ই জানিয়ে দিয়েছেন।

"যদি বেশির ভাগ মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আইন-কানুন বের করতে অক্ষম হতেন, তবে এ সব ঐশী বিধি-বিধানের জন্যে সকল মানবকে দায়বদ্ধ করা হতো না। প্রত্যেকে যা বিশ্বাস করে তা দালিলিক প্রমাণসহ তার জানা আবশ্যক। আল্লাহতা'লা তাকলীদ ও মুকাল্লিদদের অনুমোদন করেন না। তিনি আল-কুরআনে ঘোষণা করেন যে বাপ-দাদাদের অনুকরণ করে তারা মাফ পাবে না। ইসলাম ধর্মে ঈমান-সংশ্লিষ্ট দলিলাদির চেয়ে ফেকাহ-বিষয়ক প্রামাণ্য দলিল অনুধাবন করা বেশি সহজ। আল্লাহতা'লা আমাদেরকে কঠিন বিষয়টির ক্ষেত্রে যেমন দায়বদ্ধ করেছেন, তেমনি এটি কি কখনো সম্ভব যে তিনি আমাদেরকে সহজ বিষয়টির বেলায়ও দায়বদ্ধ করবেন না?
"আম্বিয়া (আ:) ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত এ কথা সত্য, কিন্তু মুজতাহিদগণ হয়তো ভুল করতে পারেন। মুজতাহিদবৃন্দ ধর্মকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে কয়েক গুণ বড় করে ফেলেছেন। তাঁরা মুসলমানদেরকে মুশকিলে ফেলেছেন। এবাদতের ক্ষেত্রে কোনো কেয়াস (মুজতাহিদ ইমামবৃন্দের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত) নেই; কেউই এবাদতের মধ্যে কোনো কিছু যোগ করতে পারবে না। তবে, বিচারিক রায়ে কেয়াস ও এস্তেহসান (সুবিধা গ্রহণের অনুমতি) প্রয়োগযোগ্য। মুজতাহিদবৃন্দ-ও মানুষকে তাকলীদ করতে বারণ করেছিলেন।" [রশীদ রেযা কৃত 'মুহাওয়ারাত']
ওপরের বক্তব্যে মিথ্যে যুক্তি প্রদর্শন ও কুতর্কের মাঝে ধর্ম সংস্কারক বারবার স্ববিরোধিতা করেছে। জ্ঞানের যে কোনো শাখায় যুক্তি প্রয়োগ করতে হলে ওই জ্ঞান সম্পর্কে কিছু জানা প্রয়োজন। ইসলামের মৌলিক জ্ঞান সম্পর্কে যারা বোঝে না, তাদের যুক্তিশূন্য চক্রান্তমূলক চালে কোনো ফলাফল অর্জিত হয় না, বরং তাদের নিজেদের জন্যে তা অসম্মান বয়ে আনে। এ কথা সত্য যে মুজতাহিদবৃন্দের পূর্ববর্তী মুসলমানগণ, অর্থাৎ, সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) দলিল-আদিল্লার খোঁজ করতেন; তাঁরা একে অপরকে অনুসরণ করতেন না। কিন্তু তাঁরা তো সবাই মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর প্রশংসিত ইসলামী প্রথম শতকের সিদ্ধপুরুষ। সকল সাহাবী (রা:) এবং তাবেঈনদের অনেকেই ছিলেন মুজতাহিদ। কোনো মুজতাহিদের পক্ষে তিনি নিজে যা উপলব্ধি করেন তা অনুসরণ করা একান্ত আবশ্যক এবং অন্য কাউকে অনুসরণ করার অনুমতি তাঁর নেই।

‘যারা পরবর্তী যুগে এসেছে, তারা এই সব প্রামাণ্য দলিল অন্বেষণ না করে মুজতাহিদ ইমামদেরকে আম্বিয়া (আ:)-গণের মর্যাদায় উন্নীত করেছে’ – এ কথা কোনো মুসলমান-ই বলতে পারেন না; আর তিনি এ দাবিও করেন না যে পরবর্তীরা মুজতাহিদদেরকে আম্বিয়া (আ:)-গণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেছিলেন। কেননা, এই বক্তব্য চার মযহাবের অনুসারী কোটি কোটি মুসলমানকে কাফের (অবিশ্বাসী) হিসেবে কলংকচিহ্নিত করে। কোনো ব্যক্তি একজন মুসলমানকে কাফের বা অবিশ্বাসী বল্লে বা লিখলে সে নিজেই কাফেরে পরিণত হয়। মুকাল্লিদগণ কুরআন মজীদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন মর্মে অভিযোগ উত্থাপন করা আরও বড় এক কুৎসা। ধর্ম সংস্কারকদের ভাল করে জানা আবশ্যক যে মযহাব মানে কুরআন ও সুন্নাহ’র অনুসরণকারী পথ। যে মুসলমান কোনো ইমাম আল-মযহাবকে অনুসরণ করেন তিনি এই বিশ্বাস রাখেন যে আল্লাহর কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর সুন্নাহকেই তিনি অনুসরণ করছেন। কোনো মুসলমান-ই এ কথা বলেন না, “মুজতাহিদ ইমামের কথা অগ্রাহ্য করার এবং কুরআন মজীদ অনুযায়ী আমল পালন করার কোনো অনুমতি-ই নেই।” এ ধরনের কথা কোনো মুসলমান কখনোই বলেন নি। প্রকৃত মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্ম সংস্কারক, ফ্রী-মেইসন ও যিনদিকদের বানানো জঘন্য অপবাদগুলোর মধ্যে এটি একটি। প্রত্যেক মুসলমান এ কথা বলেন, “আমি কুরআনুল করীম ও হাদীস শরীফ মান্য করতে চাই, কিন্তু নিজে সেগুলো থেকে সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ। এই মৌলিক উৎসগুলো থেকে আমি নিজে যা বুঝি তার ওপর নির্ভর বা তা মান্য করতে পারি না। আমি ইমাম আল-মযহাবের ওপর নির্ভর করি এবং তিনি যা বুঝেছিলেন তারই অনুসরণ করি, কেননা তিনি আমার চেয়ে ঢের বেশি জ্ঞানী ও বিদ্বান ছিলেন। আমি যা জানি তিনি তার চেয়ে অনেক বেশি (ইসলামী) জ্ঞানের আটটি প্রধান শাখা ও বারোটি আনুষাঙ্গিক শাখা সম্পর্কে জানতেন। তিনি কুরআন মজীদ থেকে নিজের মনগড়া সিদ্ধান্ত নেন নি, বরং রাসূলুল্লাহ (দ:) হতে সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-গণের প্রাপ্ত ব্যাখ্যাগুলো তাঁদেরই কাছ থেকে শিখেছিলেন। আমি ওই হাদীস শরীফকে ভয় পাই, যা’তে ঘোষিত হয়েছে, **‘যে ব্যক্তি (কুরআন-হাদীস থেকে) নিজের মনগড়া অর্থ বের করবে, সে অবিশ্বাসীতে পরিণত হবে।’** বস্তুতঃ কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফ হতে সেই সকল মহান উলামার বের করা আইন-কানুনের মধ্যেও পার্থক্য ছিল, হুযূর পাক (দ:)-এর আহাদীসে প্রশংসিত যাঁদের জ্ঞান, সদগুণাবলী ও তাকওয়া তাঁদের উত্তরসূরীদের চেয়ে বহুগুণ শ্রেষ্ঠ ছিল। উৎস থেকে আইন-কানুন বের করা যদি এতো সহজ-ই হতো, তাহলে সবার সিদ্ধান্ত একই হতো।” কোনো অজ্ঞ-মূর্খ লোক কীভাবে সঠিক হতে পারে যখন সে বলে, ‘আল্লাহ এ কথা বলেন’ বা ‘রাসূলুল্লাহ (দ:) ও কথা বলেন’? আল্লাহ আমাদেরকে এভাবে কথা বলতেই নিষেধ করেছেন! এমন কি তাফসীরবিদ উলেমা কিংবা আয়েম্মা-এ-মযাহীবও এভাবে কথা বলার দুঃসাহস দেখান নি; তাঁরা যা বুঝেছিলেন তা ব্যাখ্যা করার পর তাঁরা সবসময়ই বলেন, “আমি এটি-ই বুঝেছি। আল্লাহতা’লা-ই প্রকৃত সত্য জানেন।” এমন কি সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-বৃন্দও কুরআন মজীদ উপলব্ধি করতে বেগ পেতেন এবং এ ব্যাপারে মহানবী (দ:)-কে জিজ্ঞেস করতেন। অতএব, ধর্ম সংস্কারক যে (চক্রান্তের) দিবাস্বপ্ন দেখছে তা কতো মূর্খতাপ্রসূত এবং আহাম্মকীপূর্ণ সেটি একেবারেই স্পষ্ট।

’প্রাথমিক যুগের জ্ঞান বিশারদদের চেয়ে পরবর্তী যুগের পণ্ডিতেরা জ্ঞান-গরিমায় বেশি অগ্রসর হবেন’, এ কথাটি পরীক্ষামূলক (বৈষয়িক) জ্ঞানের শাখাগুলোর ক্ষেত্রে সত্য। তবে ইসলামী জ্ঞানের বেলায় রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর হাদীস শরীফ-ই বহাল আছে; তিনি এরশাদ ফরমান: **“প্রতিটি শতাব্দী তার পূর্ববর্তী শতাব্দীর চেয়ে খারাপ হবে। এ নিয়ম চলবে প্রলয় দিবস পর্যন্ত।”** এই হাদীস শরীফ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তার ফলাফল ব্যবহারে বিজ্ঞানীদের ব্যক্তিত্ব ও গৃহীত পন্থার বেলায়ও বহাল আছে। এই নীতিমালা সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তবে প্রতি শতাব্দীতেই কিছু ব্যতিক্রম

বিদ্যমান। ধর্ম সংস্কারক পরীক্ষামূলক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মীয় জ্ঞানের মধ্যে তালগোল-ই কেবল পাকিয়ে ফেলে নি, সে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদেরও একই মনে করে বসে আছে। বিজ্ঞানের অবশ্যই অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে বিজ্ঞানীদেরও অগ্রগতি হয়েছে। পরবর্তী যুগের বিজ্ঞানীদের মধ্যে তাদের পূর্ববর্তীদের চেয়ে অধিকতর পশ্চাদগতিশীল, দুর্নীতিপরায়ণ ও হীন মানসিকতাসম্পন্ন লোকের সংখ্যা মোটেও কম নয়।
কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফ বোঝার জন্যে আরবী জানা প্রয়োজন এ কথা ঠিক, কিন্তু শুধু আরবী জানলেই যথেষ্ট হবে না। যদি যথেষ্ট হতো, তাহলে বৈরুতের আরব খৃষ্টানরাও এরই ফলশ্রুতিতে একেকজন ইসলামী পণ্ডিত হতো। কেননা, তাদের মধ্যে অনেকে মিসরীয় ধর্ম সংস্কারকদের চেয়ে ভাল আরবী জানে, আর এমন মানুষও তাদের মাঝে আছে যারা আরবী ভাষাবিদ এবং আরও অনেকে আবার **‘আল-মুনজিদ’** অভিধানের মতো শব্দকোষও সংকলন করেছে। অথচ এদের কেউই কুরআন মজীদকে মূল্যায়ন করতে পারে নি বা মুসলমান হবার সম্মানও অর্জন করতে সক্ষম হয় নি। আল-কুরআন মানুষকে ঈমান, ইসলাম তথা সুখ-শান্তির দিকে আহ্বান করে। তারা এই আমন্ত্রণকে নিজেদের মর্মে উপলব্ধি করতে পারলে তা তারা কবুল (গ্রহণ) করে নিতো। তাদের অবিশ্বাস এটি প্রতীয়মান করে না যে আল্লাহর এই আহ্বান অস্পষ্ট বা প্রাঞ্জল নয়। কুরআনুল করীম সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-কে, তাঁদের আলোকিত অন্তরকে এবং অভ্রান্ত যুক্তি-বিবেচনাকে সম্বোধন করে। কুরাইশদেরই ভাষায় এটি নাযেল করা হয়েছে। মিসরের জামেউল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে বা বৈরুতে শেখানো আরবী ভাষায় কুরআন মজীদ বক্তব্য রাখে না। রাসূলে পাক (দ:)-এর সোহবত তথা সান্নিধ্যে সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) পরিপক্কতা লাভ ও পূর্ণতা (কামেলিয়াত) অর্জন করেন, যা উম্মতের আর কেউই ওই পর্যায়ে অর্জন করতে পারেন নি। তবুও কুরআন মজীদ সম্পর্কে তাঁদের উপলব্ধি একে অপরের চেয়ে ভিন্নতর ছিল। তাতে এমন কিছু বিষয়ও ছিল যা সাহাবাবৃন্দ (রা:) বুঝতে বেগ পেয়েছিলেন। এই মহান জ্ঞান বিশারদদের ক্ষেত্রেই যদি এ রকম অবস্থা হয়, তাহলে আমাদের মতো (বর্তমানকালের) কথিত/চলিত আরবী জানা মানুষের বেলায় কী হতে পারে তা অনুমান করুন। আমাদের আয়েম্মা-এ-মযাহিব আল-কুরআনের অর্থ নিজে নিজে বের করতে চেষ্টা করেন নি, বরং নিজেদেরকে অক্ষম বুঝতে পেরে সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর কাছে জিজ্ঞেস করে শেখার চেষ্টা করেছিলেন কুরআন মজীদের সেই সমস্ত ব্যাখ্যা-ই, যেগুলো তাঁরা মহানবী (দ:) থেকে পেয়েছিলেন। অধিকন্তু, মযহাবের ইমামবৃন্দ নিজেরা যা বুঝেছিলেন তার চেয়ে সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) যা বুঝেছিলেন তাকেই প্রাধান্য দিতেন। ইমামুল আ’যম হযরত আবূ হানিফা (রহ:) নিজের উপলব্ধির চেয়ে যে কোনো সাহাবী (রা:)-এর কথাকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ (দ:) বা সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) হতে কোনো তথ্য পেতেন না, কেবল তখনই নিজ এজতেহাদ (গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত) প্রয়োগ করতেন। প্রতি শতাব্দীর ইসলামী উলেমাবৃন্দ-ই তাঁদের পূর্ববর্তীদের মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব, ওয়ারা (কৃচ্ছ্রব্রত) ও তাকওয়া (খোদাভীরুতা) দর্শনে শ্রদ্ধাবনত হয়েছেন এবং পূর্বসূরীদের কথাকে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে আঁকড়ে ধরেছেন। ইসলাম হচ্ছে আদব (শিষ্টাচার) ও তাওয়াদু (বিনয়)-এর ধর্ম। কোনো অজ্ঞ-মূর্খ হয়তো উদ্ধত আচরণ করতে পারে এবং নিজেকে ইসলামী পণ্ডিতও মনে করতে পারে, কিন্তু একজন জ্ঞান বিশারদ বিনয়ী ও নিরহঙ্কার হন। আল্লাহতা’লা বিনয়ী ব্যক্তিকে সম্মানিত করেন। মহানবী (দ:)-এর ভবিষ্যদ্বাণীকৃত জাহান্নামী ৭২টি দলের প্রত্যেক নেতা-ই বড় আলেম ছিল; তথাপিও তারা নিজেদের জ্ঞানের ওপর বেশি নির্ভর করেছিল এবং কুরআন-সুন্নাহ থেকে অর্থ বের করতে চেষ্টা করেছিল। তাই তারা সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর পথ ও মতের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়ানোর মহা সম্মান অর্জন করতে ব্যর্থ হয় এবং ফলস্বরূপ সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়। তাদের কারণেই অসংখ্য মুসলমান জাহান্নামে যাবে। পক্ষান্তরে, চার মযহাবের উলেমাবৃন্দ কুরআন মজীদ হতে আইন-

কানুন বের করার সময় নিজেদের গভীর জ্ঞানকে ব্যবহার করেন নি; তাঁরা এ কাজ করার দুঃসাহস-ই দেখান নি। তাঁরা তাঁদের মেধা ও জ্ঞানকে মহানবী (দ:) এবং তাঁর সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) কী বলেছিলেন তা বুঝতে কাজে লাগিয়েছিলেন। আল্লাহতা'লা কুরআন মজীদ থেকে আইন-কানুন বের করতে মানুষদেরকে আদেশ করেন নি। হুযূর পূর নূর (দ:) ও তাঁর সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) যে বিধি-বিধান আমাদের দিয়েছেন, তা-ই গ্রহণ ও মান্য করতে তিনি আমাদের আদেশ করেছেন। ধর্ম সংস্কারকদের দ্বারা এই সূক্ষ্ম বিষয় উপলব্ধির অক্ষমতা-ই তাদেরকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ ফরমান, **"আমার রাসূল (দ:)-কে মান্য করো!"** এবং **"আমার রাসূল (দ:)-এর (রীতি-নীতির) সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নাও।"** এর পাশাপাশি মহানবী (দ:) এরশাদ ফরমান, **"আমার সাহাবীদের (পথ ও মত)-কে আঁকড়ে ধরো!"** ওপরের এই দলিলগুলোই আমাদের কথাকে সমর্থন দেয়। যদি আইম্মা-এ-মযাহীব (চার মযহাবের চার ইমাম)-কে অনুসরণ করার মানে হতো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (দ:)-কে ত্যাগ করে কোনো মাখলুক তথা সৃষ্টির তাবেদারী করা, তাহলে সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-কে অনুসরণ করার মানেও একই হতো। যেহেতু বিষয়টি এ রকম ছিল না, তাই রাসূলে করীম (দ:) এটি আদেশ করেন। তিনি সংক্ষেপে ঈমান (বিশ্বাস) পোষণ করতে বলেন এবং তাঁকে যেভাবে ও যতোটুকু এবাদত পালন করতে মানুষেরা দেখেছিলেন, ঠিক সেভাবে তা পালন করতে নির্দেশ দেন। তিনি কখনোই বলেন নি যে তাঁদেরকে এগুলোর দলিলও জানতে হবে [ইমাম গাযযালী রহমতুল্লাহে আলাইহে নিজ **'কিমিয়ায়ে সাআদত'** গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন]। আল্লাহ পাক অবিশ্বাসীদের দ্বারা নিজেদের পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের অনুকরণ-অনুসরণকে অনুমোদন করেন না; ফলে তিনি তাদেরকে অবিশ্বাস ত্যাগ করে বিশ্বাস করতে আদেশ করেন। অপর দিকে, তিনি তাঁর রাসূল (দ:)-কে অনুকরণ-অনুসরণ করতে নিষেধ করেন নি, বরং তা করতে আদেশ করেছেন। আর মহানবী (দ:) এটির পাশাপাশি তাঁর সাহাবা-এ-কেরাম (দ:)-কে অনুসরণ করতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। বদ বা মন্দ কাউকে অনুকরণ-অনুসরণ অবশ্যই মন্দ, কিন্তু তা তো ভাল কাউকে অনুসরণ করায় আমাদের ফিরিয়ে রাখতে পারে না। ওপরের ব্যাখ্যানুযায়ী, ঈমান সংক্রান্ত জ্ঞান বোঝা যদি এতোই সহজ হতো, তবে বৈরুতের খৃষ্টান আরবরাও সহজেই ঈমানদারী অর্জন করতে পারতো। যেহেতু বিশ্বাস স্থাপনের মৌলিক বিষয়গুলোর দলিলাদি উপলব্ধি করা মোটেও সহজ বিষয় নয়, সেহেতু আমাদেরকে দলিল বোঝার প্রয়োজন ব্যতিরেকেই অন্তরে ঈমান তথা বিশ্বাস পোষণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর যারা এভাবে বিশ্বাস এনেছেন, তাঁদেরকে বলা হয় **'মো'মেনূন'** (ঈমানদার মুসলমান)। আল্লাহতা'লা যদি এবাদত-সম্পর্কিত আইন-কানুনের দলিল শেখা ও বোঝার ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে দায়বদ্ধ করতেন, তাহলে তাঁর রাসূল (দ:)-ও তা করতে বলতেন। কিন্তু ওপরে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তিনি কখনোই তা করতে বলেন নি।

আম্বিয়া (আ:) কখনো ভুল না করলেও মুজতাহিদবৃন্দ হয়তো ভুল করতে পারেন, এ কথাটি বলে ধর্ম সংস্কারক এই ধারণা দিয়েছে যে মুজতাহিদবৃন্দের বের করা আইন-কানুন বুঝি মহানবী (দ:)-এর প্রকাশিত আদেশ-নিষেধ হতে ভিন্ন কোনো বিষয়। অথচ একজন মুজতাহিদ বা ইমাম আল-মযহাব হলেন এমনই এক মহান আলেম, যিনি রাসূলুল্লাহ (দ:) ও তাঁর সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) কর্তৃক প্রদত্ত বিধি-বিধান খুঁজে বের করার কাজে তাঁর সারা জীবন দিন-রাত গবেষণায় অতিবাহিত করেছেন; আর যিনি এই আজ্ঞাবলী সম্পর্কে মুসলমানদেরকে জানিয়েছেনও। কোনো মুজতাহিদ-ই যে কোনো ধরনের এবাদতে কোনো কিছু সংযোজন করেন নি। তাঁরা সর্বসম্মতভাবে বলেন যে এটি করা বেদআত এবং মহাপাপ। মুজতাহিদবৃন্দ যে জিনিসকে নিজেরাই নিষেধ করেছেন, তা তাঁরা

করেছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করার মতো নোংরা ও ঘৃণিত কুৎসা রটনা আর কিছেই হতে পারে না। তাঁরা ধর্মকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করেছিলেন বলা মহা অজ্ঞতা ও আহাম্মকী বৈ কী! এর জবাব হাসির রোল দ্বারাই দেয়া যায়। কেননা, ধর্ম সম্প্রসারিত হয় না, বরং বিভিন্ন বিষয়ের সংখ্যা-ই বৃদ্ধি পায় শুধু। সময়ের পরিক্রমণে উদ্‌ভূত এই সব বিষয়ের প্রতি ইসলামী বিধান প্রয়োগের এই গবেষণা দ্বীনেরই এক মহা খেদমত এবং অত্যন্ত মূল্যবান এবাদতও। আর এটি মুজাদ্দেদ (দ্বীন পুনরুজ্জীবিতকারী) ইমামবৃন্দের ভাগ্যে ইতিপূর্বে নসীব হয়েছে এবং আজও হচ্ছে।

কোনো মুজতাহিদকে 'মুজতাহিদ মোতলাক' (স্বয়ংসম্পূর্ণ) হতে হবে না। এ কথা সত্য যে আইম্মা-এ-মযাহিব (চার মযহাবের চার ইমাম) তাকলীদ নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তা তো শুধু সেই সব আলেমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল, যাঁরা ছিলেন আইম্মা-এ-মযাহিবের শিষ্যদের মধ্যে শিক্ষিত ও মুজতাহিদের মর্যাদায় উন্নীত। কোনো মুজতাহিদ কর্তৃক অপর কোনো মুজতাহিদের অনুসরণের অনুমতি একেবারেই নেই। এই নিয়ম প্রলয় দিবস পর্যন্ত বহাল থাকবে। তবে এই নিয়ম সেই সব গণ্ডমূর্খ ও ধর্ম সংস্কারকের বেলায় প্রযোজ্য হবে না, যারা নিজেদেরকে মুজতাহিদ মনে করে। একটি ইঁদুর নিজেকে সিংহ মনে করে যদি কোনো বিড়ালের মুখোমুখি হয়, তাহলেই বুঝতে পারে সে ভুল করেছিল। কিন্তু এই ভুলের মাশুল তাকে জীবন দিয়ে দিতে হয়।
২৭/ – ধর্ম সংস্কারক সপ্তম সংলাপে বলে: "ধর্মের মর্যাদাকে তত্ত্ব ও দর্শনে নামিয়ে নিয়ে আসে পরবর্তীকালের ইসলামী উলামাবৃন্দ। তাঁরা কিছু সংজ্ঞা ও সীমাবদ্ধতা আরোপ করেন। তাঁরা দ্বীনকে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত করেন। বস্তুতঃ এঁদের মধ্যে কেউ কেউ এ কথাও বলেন যে ফেকাহবিদ আলেম হতে হলে বিশ বছর অধ্যয়ন করতে হবে। অথচ, ওই রকম সময়কালের মধ্যেই ধর্মের সকল শাখা অথবা বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ফেকাহ-শাস্ত্র প্রণয়নে এমন কি দুই বছরও লাগে নি। আমি চাই আধুনিক মুসলমান সর্বসাধারণ চার খলীফার শাসনামলের মুসলমানদের মতো হবেন। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি এই কর্তব্য বর্তায় যে তাঁরা সেই এবাদত ও আমল পালন করবেন যার ওপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিতর্কিত আমল পালন করা জরুরি নয়, এমন কি যদি সেগুলোকে ফরয বা অবশ্য করণীয় বলে বর্ণনাও করা হয়। এ সব ক্ষেত্রে প্রত্যেকের উচিত নিজে নিজে দলিল দেখে আমল পালন করা; অথবা কোনো কওল (বর্ণনা) অনুযায়ী ধর্ম অনুশীলন করা, যদি সেটি তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধায় সে পছন্দ করে। কিন্তু সে তার মতো আমল না করার কারণে অন্যান্যদের দোষারোপ করতে পারবে না। একই মসজিদে একই সময়ে বিভিন্ন মযহাবের ভিন্ন ভিন্ন ইমামের ইমামতিতে নামায আদায় করা যথাযথ নয়। সংক্ষেপে, আমরা তা-ই করবো যা সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) করেছেন; আর তাঁরা যা করেন নি, আমরাও তা করবো না। বিতর্কিত বিষয়গুলোতে আমাদের নিজস্ব মতামতকে প্রাধান্য দিতে হবে। সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) যে সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন নি, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা 'কেয়াস' (গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত) প্রয়োগ করবো। বিতর্কিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে প্রত্যেকে যে হাদীসগুলোকে সহীহ মনে করে, সেগুলো অনুযায়ী তার আমল পালন করা উচিত।" (রশীদ রেযা কৃত 'মুহাওয়ারাত')

রশীদ রেযা এই উদ্‌ধৃতিতে ইসলামী উলেমাবৃন্দের বিরুদ্ধে ধর্মে বিভক্তি সৃষ্টির এবং এতে সংজ্ঞা ও সীমাবদ্ধতা আরোপের মাধ্যমে ইসলামে দার্শনিক মতবাদ পরিবেশনের অভিযোগ উত্থাপন করেছে। অথচ কালাম-শাস্ত্রের উলেমাবৃন্দের সাথে দর্শনের বিন্দুমাত্র সম্পৃক্ততাও নেই। কেননা, তাঁরা দার্শনিকদের চেয়ে অনেক, অনেক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। তবে উমাইয়া খলীফাদের শাসনামলে তিনটি মহাদেশজুড়ে, অর্থাৎ, এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে ছড়িয়ে পড়া মুসলমানগণ অ-মুসলিম

নানা দল-উপদলের সংস্পর্শে আসেন; এ ছাড়াও খারেজী ও মো'তাযেলা সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে যারা নব্য মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালায়। উলামা-এ-আহল-এ-সুন্নাত তথা সুন্নী ইসলামী জ্ঞান বিশারদমণ্ডলীকে মুসলমানদের ঈমান রক্ষায় এবং বিভিন্ন ধর্ম, দার্শনিক ও যিনদিকদের প্রত্যুত্তর দিতে এগিয়ে আসতে হয়। এই সব দর্শনের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর তৈরি করে তাঁরা 'এলমুল্ কালাম' (কালাম-শাস্ত্রীয় জ্ঞান) প্রণয়ন করেন এবং তা সর্বত্র প্রচার-প্রসার করেন; আর ফলশ্রুতিতে তাঁরা এই খেদমত দ্বারা তরুণ প্রজন্মকে ধোকায় পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেন। ইসলামের প্রতি তাঁদের এই মহৎ ও মর্যাদাকর সেবার জন্যে যেখানে আমাদের উচিত তাঁদের প্রশংসা করা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও দোয়া করা, সেখানে এই একই কারণে তাঁদের কুৎসা রটনা করা কি কোনো মুসলমানের পক্ষে শোভা পায়? যেহেতু সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) অত্যন্ত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর মতো অনুপম হেদায়াতদাতা পেয়েছিলেন, সেহেতু দ্বীন ইসলাম বিশ বছরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইসলামের দ্বিতীয় শতকের পরে তিনটি মহাদেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া মুসলমানদের কিন্তু এই দুইটি প্রয়োজনীয় শর্তের কোনোটি-ই ছিল না। শিক্ষকের কাছ থেকে শিষ্যের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে জরুরি সময়কাল আরও দীর্ঘতর হয়ে যায়। তথাপিও উলেমাবৃন্দ বলেন যে স্বল্প সময়ে শিক্ষাদান সম্ভব যদি শিক্ষক স্নেহপরায়ণ ও দক্ষ হন এবং শিক্ষার্থী বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়ী হয়; আর ইতিহাসের বইপত্র পাঠে জ্ঞাত হয়েছে যে এই সব শর্ত পূরণে সক্ষম উলেমাবৃন্দেরও আবির্ভাব ঘটেছিল। অধিকন্তু, বেদআত ও পাপের অন্ধকার অন্তরের ওপর প্রভাব ফেলেছিল এবং স্মৃতিশক্তির তীক্ষ্ণতাকেও খর্ব করেছিল, যার ফলশ্রুতিতে শিক্ষাগ্রহণের সময়কাল দীর্ঘতর হয়েছিল। এমন কি ইমাম শাফেঈ (রহ:)-ও তাঁর শিক্ষক ওয়াকী' (রহ:)-এর কাছে স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার ব্যাপারে অনুযোগ করেছিলেন। তাঁকে যে উত্তরটি দেয়া হয়েছিল তার বাস্তবতা নিম্নের দ্বি-চরণে প্রতীয়মান হয়:

'শাকাওতুল ওয়াকী' য়া মিন সুয়ি হিফযী,

ফা- আওসানি ইলা তরক- ইল মা' আসী।'

অর্থাৎ, আমি নিজের দুর্বল স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে ওয়াকী'র কাছে অনুযোগ করলাম। তিনি আমাকে কোনো পাপ সংঘটন না করার উপদেশ দিলেন।

ধর্ম সংস্কারক একদিকে বলছে যে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত এবাদত ও আমল প্রত্যেক মুসলমানের পালন করা উচিত, অপর দিকে এও বলছে যে বিতর্কিত আমলগুলো মুসলমানদের এড়িয়ে চলা উচিত; বা তাঁদের যে মযহাব পছন্দ সেটির বিধান অনুযায়ী অনুশীলন করা উচিত; অর্থাৎ, মযহাবগুলোকে একীভূত বা সংমিশ্রণ করা উচিত। তার কথা পরস্পরবিরোধী। কেননা, মযহাবগুলোর সংমিশ্রণ যে ভুল বা বিচ্যুতি, তা সর্বসম্মতভাবে ঘোষিত হয়েছিল। এই ভুল পন্থা অবলম্বন উলেমাবৃন্দের সর্বসম্মতিটির প্রতি অবাধ্যতা জ্ঞাপন ছাড়া কিছু নয়। তাই ধর্ম সংস্কারকের এবাদত-আমল তার নিজের মাপকাঠিতেও সঠিক ও গ্রহণযোগ্য হবে না। উপরন্তু, এ কথা বলাও ভুল যে সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) বিতর্কিত আমলগুলো পালন করেন নি, বা তাঁরা সেগুলো অনুশীলন করলে কোনো বিতর্কিত আমল থাকতো না। কেননা, এমন কিছু আমল-ও ছিল যেগুলোর বেলায় সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) কর্তৃক অনুশীলিত পন্থা না বোঝার কারণে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। অধিকন্তু, উলেমাবৃন্দের ঐকমত্যের সাথে এই কথা বলা অসঙ্গতিপূর্ণ যে ইমাম আল-মযহাবের

সিদ্ধান্তের তোয়াক্কা না করে হাদীস শরীফ থেকে নিজে যা বুঝে সেই অনুযায়ী আমল করা বৈধ। এতে বোঝা যায় যে ওই ব্যক্তি নিজেকে ইমাম আল-মযহাবের চেয়েও শ্রেষ্ঠ মনে করে; আর এই দোষটি শয়তানেরই একটি বৈশিষ্ট্য।

২৮/ – অষ্টম সংলাপে ধর্ম সংস্কারক বলে: ”চিন্তা, গবেষণা ও দলিল রচনার আলো, যা আল্লাহতা'লার সৃষ্ট (মানবের) প্রকৃতিগত স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাকলীদ-কারী মানুষেরা তার সবচেয়ে বড় শত্রু।” (রশীদ রেযা কৃত ’মুহাওয়ারাত’)

এ রকম জাজ্বল্যমান মিথ্যে ও জঘন্য কুৎসা সত্যি চিন্তার বিষয়। কোন্ ফকীহ চিন্তাভাবনা, গবেষণা ও দলিল অন্বেষণকে নিষেধ করেছিলেন? কোন্ মুসলমান এগুলোর প্রতি বৈরি ভাবাপন্ন? তার (রশীদ রেযার) অন্ততঃ একখানা উদাহরণ দেয়া উচিত ছিল। তার বইয়ের শুরু থেকে যতো মিথ্যে বা অপবাদ সে লিপিবদ্ধ করেছে, তার কোনটিকে সে দলিল দ্বারা সমর্থন দিয়েছে যে এটিকেও অনুরূপ সমর্থন দেবে? আসলে ধর্ম সংস্কারক নিজেই দলিল রচনার প্রতি বৈরি ভাবাপন্ন। যে লোক নিজের অদূরদর্শিতা ও ভুল যুক্তির সাহায্যে পরিকল্পিত কোনো বিষয়কে ধর্মীয় জ্ঞান হিসেবে উপস্থাপন করে, তাকে চিন্তা বা দলিল পেশ করতে বলা একেবারেই অযৌক্তিক হবে। ‘নীরবতা পালন-ই আহাম্মকের প্রতি প্রদত্ত সর্বোত্তম জবাব’, এই প্রবাদ বাক্যটি এবং জিহ্বাকে সংযত রাখা যদিও এখানে যথাযথ, তবুও এই ধরনের লোকের ক্ষতি থেকে তরুণ প্রজন্মকে রক্ষার উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে জবাব দেয়া জরুরি হবে। ’ফেকাহ’বিদ সকল উলেমা-ই বলেছেন যে কোনো মুকাল্লিদের জন্যে দালিলিক প্রমাণ অন্বেষণ করার প্রয়োজন নেই। কারণ, তাবেঈনদের মধ্যে নতুন মুসলমানগণ কখনোই দলিল অন্বেষণ না করে সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর কাছে জিজ্ঞেস করে ধর্ম অনুশীলন (আমল পালন) করতেন। উপরন্তু, এমন কোনো আলেম-ই আসেন নি যিনি দলিল অন্বেষণকে নিষেধ করেছিলেন। এই কারণেই আইম্মা-এ-মযাহিব (চার মযহাবের ইমামবৃন্দ) সমস্ত দলিল পূর্ণাঙ্গভাবে লিপিবদ্ধ করেন এবং যারা দলিল দেখতে চান তাদের জন্যে কাজটি সহজ করে দেন।

২৯/ – ধর্ম সংস্কারক বলে: “প্রথম শতাব্দীর মুসলমানবৃন্দ যেভাবে করতেন, ঠিক সেভাবেই অজ্ঞরা আস্থাভাজন কাউকে সে সব বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে যা তারা জানে না। তারা ওই বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত কোনো আয়াত বা হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করবে, এর অর্থ জেনে নেবে এবং সেই অনুযায়ী আমল (অনুশীলন) করবে।” (’মুহাওয়ারাত’)
আল্লাহ রহম করুন! দেখুন, বিদ্যার কী বহর, আর কোন্ ধাঁচেরই বা এই যুক্তি! এটি সত্য যে সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) এ পদ্ধতিতে আমল পালন করতেন, কিন্তু তাঁরা তো মহানবী (দ:)-এর সোহবত তথা সান্নিধ্যে অর্জিত পরিপক্কতার কারণে আইম্মা-এ-মযাহীব হতে শ্রেষ্ঠ হয়েছিলেন। নিম্নের হাদীস শরীফে তাঁদের উচ্চসিত প্রশংসা করা হয়েছে: **“আমার সাহাবীরা আকাশের নক্ষত্র সমতুল্য। তাদের যে কাউকে অনুসরণ করলে তোমরা সঠিক পথ পাবে।”** বস্তুতঃ তাঁরা সবাই ঐশী বাণীর অর্থ বুঝতে সক্ষম ছিলেন। কুরআন বা সুন্নাহ'তে স্পষ্টভাবে ঘোষিত নয় এমন বিষয়ে ওর সমাধান তাঁরা আয়াতে করীমা ও আহাদীসে খোঁজ করতেন; তা না পেলে তাঁরা নিজ এজতেহাদ প্রয়োগ করে ফয়সালা বের করতেন। তাঁদের একে অপরের মধ্যে তাকলীদ করার প্রয়োজন ছিল না, অনুমতিও ছিল না। সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন, ঠিক একই পদ্ধতি আমাদের আইম্মা-এ-মযাহীবও অনুসরণ করেন। আসহাব-এ-কেরাম (রা:)-এর মতো তাঁরাও

দলিলাদি খুঁজে বের করেন এবং এজতেহাদ প্রয়োগ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ফলশ্রুতিতে তাঁরা এবাদতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মযহাবে বিভক্ত হন। এই পন্থায় তাঁরা মহানবী (দ:)-এর আদেশ পালন করেন, কেননা তিনি এরশাদ করেছিলেন, **"আমার সাহাবীদের অনুগামী হও!"** যেহেতু তাবেঈনগণের মধ্যে নও-মুসলিমবৃন্দ সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর কাছে দালিলিক প্রমাণ খোঁজ করেন নি, সেহেতু আমাদের মতো দলিল না জানা মানুষের পক্ষে আইম্মা-এ-মযাহীবের প্রামাণিক দলিল জানার চেষ্টা করাও জরুরি নয়। আমরা তাঁদের লিখিত বইপত্র পড়ে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে জানতে পারি। এ সব পুস্তক কুরআন মজীদেরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। দেখুন, এই লোক (রশীদ রেযা) গ্রামের যে কোনো অজ্ঞ মেষপালককে সাহাবী (রা:)-দের সাথে তুলনা দিয়েছে, যাকে সে ঘন ঘন শহরে যেয়ে আল-কুরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফ দেখে নিজ উপলব্ধি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে এজতেহাদ প্রয়োগ করার পরামর্শ দিচ্ছে! কোনো ইমাম আল-মযহাবকে অনুসরণের সুযোগ ও সুবিধা যেখানে আছে, সেখানে সে ওই সাধারণ মানুষটির ঘাড়ে কষ্টের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে!
৩০/ – ধর্ম সংস্কারক সহস্র সহস্র ইসলামী উলামাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে বলে চলে: "উসূলের উলেমাবৃন্দ তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা একখানি আয়াত থেকে বের করেছেন, যা'তে ঘোষিত হয়েছে, **'ফাসয়ালূ আহলায্ যিকরে ইন্ কুনতুম লা তা'লামূন'**, অর্থাৎ, **তোমরা না জানলে তাঁদের জিজ্ঞেস করো, যাঁরা জানেন**।' এটি মোটেও ফলদায়ক ও নির্ভরযোগ্য (গবেষণামূলক) সিদ্ধান্ত নয়, যুক্তিও নয়। এই আয়াতে করীমা সবাইকে তাকলীদ করার আদেশ দেয় না; কেননা এই আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনাবলী বা যার উদ্দেশ্যে এটি নাযেল হয়েছে, কোনো ক্ষেত্রেই তাকলীদ অনুমতিপ্রাপ্ত ছিল না। এই আয়াতে আল্লাহ পাক মূর্তি পূজারী আরবীয়দেরকে বলেছেন আহলে কেতাব তথা ইহুদী-খৃষ্টানদেরকে জিজ্ঞেস করতে এই মর্মে যে আম্বিয়া (আ:)-গণ ফেরেশতা, না মানব জাতি। এই প্রশ্নটি তাকলীদের সাথে সম্পৃক্ত হবে কেন, যেখানে প্রমাণ অন্বেষণ ছাড়া কারো এজতেহাদ বা মতামত অনুযায়ী অনুশীলনের কথা ব্যক্ত-ই হয় নি। উপরন্তু, এই বিষয়টি ঈমান তথা আকীদা-বিশ্বাসের সাথে জড়িত। আপনারাও তো স্বীকার করেন যে ঈমানী বিষয়ে তাকলীদের কোনো অনুমতি নেই। আল-কুরআন ভবিষ্যদ্বাণী করে যে কেয়ামত দিবসে অবিশ্বাসীদের নেতারা নিজেদের অনুসারীদের ছেড়ে পালাবে। এ তথ্য কি এই বাস্তবতার আলামত নয় যে আল্লাহ যাদেরকে অনুসরণ করতে আদেশ করেন নি, তাদেরকে যারা অনুসরণ করে, সেই অনুসারীদেরকে তিনি ক্ষমা করবেন না? যেহেতু মুসলমানগণ কতিপয় মানুষকে সাক্ষী হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন এবং আল-কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, সেহেতু আমরা দুর্যোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলাম। তাঁরা যে ইমামবর্গ (মানে আইম্মা-এ-মযাহীব)-কে অনুসরণ করেন, তারা কেয়ামত দিবসে তাঁদের কাছ থেকে পালাবে। কেননা, মহান ইমামবৃন্দ ও মুজতাহিদগণ তাকলীদ করতে নিষেধ করেছিলেন। আপনারা আল্লাহতা'লা ও তাঁর রাসূল (দ:)-এর কথাকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ না করে মানুষের কথাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন।"
('মুহাওয়ারাত')

ধর্ম সংস্কারকের মুখ দিয়ে এ সব কথা বলানোর পর রশীদ রেযা তার পাঠকদেরকে ধোকা দেয়ার জন্যে লিখে যে ধর্ম প্রচারক ধর্ম সংস্কারকের এই কথা খুব পছন্দ করেন; আর তিনি এও বুঝতে পারেন যে ধর্ম সংস্কারক অজ্ঞ মর্মে তাঁর ধারণাটি একদম ভুল; অধিকন্তু, ধর্ম সংস্কারককে এতো জ্ঞানী পণ্ডিত দেখতে পেয়ে তিনি বর্তমানে তার গুণগ্রাহীও হয়েছেন।
আমাদের রাসূলুল্লাহ (দ:) ওপরের এই আয়াতটি থেকে সিদ্ধান্ত নেন যে সকল প্রকার আমল ও এবাদত পালনের ক্ষেত্রে কোনো মুজতাহিদের তাকলীদ (অনুসরণ) করা জরুরি। আর সাহাবা-এ-

কেরাম (রা:) রাসূলুল্লাহ (দ:) হতে যেভাবে এবাদত ও আমল করার পদ্ধতি শিখেছিলেন, তা তাবেঈনদের মধ্যে শুধু নও-মুসলিমদেরকেই শিখিয়েছিলেন। তাঁরা তাবেঈনদেরকে দলিল খুঁজতে আদেশ করেন নি। দলিল না জেনে তাঁদেরকে অনুকরণ-অনুসরণ করাই তাবেঈনদের জন্যে যথেষ্ট মনে করেছেন। আমাদের অাইম্মা-এ-মযাহীব, যাঁরা নিজেদের সব কাজে সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর পদাংক অনুসরণ করতেন, তাঁরা এ ক্ষেত্রেও সাহাবী (রা:)-দের অনুসরণ করেন। তাঁরা তাকলীদ করাকে নিষেধ করেছেন বলা আর সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর পথ থেকে তাঁরা বিচ্যুত হয়েছেন বলা একই কথা। এটি সত্য যে আসহাবে কেরাম (রা:) ও আইম্মা-এ-মযাহীব (রহ:) প্রামাণ্য দলিলের খোঁজ করতেন এবং একে অপরের এজতেহাদের অনুসরণ করতেন না। কিন্তু তাঁরা অ-মুজতাহিদদেরকে মুজতাহিদগণের অনুসরণের অনুমতি দিয়েছিলেন। ওপরের আয়াতটি অবিশ্বাসীদের প্রতি তাকলীদ করতে আদেশ করে নি মর্মে ধর্ম সংস্কারকের দাবিটি প্রকৃতপ্রস্তাবে এই বিষয়কে কূটতর্কে ধামাচাপা দেয়ারই একটি অপপ্রয়াসমাত্র। ইসলামী উলেমাবৃন্দ কোথাও এ কথা বলেন নি যে অবিশ্বাসীদেরকে তাকলীদ অনুশীলন করার আদেশ দেয়া হয়েছে; তাহলে কেন ধর্ম সংস্কারকের কথাকে সঠিক হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হবে? আল্লাহতা'লা উক্ত আয়াতে যারা জানেন না তাদের প্রতি আদেশ করেন যেন তাঁরা জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞেস করে শেখেন। আর ইসলামী উলেমাবৃন্দ এই আয়াতটি থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে মুসলমানগণ দ্বীনী বিষয়ে জ্ঞানী বুযূর্গদের কাছে নিজেদের ধর্মীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে শিখবেন এবং সেই অনুযায়ী সেগুলো অনুশীলন করবেন। এটি-ই সামগ্রিক বিষয়। এখানে তাকলীদ বা দলিল অন্বেষণের কোনো কিছুই নেই। ধর্ম সংস্কারক এতে এ বিষয়গুলো সন্নিবেশিত করে নিজেকে সঠিক প্রমাণ করতে অপতৎপর হয়েছে। কোনো আমল পালনে দলিলের খোঁজ না করে একজন আলেমকে অনুসরণ করা একটি ভিন্ন বিষয়। আর এই ভিন্ন বিষয়টি আপনাআপনি-ই পূর্ববর্তী বিষয়টি থেকে নিঃসৃত হয়, অর্থাৎ, কোন্ কাজ করতে হবে এবং কোনটি করা যাবে না, তা যিনি জানেন তাঁর কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে শেখা; আর তাঁর কাছ থেকে শিখে সেই অনুযায়ী অনুশীলন করাই হচ্ছে তাঁকে **তাকলীদ** বা অনুসরণ করা। অথচ ঈমানের ক্ষেত্রে অনুকরণের বিষয়টি একই রকম নয়। যেহেতু বিশ্বাসসংক্রান্ত বিষয়গুলো জিজ্ঞেস করা ও শেখার সাথে সাথেই অন্তরে সুদৃঢ় হয় না, সেহেতু এগুলোকে তাকলীদ বলা হয় না। ঈমান শেখার পর প্রত্যেকে এ নিয়ে চিন্তা করেন, অনুমোদন এবং স্বীকারও করেন; অতঃপর এই বিশ্বাস অন্তরে সুদৃঢ় হয়। আর এ ঈমান-ই ইসলাম ধর্মের জন্যে অত্যাবশ্যক। চিন্তা ও স্বীকৃতি ছাড়া শিক্ষাকৃত বিবেচনার অযোগ্য যে ঈমান বা বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করা হয়, তা অনুকরণশীল ও প্রামাণিক দলিলবিহীন। অবিশ্বাসী যারা নিজেদের পিতামাতাকে অনুকরণ করে অবিশ্বাসী হয়েছে, তাদের ব্যাপারটি এ রকমই। ইসলামের ক্ষেত্রে শর্ত এই যে, মানুষেরা চিন্তা করবেন, প্রমাণগুলো দেখবেন এবং নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবেন ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে। অবিশ্বাসীদের এই অবিশ্বাস তাদের নিজেদের দ্বারা তৈরি নয়, বরং তাদের পিতামাতাদের তৈরি; কিন্তু এটি তাদের নিজেদের বৈশিষ্ট্যেই পরিণত হয়। অতএব, পরিদৃষ্ট হচ্ছে যে তাকলীদের সাথে ঈমানের কোনো সম্পর্কই নেই। যেহেতু ঈমানের ক্ষেত্রে তাকলীদ জায়েয (অনুমতিপ্রাপ্ত) নেই, সেহেতু কেয়ামত দিবসে এই (অবিশ্বাসের) ক্ষেত্রে অনুসরণকারীদের কাছ থেকে তাদের নেতারা পালিয়ে যাবে। অপর দিকে, যেহেতু এবাদতের ক্ষেত্রে তাকলীদ করা আল্লাহতা'লার আজ্ঞারই একটি শর্ত, সেহেতু যাঁরা শেখাবেন এবং যাঁরা শিখবেন উভয়েই বেহেশতে প্রবেশ করবেন।

মুসলমান সমাজ কতিপয় (আলেম) ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসেবে বিবেচনা করেছেন এবং আল-কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন বলে ধর্ম সংস্কারক যে অভিযোগ উত্থাপন করেছে, তা অত্যন্ত নিচ ও বিরক্তিকর এবং হেয় প্রতিপন্নকারীও। এ বক্তব্য দ্বারা বোঝানো হয়েছে মুসলমানগণ অবিশ্বাসী।

যেহেতু তার এই ভাষ্য মিথ্যে ও কুৎসামূলক এবং যেহেতু সে মুসলমানদেরকে কাফের (অবিশ্বাসী) বলেছে, সেহেতু সে নিজেই (হাদীস মোতাবেক) অবিশ্বাসীতে পরিণত হয়েছে।

মুসলমানগণ খোদ (স্বয়ং) আইম্মা-এ-মযাহিবকে অনুসরণ করেন না। আল্লাহতা'লা ও তাঁর রাসূল (দ:) কুরআন-হাদীসে কী বুঝিয়েছেন, তা মযহাবের ইমামবৃন্দের কাছ থেকে শিখে তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (দ:)-এর আদেশ-নিষেধই মান্য করে থাকেন। মুজতাহিদমণ্ডলী একেকজন হলেন মাধ্যম, সঞ্চারক-বিশেষ। আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান, **"ওয়াবতাগূ ইলাইহিল ওয়াসীলাহ"**, মানে **"আমার নৈকট্য লাভের জন্যে ওসীলার অন্বেষণ করো।"** আল্লাহতা'লার এই আদেশটি অনুসরণ করেই মুসলমানবৃন্দ আইম্মা-এ-মযাহিবকে ওসীলা করে থাকেন। তাঁদেরকে অনুসরণের মানে এই নয় যে তাঁদের ব্যক্তিগত আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করা হচ্ছে, বরং এর মানে হলো তাঁরা কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফ থেকে যা জানিয়েছেন, তারই অনুসরণ-অনুগমন।

চার মযহাবের মধ্যে যে মতপার্থক্যের বিষয়গুলো বিদ্যমান, তা কীভাবে বাদ দেয়া যায়? এটি একেবারেই অসম্ভব। কোনো বিষয়ে চার মযহাবের নেয়া সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে কোনোটি না কোনোটিতে অবশ্যই আল্লাহর আদেশ প্রতিফলিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, হানাফী মযহাব অনুযায়ী রক্তক্ষরণ দ্বারা ওযূ ভঙ্গ হয়, কিন্তু শাফেঈ মযহাব মোতাবেক তা হয় না। নিশ্চয় এ দু'টি বিধানের কোনো একটিকেই আল্লাহ বুঝিয়েছিলেন। আমাদেরকে এগুলোর একটিকেই সর্বদা অনুসরণ করতে হবে এবং বলতে হবে যে এটি-ই মহান প্রভু উদ্দেশ্য করেছেন। আল্লাহতা'লা যা বুঝিয়েছেন তা যে ব্যক্তি পালন করেন, তিনি-ই সঠিক পথ প্রাপ্ত হন এবং সওয়াব অর্জন করেন। মহানবী (দ:) এরশাদ ফরমান, যে মুজতাহিদ আল্লাহর উদ্দেশ্যকৃত অর্থ বুঝতে অক্ষম হন, তাঁকেও সওয়াব দেয়া হয়। আমাদের রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর হায়াতে জিন্দেগীর সময়কালেও এজতেহাদের এ রকম অনেক বিষয় উদ্ভূত হয়েছিল। তিনি অনেক আহাদীসে তাই ঘোষণা করেছিলেন, যে মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি, তাঁকেও পুরস্কৃত করা (মানে সওয়াব দেয়া) হয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই সওয়াব কেবল মুজতাহিদবৃন্দের জন্যেই বরাদ্দ রাখা হয়েছে। রশীদ রেযা কর্তৃক ওপরে উদ্ধৃত সূরা নহলের আয়াতটি (**'তোমরা না জানলে তাঁদের জিজ্ঞেস করো, যাঁরা জানেন')** অনুযায়ী মুজতাহিদবৃন্দকে যাঁরা অনুসরণ করেন, তাঁরাও ওই পরিমাণ সওয়াব পান। মুজতাহিদদের অনুসরণ পরিত্যাগকারী ধর্ম সংস্কারকরা এই সওয়াবের ভাগিদার হয় না। বস্তুতঃ তারা আল্লাহর আদেশেরই অমান্যকারী বলে সাব্যস্ত হয়। তাই তারা জাহান্নামে যাবে। আমাদের এ কথার সমর্থন দেয় নিম্নবর্ণিত হাদীস শরীফ, যা'তে বিবৃত হয়েছে: "**বেদআতীর কোনো এবাদত-বন্দেগী বা আমল-ই গৃহীত হবে না।**"

উসূলে ফিকাহ'র কতিপয় আলেম বলেন, "কোনো মুজতাহিদের অনুসরণের জন্যে প্রয়োজনীয় হলো তাঁর জ্ঞানের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন। **'যাঁরা জানেন তাঁদের জিজ্ঞেস করো'** – আয়াতটি এই বিষয়টি পরিস্ফুট করে। যে ব্যক্তি একটি আমলের ক্ষেত্রে কোনো একজন মুজতাহিদকে অনুসরণ করে এবং আরেকটি আমলের বেলায় অপর কোনো মুজতাহিদের অনুসরণ করে, সে প্রকৃতপ্রস্তাবে পূর্ববর্তী মুজতাহিদকে বিশ্বাস-ই করে নি, তাঁর প্রতি আস্থাও রাখে নি। পূর্ববর্তী বিষয়েও তার আমল (অনুশীলন) কবুল তথা গৃহীত হবে না। যদি সে উভয় মুজতাহিদকে বিশ্বাস করার এবং তাঁদের প্রতি আস্থা রাখার দাবিও করে, তবুও তার কথা

বিশ্বাসযোগ্য নয়" [৪২ নং অনুচ্ছেদে '**আল-মিযান আল-কুবরা**' গ্রন্থের উদ্‌ধৃতি দেখুন]। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমনটি হয়েছে, তেমনি এখানেও রশীদ রেযার আচরণ তার নিজের কথার পরিপন্থী বলে প্রতীয়মান হয়েছে। কবি কী সুন্দর বলেছেন:

"কর্ম মানুষের (অন্তরের) আয়না,

কথা ধর্তব্য না,

কর্ম-ই দেয় তার মনের চেহারার বর্ণনা।"

৩১/ – ধর্ম সংস্কারক ইমাম গাযযালী (রহ:) ও বাতেনীয়্যা সম্প্রদায়ের জনৈক খামখেয়ালিমূলক আচরণকারী সদস্যের মধ্যকার কথাবার্তা উদ্ধৃত করে। ইমাম সাহেব (রহ:)-এর নিজস্ব বলে বর্ণিত বক্তব্য সে তুলে ধরে: "আমি (ইমাম সাহেব) যে ব্যক্তিকে উপদেশ দেবো তার উচিত নয় কোনো গোমরাহ দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, কিংবা এখতেলাফী তথা মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়ে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা। এবাদতের ক্ষেত্রে সেই সব বিষয়েই সম্পৃক্ত হও, যেগুলোর ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মতপার্থক্যের বিষয়গুলোতে জড়াবে না; এ রকম কোনো বিষয়ে একান্ত জড়িয়েই গেলে সুবিবেচনাপূর্ণ সমাধানে পৌঁছুবে! যে সকল উলেমা এটিকে ফরয বলেন নি, তাঁরা মোস্তাহাব বলেছেন। বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নেয়া যখন কষ্টসাধ্য হয়, তখন তুমি নিজে এজতেহাদ প্রয়োগ করো; অর্থাৎ, সেই মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজটি করো, যাঁকে তুমি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করো। তুমি যে আলেমকে সেরা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী মনে করো, তাঁরই অনুসরণ করো। যদি ওই মহান ইসলামী জ্ঞান বিশারদ নিজ দৃষ্টিকোণ ও এজতেহাদ বা সিদ্ধান্তে সঠিক পথপ্রাপ্ত হন, তবে তাঁর জন্যে থাকবে দু'টি পুরস্কার, অর্থাৎ, দু'টি সওয়াব। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ (দ:) এরশাদ ফরমান, এজতেহাদ প্রয়োগকারী কোনো মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে দু'টি সওয়াব তথা পুরস্কার অর্জন করবেন; আর তিনি ভুল করলে সওয়াব পাবেন একটি। আল্লাহতা'লা এই কাজের দায়িত্বভার ন্যস্ত করেছেন এজতেহাদ প্রয়োগে সক্ষম মুজতাহিদদের কাঁধে। সূরা নিসার ৮৩ নং আয়াত ঘোষণা করে, **"আর যদি সেক্ষেত্রে (তারা) সেটি (প্রচার না করে) রসূল (দ:) ও নিজেদের উলূল আমর তথা ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের গোচরে আনতো, তবে নিশ্চয় তাঁদের কাছে সেটির বাস্তবতা সম্পর্কে জানতে পারতো, যাঁরা পরবর্তী পর্যায়ে (তথ্য অনুসন্ধানের জন্যে) প্রচেষ্টা চালান।"** মহানবী (দ:) একটি হাদীস শরীফে হযরত মু'য়ায (রা:)-এর কাছে ব্যাখ্যা করেন যে তিনি এজতেহাদ প্রয়োগে সক্ষম উলেমাবৃন্দের এজতেহাদকে অনুমোদন ও পছন্দ করেন। "কুরআন বা সুন্নাহ'তে সমাধান খুঁজে না পেলে আমি আমার এজতেহাদ তথা গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত দ্বারা সমাধান করবো", হযরত মু'য়ায ইবনে জাবাল (রা:)-এর এই কথাটি মহানবী (দ:)-এর উপস্থিতিতেই বলা হয়েছিল এবং তিনি এজতেহাদকে আদেশ করেন ও এর অনুমতিও দেন। সঠিক পথপ্রাপ্ত ও ভুল এজতেহাদ প্রয়োগকারী উভয় মুজতাহিদকেই এবং তাঁদের উভয়ের অনুসারীদেরও ক্ষমা করা হবে। মুজতাহিদদের কেউ কেউ সঠিক পথ পেয়ে গিয়েছেন, অর্থাৎ, খোদাতা'লার উদ্দেশ্যকৃত অর্থ বের করতে সক্ষম হয়েছেন; আর অপর দিকে অন্যান্যরা দুইটি সওয়াবের মধ্যে একটি অর্জন করতে পেরেছেন। যেহেতু তাঁরা কে সঠিক, কে ভুল তা অজ্ঞাত, সেহেতু তাঁরা একগুঁয়ে নন এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি ধর্মীয় উগ্রতাজনিত বিদ্বেষভাবাপন্নও নন। শুধু পার্থক্য এই, তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেকে সঠিক পথপ্রাপ্ত মনে করেন। আমি স্বীকার করি, নিজ মতামত ও

কেয়াস দ্বারা আইন-কানুন বের করা প্রত্যেকের জন্যে ঠিক নয়। তুমি অন্ধভাবে যে বাতেনী মতবাদ ধারণ করেছ, তা পরিত্যাগ করলে আমি তোমোকে কুরআন মজীদের অন্তর্নিহিত জ্ঞান শিক্ষা দেবাে। তুমি কোনটি বেছে নেবে, আমার কাছ থেকে শেখা, না তোমার বাতেনী সঙ্গিদের কাছ থেকে?" [রশীদ রেযা কৃত 'মুহাওয়ারাত']

রশীদ রেযা এরপর ধর্মপ্রচারকের কথা উদ্‌ধৃত করে, যিনি ওপরের কথা শোনার পরে বলেন, "এক্ষণে আমরা দেখতে পেলাম যে ইমাম গাযযালী (রহ:)-ও তাকলীদকে স্বীকার করেন এবং সকল মানুষের জন্যে এটিকে আবশ্যক বিবেচনা করেন।" ['মুহাওয়ারাত']
ধর্ম সংস্কারকের বর্ণিত ইমাম গাযযালী (রহ:)-এর ওপরের বক্তব্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে উলামা-এ-আহল-এ-সুন্নাত এবং আইম্মা-এ-মযাহিব (রহ:) যা সর্বসম্মতভাবে জানিয়েছিলেন, তার সাথে তিনি একমত। আহলে সুন্নাহ'র এই মহান ইমামের ওপরে উদ্‌ধৃত কথাকে ব্যাখ্যা করার আর কোনো দরকার-ই নেই। হযরত ইমাম সাহেব (রহ:) যা বলেছেন, তা আমাদের দ্বীনী ভাইদের কাছে প্রকাশ করা আমাদেরও উদ্দেশ্য বটে। ইমাম গাযযালী (রহ:)-এর এই বক্তব্য ধর্ম সংস্কারকের দাবিকে সমূলে উৎপাটিত করে। তাতে আরও প্রতীয়মান হয় যে তাকলীদ (অনুসরণ) দ্বীন ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

৩২/ – ধর্ম সংস্কারক নবম সংলাপে লিখে: "মুসলমানবৃন্দ ফিতনার অন্ধকার, যে কারণ এবং ব্যাধির জীবাণু দ্বারা তাঁরা আক্রান্ত, তা থেকে তাঁরা কীভাবে মুক্ত হতে পারেন সেই বিষয়ে আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি ইতোমধ্যেই ব্যাখ্যা করেছি। আমার অভিমত মহান ইসলামী জ্ঞান বিশারদ ইমাম গাযযালী (রহ:)-এর সাথে মিলে যায়। তিনি বলেছেন মুসলমানগণ এ যাবত যা কিছুতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন তার পাশাপাশি শুধু কুরআন মজীদকে অনুসরণ করলেই যথেষ্ট হবে। ইসলাম ধর্মের ক্ষতি করছে যে জিনিসটি, তা হচ্ছে মুসলমানদের বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হওয়া এবং প্রতিটি দলের অনুসারীদের দ্বারা কেবল নিজেদের পছন্দকৃত ইমামের ও তাঁর অনুসারী উলেমাবৃন্দেরই অনুসরণ-অনুগমন করা; আর অন্যান্য মুজতাহিদমণ্ডলীর অনুসারীদের প্রতি ধর্মীয় গোঁড়ামিজনিত বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হওয়াও। এই দল-উপদলের বিভক্তি শেষমেশ কুরআন ও সুন্নাহ ত্যাগ করার পর্যায়ে তাঁদেরকে পৌঁছে দিতে পারে। আমি এ সব বিষয়ে আরও বেশি সুবিধাগুলো তুলে ধরেছি। আমি দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তার পছন্দকৃত মতটি বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দিয়েছি; তবে শর্ত থাকবে এই যে, তিনি নিজ নফসানীয়াত (কুপ্রবৃত্তি)-কে অনুসরণ করতে পারবেন না এবং যথাসাধ্য সতর্ক হবেন। কিন্তু ইমাম গাযযালী (রহ:) এই সব বিষয় সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগের অনুমতি দিয়েও যারা ধর্ম অনুশীলন করতে আগ্রহী তাদের কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রটি সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে এজতেহাদ প্রয়োগে প্রায় বাধ্য করেছেন।" ['মুহাওয়ারাত']
ধর্ম সংস্কারকের সবচেয়ে বড় ভুল হচ্ছে সে এ'তেকাদ তথা আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিভক্তির সাথে আহল আস্ সুন্নাহ (সুন্নী মুসলমান সমাজ)-এর বিভিন্ন মযহাবে বিভক্ত হওয়ার বিষয়টিকে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। সে বেদআতী দল-উপদলগুলোর মতো চার মযহাবেরও বদনাম করছে এবং মুসলমানদেরকে দোষারোপ করছে এই মর্মে যে তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহ'র সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। এ'তেকাদ বিষয়ে বিচ্যুত বাহাত্তরটি ভ্রান্ত ফেরকাহ (দল) অবশ্যই গোমরাহ (পথভ্রষ্ট)। একটি হাদীসে বিবৃত হয়েছে তারা সবাই জাহান্নামী হবে। কিন্তু সুন্নী জামাআতের আইম্মা-এ-মযাহিব (চার মযহাবের ইমামবৃন্দ), যাঁদেরকে হাদীস শরীফে প্রশংসা করা হয়েছে এবং যাঁরা রাসূলুল্লাহ (দ:)-কে অনুসরণের কারণে আল্লাহতা'লার ভালোবাসা ও অনুমোদন

পেয়েছেন, তাঁদেরকে এই ধর্ম সংস্কারক রশীদ রেযার হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা ইসলামের প্রতি বৈরিতা ছাড়া আর কী হতে পারে? ধর্মীয় পদে অধিষ্ঠিত ইসলামের এ ধরনের শত্রুদের বলা হয় **যিনদিক্ক**। আমাদের ধর্ম ঘোষণা করে যে যিনদিক্ক ও মোনাফেক্ক চক্র আহলে কেতাব (ঐশীগ্রন্থ-সম্পন্ন ইহুদী-খৃষ্টান) বা ঐশীগ্রন্থবিহীন অ-মুসলমানদের চেয়ে বৈরি-ভাবাপন্ন ও ক্ষতিকর। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উদ্‌ধৃত ইমাম গাযযালী (রহ:)-এর বক্তব্যকে বিকৃত করে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী উপস্থাপনের জন্যে ধর্ম সংস্কারক রশীদ রেযা মোটেও লজ্জিত নয়। হযরত ইমাম সাহেব (রহ:)-এর মতো নিজেকে একজন মুজতাহিদ ও আলেম মনে করে সে দ্বীন ইসলামকে তার যেমন খুশি তেমনিভাবে পরিচালনা করার অপপ্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু সে ওয়াকেফহাল নয় যে তার দোষারোপকৃত বাহাত্তরটি ভ্রান্ত দলের আচরণের চেয়ে তার এই আহাম্মকিপূর্ণ আচরণটি আরও জঘন্য।

৩৩/ – ধর্ম সংস্কারক আইম্মা-এ-মযাহিবের ঐকমত্যেরও বিরোধিতা করে বলে: “মযহাবগুলোর তালফিক (একত্রিকরণ, মিশ্রণ) ভ্রান্তি মর্মে গৃহীত কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এজমা’ তথা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে যে দাবি করা হয়, তা মেনে নেয়া অসম্ভব। এই বিষয়ে বিভিন্ন মত বিদ্যমান। ‘**দুররুল মোখতার**’ গ্রন্থপ্রণেতা কীভাবে এ কথা দাবি করতে পারলেন, যেটি তাঁর নিজের মযহাবের কোনো ইমাম-ই দাবি করেন নি; আর তাও আবার এই বাস্তবতার আলোকে যে তাঁর নিজের মযহাব-ই তিনজন ইমামের এজতেহাদের মিশ্রণের ফসল! উপরন্তু, আমরা ইবনে হুমাম থেকে জানতে পেরেছি যে হানাফীরা তালফিক স্বীকার করেননি মর্মে দাবিটি অসত্য। এ ছাড়াও বেশ কিছু ফতোয়া একাধিক মযহাবের মতৈক্যের ভিত্তিতে জারি করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধ একটি হলো ‘নিজের অস্থাবর সম্পত্তি/সম্পদ নিজেকে দান করা’, যেটি অনুমতিপ্রাপ্ত বিষয় বলে বিবেচিত হয়েছিল ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ:) ও ইমাম মোহাম্মদ শায়বানী (রহ:)-এর এজতেহাদগুলোর একত্রিকরণ দ্বারা। ইবনে আবেদীন শামী (রহ:) যে বলেছিলেন একই মযহাবের অন্তর্গত উলেমাবৃন্দের এজতেহাদের একত্রিকরণ তালফিক নয়, তা এর বিপরীতমুখি বা পরিপন্থী একটি ধারণা, যা কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি বলতে পারেন না। কেউই, এমন কি কোনো মুকাল্লিদ-ও, এই দু’টি পরস্পরবিরোধী মতকে একই সময়ে মেনে নেবেন না। আমিও এই বাস্তবতা স্বীকার করি যে ফেকাহ’র পুস্তক রচয়িতাগণ নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো কিছু বলতে পারেন না, যেহেতু একজন মুকাল্লিদের পক্ষে নিজস্ব রায় বা মতামত ব্যক্ত করার মতো জ্ঞান তাঁর কাছে নেই। তাঁর যা করণীয়, তা হলো অন্য কারো কথা (মানুষের কাছে) পৌঁছে দেয়া। বস্তুতঃ তিনি (ইবনে আবেদীন) এ কথা আল্লামা কাসিমের কাছ থেকে গ্রহণ করে প্রচার করেন, যিনি ‘**তাওফিক আল-হুককাম**’ শীর্ষক গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করেছিলেন। এই বিষয়ে মতপার্থক্য এবং বিভিন্ন মত থাকার ব্যাপারে না জেনে কেউ একজন বল্লো এই বিষয়ে এজমা’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর অমনি দেখা যায় অন্যান্যরা তা প্রচার আরম্ভ করে দিলো! সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে সর্বদা সত্য থাকবে এ রকম ধারণা করা একেবারেই ভুল। সূরা ইউসূফে ঘোষিত হয়েছে, **’আপনি যতোই সর্বান্তকরণে চান না কেন, অধিকাংশ মানুষ তবু আপনাকে বিশ্বাস করবে না’।**” [’মুহাওয়ারাত’]

এই উদ্‌ধৃতিতে ধর্ম সংস্কারক স্পষ্টভাবে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং এও ব্যক্ত করেছে সে আহল্ আস্ সুন্নাহ’র একজন শত্রু। হানাফী মযহাব তিনজন ইমামের এজতেহাদের মিশ্রণের ফসল মর্মে তার বক্তব্য পরিস্ফুট করে সে এলম আল-উসূল আল-ফেকাহ’র জ্ঞানে নিরেট মূর্খ। তার অদূরদৃষ্টি দ্বারা যে দলিলাদিকে প্রমাণ মনে করে সে পেশ করেছে, তা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। আমরা সংক্ষেপে বলবো, হানাফী মযহাবের উসূল (পদ্ধতি) ও নীতিমালা (কাওয়াঈদ) ইমাম আল-

আযম হযরত আবূ হানিফা (রহ:) প্রতিষ্ঠা করেন। ইমাম আবূ ইউসূফ (বেসাল: ১৮২ হিজরী/৭৯৮ খৃষ্টাব্দ) ও ইমাম মোহাম্মদ শায়বানী (বেসাল: ১৮৯ হিজরী/৮০৪ খৃষ্টাব্দ) উভয়-ই ইমামুল আযমের শিষ্য ছিলেন। তাঁর শত শত অন্যান্য শিষ্যদের মতোই অনেক বছর যাবত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে তিনি এই দু'জনকে এজতেহাদের ক্ষমতাসম্পন্ন মুজতাহিদের পর্যায়ে উন্নীত করেন। তাঁরা ও তাঁদের বন্ধু অন্যান্য আরও অনেক মুজতাহিদ ইমামুল আযম থেকে যা শিখেছিলেন, তা তাঁরই শেখানো পদ্ধতি ও নীতিমালার মাপকাঠিতে তাঁরা পরিমাপ করেন এবং তাঁদের মোকাবেলাকৃত নতুন নতুন বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে একে অপরের থেকে ভিন্ন ভিন্ন ফতোওয়া দেন। যেহেতু এই দু'জন ইমামের ফতোওয়াগুলো হানাফী মযহাবে সংমিশ্রণ বা একত্রিত করা হয় নি, সেহেতু এঁদের মধ্যে তালফিকের প্রশ্নই ওঠে না। হানাফী মযহাবে ইমামুল আযম (রহ:)-এর কথানুযায়ী অনুশীলন করতে হবে। যে সব বিষয়ে তাঁর কোনো সিদ্ধান্ত (এজতেহাদ) নেই, সেক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ:)-এর কথানুযায়ী আমল করতে হবে। যদি এটিও না পাওয়া যায়, তবে ইমাম মোহাম্মদ শায়বানী (রহ:)-এর কথানুযায়ী অনুশীলন করতে হবে। একান্ত জরুরাত বা প্রয়োজনের সময়ই কেবল এই ধারাবাহিকতার পরিবর্তন সাধন বা দু'টোর সংমিশ্রণ করার অনুমতি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ঈদুল আযহা (কোরবানি ঈদ)-তে ছাগল-ভেড়া কোরবানি দেয়ার সামর্থ্যের ব্যাপারে ইমাম মোহাম্মদ শায়বানী (রহ:)-এর মতে যে ব্যক্তি তার আয়কৃত ভাড়ার টাকায় নিজের চাহিদা ও ঋণ মেটাতে অক্ষম, সে গরিব পর্যায়ভুক্ত। অপর দিকে, শায়খাইন (ইমামুল আযম ও ইমাম আবূ ইউসূফ) ওই ব্যক্তিকে ধনী বিবেচনা করেছেন। এ ধরনের কোনো ব্যক্তি কোরবানি না করলে বা ফিতরা না দিলে ইমাম মোহাম্মদ (রহ:)-এর দৃষ্টিতে সে গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে। সে যদি ফিতরা দেয় এবং ভেড়া কোরবানি করে, তবে শায়খাইনের দৃষ্টিতে সে একটি ওয়াজিবের সওয়াব পাবে। কারো জন্যে ওয়াজিব নয় এমন কোনো আমল যদি সে পালন করে, তাহলে সে নাফিলা (অতিরিক্ত) এবাদতের সওয়াব পাবে মাত্র; কিন্তু ওয়াজিবের সওয়াব পাবে না। ওয়াজিবের সওয়াব এর চেয়ে অনেক বেশি। অতএব, পরিদৃষ্ট হচ্ছে যে এজতেহাদের পার্থক্য মুসলমানদের প্রতি আল্লাহতা'লার এক খাস্ রহমত। কোনো মযহাবের অন্তর্গত ইমামদের এজহোদগুলোকে একত্রিত করা তালফিক নয়। এতে প্রতীয়মান হয় না যে তালফিক অনুমতিপ্রাপ্ত। **তালফিক** হলো চার মযহাবের মধ্যে দুই বা ততোধিক মযহাবের একত্রিকরণ। অধিকন্তু, ইবনে হুমামের যে উদ্‌ধৃতি রশীদ রেযা দিয়েছে, তাও অসত্য। কেননা, ইবনে হুমাম তাঁর **'তাহরির'** বইতে লিখেছেন: "অন্য কোনো মযহাবের অনুসরণের সময় কারো এমন কোনো কাজ করা উচিত নয়, যা তার অনুসৃত উভয় মযহাবের যে কোনোটির দৃষ্টিতে ভ্রান্তি। শাফেঈ মযহাবের অনুসরণে কোনো ব্যক্তি ওযূ করার সময় যদি নিজ হাতে তার হাত-পা মসেহ না করে, আর যদি সে এই অবস্থায় কোনো মহিলাকে (হাত দ্বারা) স্পর্শ করে (যাকে ইসলামী নেকাহ প্রথায় সে বিয়ে করতে পারে) এই কথা ভেবে যে মালেকী মযহাব অনুযায়ী তার ওযূ এই স্পর্শ দ্বারা ভাঙ্গবে না, তাহলে এই ওযূ দ্বারা সে যে নামায পড়বে তা উভয় মযহাবেই বাতেল (অসিদ্ধ) বলে গণ্য হবে।" ইবনে হুমামের এই কথাকে মযহাবগুলোর তালফিকের অনুমতি না থাকার পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছে **'খুলাসাতুত্ তাহকীক'** পুস্তকটি। ধর্মীয় পদে সমাসীন ইসলামের শত্রু এই লোকটি (রশীদ রেযা) মুসলমানদেরকে ধোকা দেয়ার জন্যে ইবনে হুমামের কথাকে বিকৃত করেছে এবং এই মহান ইমামের জঘন্য কুৎসা রটনা করেছে। উপরন্তু, ইবনে হুমামের শিষ্য শায়খ কাসেম-ই লিখেছিলেন যে তালফিক গ্রহণযোগ্য নয় এবং এ ব্যাপারে এজমা'-ও রয়েছে। শায়খ কাসেম তাঁর ওস্তাদ ইবনে হুমামের কাছ থেকে জেনে এই এজমা' সম্পর্কে নিজ '**আত্ তাস'হিহ**' গ্রন্থে লিখেছিলেন। এটি '**আল-কুদুরী**' পুস্তকের একখানি ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ।

'**আদ্ দুরার**' গ্রন্থে এ কথাও লেখা হয়েছে যে কোনো হানাফী মুফতী কর্তৃক ইমাম আবূ ইউসূফ

(রহ:) বা ইমাম মোহাম্মদ শায়বানী (রহ:)-এর এজতেহাদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ফতোওয়া জারি করা হানাফী মযহাবের পরিপন্থী হবে না। কেননা, উভয় ইমাম-ই জানিয়েছিলেন যে ইমামুল আযম (রহ:)-এর সাথে ভিন্নমত পোষণকারী তাঁদের প্রত্যেকটি এজতেহাদ ছিল ইমামুল আযম (রহ:) থেকে শ্রুত কোনো না কোনো বর্ণনার ভিত্তিতে। এই কারণেই ইবনে আবেদীন শামী (রহ:) **'ওয়াকফ আল-মানক্কুল'** গ্রন্থের পার্শ্বটীকায় লিখেন: "ইমাম তরতুসী (রহ:) কৃত 'নাফ' আল-ওয়াসাঈল' ও আল্লামা ইবনে শালবী (রহ:)-এর বিভিন্ন ফতোওয়ায় বিদ্যমান সমস্যা দূর করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে '**নিজেকে**' কোনো সম্পদ/সম্পত্তি দান করা ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ:)-এর মতে অনুমতিপ্রাপ্ত, আর ইমাম মোহাম্মদ শায়বানী (রহ:)-এর মতে এর অনুমতি নেই। পক্ষান্তরে, '**অস্থাবর সম্পত্তি**' দানের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ:)-এর মতে এর অনুমতি নেই, কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ শায়বানী (রহ:)-এর দৃষ্টিতে তা অনুমতিপ্রাপ্ত। যেহেতু কোনো ব্যক্তি কর্তৃক **'নিজেকে' 'অস্থাবর সম্পত্তি'** দানের অনুমতি আছে মর্মে দু'জন ইমাম-ই অভিমত ব্যক্ত করেন নি, সেহেতু তাঁদের দু'জনেরই এজতেহাদগুলোকে একত্রিত করে ফতোওয়া জারি করা হয় যে এটিরও অনুমতি রয়েছে। আর এই বিষয়টির প্রসঙ্গেই আত্ তরতুসী (রহ:) নিজ '**মুনইয়াত আল-মুফতী**' পুস্তকে লেখেন: 'হুকমু মুলাফফাক জায়েযুন্' [অর্থাৎ, সংমিশ্রণকারীর সিদ্ধান্ত ন্যায্য, যা দ্বারা বোঝায় '(একই মযহাবের অন্তর্গত মুজতাহিদদের) এজতেহাদগুলোর একত্রিকরণ অনুমতিপ্রাপ্ত']। অধিকন্তু, যেটি সর্বসম্মতভাবে নিষেধ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে মযহাবগুলোর সংমিশ্রণ। আমি (ইবনে আবেদীন) আমার '**আল-উকূদ আদ্ দুররিয়া ফী তানকিহীল হামিদিয়্যা**' গ্রন্থে এ বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি।" উপরন্তু, অর্থকড়ি দান সংক্রান্ত ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ:) ও ইমাম মোহাম্মদ শায়বানী (রহ:)-এর এজতেহাদগুলোর একত্রিকরণ এটি প্রমাণ করে না যে বিভিন্ন মযহাবের তালফিক (সংমিশ্রণ) অনুমতিপ্রাপ্ত, কারণ উভয় ইমাম-ই হানাফী মযহাবের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর ভয় অন্তরে না রেখে ফেকাহ'র বইপত্রে প্রদত্ত এ সব স্পষ্ট বক্তব্য নির্লজ্জভাবে বিকৃত করে ধর্ম সংস্কারক (রশীদ রেযা) একদিকে তরুণ প্রজন্মকে ধোকা দিতে অপতৎপর, অপরদিকে 'দুররুল মোখতার', 'রাদ্দুল মোহতার' ইত্যাদির মতো সবচেয়ে মূল্যবান ফেকাহ'র কেতাবগুলোকে হেয় প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট; আর এর দ্বারা সে আহল আস্ সুন্নাহ'কে ভেতর থেকে ধ্বংস করারই অপপ্রয়াস পেয়েছে। এই হীন চক্রান্ত পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করে রশীদ রেযা কোনো ধর্মীয় কর্তত্বশীল ব্যক্তি নয়, বরং ধর্মীয় পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির ছদ্মবেশে ইসলামেরই এক শত্রু, মানে **যিনদিক্ক**।

ফেকাহবিদ উলেমাবৃন্দ ইসলামী আইন-কানুন বিষয়ে তাঁদের নিজস্ব মতামত বা বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী ব্যাখ্যা না দিয়ে সাহাবা-এ-কেরাম (দ:)-এর কাছ থেকে আগত জ্ঞান বিচ্ছুরণ করার কারণে ধর্ম সংস্কারক এতো নিচে নেমেছে যে সে 'উলামা'মণ্ডলীকে গণ্ডমূর্খ হিসেবে কলঙ্কচিহ্নিত করতেও কুণ্ঠিত হয় নি। কিন্তু গণ্ডমূর্খ তো হলো এ সব ধর্ম সংস্কারকরা-ই, যারা এই জ্ঞান সম্পর্কে কিছুই জানে না, বা এগুলো কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে তাও জানে না, আর এও জানে না কারা মিথ্যেবাদী। তারা একেবারেই মূর্খ। তাদের এই অজ্ঞতা, যেটি কোনো অজ্ঞ ব্যক্তির নিজ অজ্ঞতা সম্পর্কে অনবধান থাকার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, সেটির কারণে তারা ভাবে যে তারা বেশ কিছু জানে এবং তাই জ্ঞানের নামে নিজেদের মিথ্যে ও ভুল কথাবার্তাকে নির্লজ্জভাবে তারা প্রচার-প্রসার করে থাকে। সহীহ মুসলিম শরীফে লিপিবদ্ধ একটি হাদীসে মহানবী (দ:) এরশাদ ফরমান: **"আল-হায়াউ মিনাল ঈমান" (হায়া-শরম ঈমানের শাখাবিশেষ)**। এতে পরিস্ফুট হয় যে ইসলামের শত্রুদের কোনো লাজ-লজ্জার অনুভূতি-ই নেই। ফেকাহবিদ উলেমাবৃন্দ যে সব বিষয়ে এজমা' হয়েছিল সেগুলোর পাশাপাশি যেগুলোতে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেগুলোও লিপিবদ্ধ করেন।

যাঁরা ফেকাহ-শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান রাখেন, তাঁরা এগুলোর মধ্যকার একে অপরের পার্থক্য নির্ণয় করবেন। মূর্খ ধর্ম সংস্কারকরা মনে করে যে ফেকাহবিদ উলেমাবৃন্দ বুঝি তাদের মতোই কেউ। এই সকল যিনদিকের ভেতরকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভালভাবে ফুটিয়ে তুলেছে নিম্নের আরবী প্রবাদটি যা বিবৃত করে: "আল-কালামু সিফাত আল-মুতাকাল্লিম", মানে 'কোন্ ব্যক্তি কী রকম, তার কথাই তা ব্যক্ত করে।'

রশীদ রেযার মতে, ফেকাহবিদ উলেমাবৃন্দ ইসলামী বিষয়গুলো সম্পর্কে না জেনেই বুঝি বলে এসেছেন এগুলোর ব্যাপারে এজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার কাছে এই মহান ধর্ম বিগত শতাব্দীগুলোতে অজ্ঞ-মূর্খদের হাতে খেলার কোনো বস্তু ছিল, আর এখন এই যিনদিকেরা ইসলামকে ওর কক্ষপথে ফিরিয়ে নেবে। সেও স্বীকার করেছে, 'উলামা-এ-কেরাম'-এর ঐকমত্যকে অস্বীকারকারী কাফের তথা অবিশ্বাসীতে পরিণত হয়। এজমা' সম্পর্কে উলেমাবৃন্দ যদি না জানতেন, বা খুঁজে বের না করতেন, তাহলে সে কখন তা নিজে খুঁজে পেতো? তাকে দেখে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই, কেননা প্রবাদ আছে: "আল-জাহিলু জাসুরুন", মানে 'অজ্ঞ লোক-ই দুঃসাহস দেখায়।' সে যা বানিয়ে নিয়েছে, তা-ই সে সবসময় বলে চলেছে। এর চেয়ে আর কী-ই বা সহজতর হবে, যখন এই বইটির ('মুহাওয়ারাত') মতো মিথ্যে ও কুৎসায় ভরা শত শত বই লেখা তার জন্যে অতি তুচ্ছ একখানা ব্যাপার। আমাদের মহানবী (দ:), যাঁর প্রতিটি কথা জ্ঞান-প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ, তিনি একটি হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, **"প্রলয় দিবস ঘনিয়ে এলে ধর্মীয় পদে অধিষ্ঠিত লোকেরা গাধার পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত গোস্তের চেয়েও পচা হবে।"** হাদীস শরীফের এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরে তাদের পচা দুর্গন্ধযুক্ত অস্তিত্বের আর তালাশ করার কোনো প্রয়োজন-ই নেই; কেননা তারা (জনসমক্ষে) নিজেদের তুলে ধরেছে। তাদের বিষাক্ত, পীড়াদায়ক দুর্গন্ধ মিসর হতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ পাক আমাদের ধর্মীয় কর্তৃত্বসম্পন্ন তরুণ প্রজন্মকে এই সংক্রামক ব্যাধি থেকে রক্ষা করুন! তিনি যেন হালে গজিয়ে ওঠা হীন প্রকৃতির এই সব লোকের বদকর্মের ক্ষতি থেকে আমাদের রক্ষা করেন! আর রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর পথে পরিচালনাকারী ও তাঁর-ই ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী) আহল্ আস্ সুন্নাহ'র উলামা-এ-কেরামের সঠিক রাস্তা থেকে আল্লাহতা'লা যেন আমাদের বিচ্যুত না করেন! যদি আল্লাহতা'লার ওই সকল আর্শীবাদধন্য আলেম-উলেমা ফেকাহ ও এলম আল-হাল কেতাব না লিখতেন, তাহলে এই নিচু প্রকৃতির গজিয়ে ওঠা যিনদিকদের মিথ্যে কথায় বিশ্বাস করে তাদের কূটচালে আমরা বিনাশ হয়ে যেতাম। আহল্ আস্ সুন্নাহ'র উলেমাবৃন্দের রূহের প্রতি সহস্র সহস্র সালাম ও দোয়া পেশ করি, যাঁরা আমাদেরকে অবিশ্বাস ও বেদআত থেকে রক্ষা করেছেন।

সত্য সর্বদা সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে নাও থাকতে পারে, এ কথাটি বলে রশীদ রেযা নিম্নের হাদীস শরীফটি অস্বীকার করেছে; হুযূর পূর নূর (দ:) এরশাদ ফরমান: "**আমার উম্মত কখনো গোমরাহীতে ঐকমত্য পোষণ করবে না।**" আহল্ আস্ সুন্নাহ'র উলেমাবৃন্দ এজমা' ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে আঁকড়ে ধরেছিলেন, কারণ তা মহানবী (দ:) কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিল। সহীহ বোখারী শরীফের 'ফিতান' অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ একটি হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে, **"যে ব্যক্তি মুসলিম মিল্লাত হতে এক বিঘত পরিমাণ দূরত্বে বিচ্যুত হয় এবং সেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে যেন জাহেলীয়্যা যুগের অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলো"** [মানে প্রাক-ইসলামী যুগের অবিশ্বাস ও অজ্ঞতাসহ মৃত্যু হবে]। এই হাদীস শরীফটি আল-কুরআনের সূরা নিসা'র ১১৪ নং আয়াতটির ব্যাখ্যা দেয়। সহীহ বোখারী শরীফে ওপরে বর্ণিত হাদীসের পরে লিখিত অপর এক হাদীসে ঘোষিত হয়েছে: **"আল্লাহতা'লা তোমাদের থেকে (ইসলামের**

অাধ্যাত্মিক) জ্ঞান উঠিয়ে নেয়ার জন্যে সেই সব আলেম (-এ-হক্কানী/রব্বানী)-কে (দুনিয়া থেকে) সরিয়ে নেবেন, যাঁরা নিজেদের এলেমের আ'মিল তথা জ্ঞানের অনুশীলনকারী। তখন (দুনিয়ায়) অজ্ঞ-মূর্খরা থেকে যাবে। তাদের কাছে যারা জানতে চাইবে (দ্বীন সম্পর্কে), নিজেদের মনগড়া উত্তর দিয়ে তারা সমস্ত মুসলমানকেই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করবে।" উলামাবৃন্দের বর্ণিত জ্ঞানকে অনুকরণ আখ্যা দিয়ে আহল্ আস্ সুন্নাহ'র প্রতি দোষারোপকারী এবং স্থূল মস্তিষ্ক ও ভোঁতা বিচার-বুদ্ধি দ্বারা ধর্মের অন্তর্ঘাতী শত্রুতাকারী ধর্ম সংস্কারকদের ক্ষতি সম্পর্কে এই হাদীসটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই হাদীসটি ইমাম মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বোখারী (জন্ম: ১৯৪ হিজরী/৮০৯ খৃষ্টাব্দ ও বেসাল সমরখন্দে ২৫৬ হিজরী/৮৬৯ খৃষ্টাব্দ) প্রণীত '**সহীহ'** গ্রন্থের প্রারম্ভে লিপিবদ্ধ আছে। সহীহ বোখারী শরীফের 'এলম' অধ্যায়ে উদ্ধৃত আরেকটি হাদীসে এরশাদ হয়েছে: **"প্রলয় দিবসের একটি পূর্বাভাস হচ্ছে জ্ঞান (এলমে মা'রেফত) অদৃশ্য হয়ে যাবে; ধর্মীয় জ্ঞানে মূর্খদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। মানুষের মাঝে অধিক হারে মদ্যপায়ী ও অবৈধ যৌনাচারী দেখা দেবে।"** ধর্ম সংস্কারকদের ধর্মীয় পদে অধিষ্ঠান ও আহল্ আস্ সুন্নাহ'কে নির্মূলের অপচেষ্টা দ্বারা এই বাস্তবতা পরিস্ফুট হয় যে ওপরের হাদীস শরীফটি ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা বর্ণনাকারী মহানবী (দ:)-এর এক মো'জেযা বা অলৌকিকত্ব হিসেবে প্রমাণিত।

৩৪/ – ধর্ম সংস্কারক বলে: "তাকলীদ হচ্ছে এজতেহাদেরই ফলশ্রুতি। যেখানে এজতেহাদ নেই সেখানে তাকলীদ-ও নেই। এজমা' তথা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন সব বিষয়-ই যারা পালন করেছেন, তাদেরকে এখতেলাফী বা মতপার্থক্যের বিষয়গুলো পালন করা জরুরি নয়। এগুলো ছেড়ে দেয়ার অনুমতি তাদের আছে। চেনা নেই, জানা নেই এমন কাউকে অনুসরণ (তাকলীদ) করা কি বিবেক-বুদ্ধি ও সুবিবেচনার সাথে খাপ খায়? কোনো বিষয়ে ফতোয়া চেয়ে নেয়া তাকলীদ নয়, বরং তা এক প্রকার নকল (ধর্মীয় জ্ঞানের স্থানান্তর বা বিচ্ছুরণ) ও রেওয়ায়াত (বর্ণনা)। মুজতাহিদ, যার এজতেহাদ অনুসরণ করা হচ্ছে, তার মধ্যে যে গুণাবলী/শ্রেষ্ঠত্ব মাপকাঠি বা শর্ত হিসেবে ধরা হয়, তা কিন্তু খলীফা বা সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর মাহাত্ম্যের মতো নয়। অর্থাৎ, এটি আল্লাহর দৃষ্টিতে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব-ই নয়। বরং (আল্লাহর মানদণ্ড অনুযায়ী) তা হতে হবে (মুজতাহিদের) বিচার-বিবেচনা, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, গবেষণা ও অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে। পরবর্তীকালে যারা আগমন করেছেন, তারা হয়তো (পূর্ববর্তীদের চেয়ে) শ্রেষ্ঠ হতে পারেন। মযহাবের ইমামদের মধ্যে ইমাম শাফেঈ (রহ:)-ই শ্রেষ্ঠ। আমি (রশীদ রেযা) যখন কোনো দালিলিক প্রমাণ পাই না, তখন সেই মযহাবকে অনুসরণ করি যেটিকে আমি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি। মানে আমি মুজতাহিদ ও মুকাল্লিদ উভয়ই বনে যাই। ফলশ্রুতিতে শুধু মুকাল্লিদ হওয়া থেকে আমি মুক্ত হই। আজকের মুসলমান সমাজ মযহাব-ও চেনে না, ঈমান সম্পর্কেও জানে না। এদের সংখ্যাগরিষ্ঠের যে ধর্মীয় জ্ঞান তা হচ্ছে আল্লাহ আসমানে আছেন এবং মহানবী (দ:) আসমানে উঠে (মে'রাজে) আল্লাহকে দেখেছেন।" ['মুহাওয়ারাত']

ওপরের বক্তব্য আবারো রশীদ রেযার নিজস্ব মতামত প্রতিফলন করে। যেহেতু সে কোনো ইসলামী জ্ঞান বিশারদ নয়, আর এ বইয়ে উদ্ধৃত তার ইতিপূর্বেকার বক্তব্য দ্বারা সে কোন্ মতের অনুসারী তাও যেহেতু পরিস্ফুট, সেহেতু এসব তড়িঘড়িভাবে সংগৃহীত বিবৃতি জবাবের যোগ্য-ই নয়। তথাপি প্রবাদে যেভাবে দাবি করা হয়েছে, "মাছি ছোট হলেও সেটি বমির উদ্রেক করে", তাই তরুণ প্রজন্মকে রশীদ রেযার ক্ষতি থেকে রক্ষার্থে প্রত্যুত্তর দেয়া বিহিত হবে।

যে সব ক্ষেত্রে এজতেহাদ নেই, সেখানে তাকলীদের অস্তিত্ব নেই বলা সঠিক নয়। আল্লাহতা’লা এরশাদ ফরমান, **“আমার রাসূল (দ:)-কে মান্য করো!”** এই খোদায়ী আদেশের অনুসরণ করেই সাহাবা-এ-কেরাম (দ:) মহানবী (দ:)-এর সমস্ত আদেশ-নিষেধ মান্য করেছিলেন, এমন কি শাহাদাত-ও বরণ করেছিলেন। তাঁরা কোনো প্রামাণিক দলিলের খোঁজ করেন নি। তাঁদের এই অনুসরণ ছিল নিঃশর্ত। রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর আদেশ-নিষেধ ওহী (ঐশী বাণী) মারফত প্রকাশিত হতো এবং সেগুলো এজতেহাদের সাথে সংমিশ্রিত হতো না। কিন্তু যে সব বিষয়ে এজতেহাদ প্রয়োগযোগ্য ছিল, সেগুলোর ক্ষেত্রে সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) তা প্রয়োগ করতেন এবং নিজেদের এজতেহাদ সম্পর্কে মহানবী (দ:)-কে জানাতেনও। কখনো কখনো তাঁদের এজতেহাদ হুযূর পাক (দ:)-এর সিদ্ধান্তের সাথেও ভিন্নমত পোষণ করতো। এমতাবস্থায় সঠিক এজতেহাদ কোনটি তা জানাতে ওহী নাযেল (অবতীর্ণ) হতো। কোনো কোনো সময় ওহী সাহাবী (রা:)-এর এজতেহাদের পক্ষে যেতো। রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর বেসালের (পরলোকে আল্লাহর সাথে মিলনপ্রাপ্তির) পরে সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) একে অপরকে আর অনুসরণ করেন নি। ফলে বোঝা গিয়েছে যে কোনো মুজতাহিদের অন্য কোনো মুজতাহিদকে অনুসরণ করার অনুমতি নেই; আর মুকাল্লিদের জন্যে নিজস্ব সকল বিষয়ে কোনো এক মুজতাহিদকে অনুসরণ করা জরুরি; কিন্তু সর্বসম্মত বা বিভক্তির হাজারো বিষয়ে তার দলিল অন্বেষণ বা অধ্যয়ন করার কোনো প্রয়োজন-ই নেই। এটি যদি জরুরি হতো, তাহলে সাহাবা-এ-কেরাম (দ:) তাবেউন (রহ:)-দেরকে তা করার আদেশ দিতেন। মুসলমানদেরকে এ কাজ করতে বাধ্য করা উম্মতে মোহাম্মদীয়্যার ঘাড়ে কষ্টের বোঝা চাপিয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের ধর্ম আমাদের প্রতি অসুবিধা চাপিয়ে দিতে চায় না, বরং সহজ পন্থা বাতলে দেয়।

ধর্ম সংস্কারকের (রশীদ রেযার) মতে, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সহস্র সহস্র ঐকমত্যের ও মতানৈক্যের বিষয়গুলো সম্পর্কে জেনে সেগুলোর মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করে মতৈক্যের বিষয়গুলো অনুশীলন করা এবং মতপার্থক্যের বিষয়গুলোর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে সেগুলোর দলিল খুঁজে বের করে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল যাচাই-বাছাই করা এবং তারপর ওই আমল পালন করবেন কি করবেন না, তা তাঁর-ই ইচ্ছাধীন রাখা। এ কোন্ ধরনের যুক্তি বা পরামর্শ হতে পারে? সে নিজেই লিখেছে, মুসলমানবৃন্দ কিছুই জানেন না, তাঁরা এমনই অজ্ঞ যে শুধু এইটুকু জানেন আল্লাহতা’লা আসমানে অবস্থান করেন। এমতাবস্থায় কোন্ পন্থা সহজ হবে – এই রকম এক সম্প্রদায়কে মযহাব শিক্ষা দেয়া? না-কি তাঁদের সামনে কষ্টসাধ্য এক পথ নির্ধারণ করা? কোনো জ্ঞানী ও যুক্তি-বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি শুধু আল্লাহতা’লা ও ইসলামের খাতিরে কথা বলেন, তিনি অবশ্যই তৎক্ষণাৎ উত্তর দেবেন। কিন্তু রশীদ রেযার বইয়ের আদ্যোপান্তে লিপিবদ্ধ তার বিভিন্ন বক্তব্য থেকে যা বোঝা গিয়েছে, সে ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমতের উদ্দেশ্যে এই কাজে নামে নি, বরং তাঁদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে ইসলামের সাথে মতদ্বৈততা সৃষ্টি এবং অন্তর্ঘাতমূলক অপতৎপরতার উদ্দেশ্যেই সে এগুলো করেছে। তার প্রতি জবাব কেবল একটি-ই, আর তা হলো তাকে বলা, “চুপ করো, যিনদিক্ব! তুমি মুসলমানদেরকে ধোকা দিতে পারবে না!”

রশীদ রেযার ভাষ্যানুযায়ী, সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) কারো মতামত নেয়ার বা এজতেহাদ সম্পর্কে জানার সময় আল্লাহর দৃষ্টিতে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বা মাহাত্ম্য বিবেচনা করতেন এবং তাঁর বিচার-বিবেচনার ধীশক্তি, জ্ঞান-প্রজ্ঞা বা গবেষণার খোঁজ তাঁরা নিতেন না। এটি আবারও ধর্ম সংস্কারকের একটি দলাদলিমূলক ও ধ্বংসাত্মক চিন্তাভাবনা। সে এর দ্বারা পুতঃপবিত্র সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর প্রতি

কলংক লেপনের অপচেষ্টা চালিয়েছে এবং বোঝাতে চেয়েছে তাঁরা গুণগত মান বজায় রাখেন নি এবং জ্ঞানের সদ্ব্যবহারও করেন নি। ইসলামের মহান চার খলীফা (রা:) সব সময় আসহাবে কেরাম (রা:)-কে জিজ্ঞেস করতেন: "আপনাদের মধ্যে কে এই বিষয়ে (ভাল) জানেন?" অতঃপর তাঁরা ওই জ্ঞানীদের কাছ থেকে জেনে নিতেন। কেননা, আল্লাহতা'লার দৃষ্টিতে সকল সাহাবা (রা:)-ই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। খলীফা (রা:)-বৃন্দ সাহাবা-এ-কেরাম (দ:)-এর মাহাত্ম্য বা শ্রেষ্ঠত্বের পার্থক্য সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন না, বরং তাঁদের জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও মতামত জানতে চাইতেন। আর আহলে সুন্নাতের উলেমাবৃন্দও তা-ই করতেন। তাঁরা তাঁদের সকল কাজে সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর অনুসরণ করতেন।

ইমাম শাফেঈ (রহ:)-কে শ্রেষ্ঠতর বিশ্বাস করায় কোনো দোষ নেই। তবে তিনি নিজেই বলেছিলেন ইমামুল আ'যম হযরত আবূ হানিফা (রহ:) তাঁর চেয়েও শ্রেষ্ঠ। [এ বইয়ের ৪৩ অনুচ্ছেদে ইমাম শাফেঈ (রহ:)-এর এ ধরনের মন্তব্য বিধৃত]

চার মযহাব তথা আহলে সুন্নাতকে এবং বৃহত্তর পরিমণ্ডলে দ্বীন ইসলামকে ধ্বংস করার জন্যে ধর্ম সংস্কারকরা সর্বদা মযহাবগুলোর তালফিক্ক (একত্রিকরণ/সংমিশ্রণ)-এর ওপর জোর দেয়; অর্থাৎ, বিভিন্ন মযহাবের সুবিধাজনক পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করে বাকিগুলো বাদ দেয়ার পক্ষে যুক্তি পেশ করে। তাদের সব বইপত্রেই দেখা যায়, আহলে সুন্নাতের উলেমাবৃন্দের উদাহরণ যা তারা দেয়, তাতে হানাফী মযহাবের তিন ইমামের এজতেহাদের সংমিশ্রণ বা জরুরাতের সময় বিভিন্ন মযহাবের এজতেহাদের একত্রিকরণের অজুহাত-ই তাদের একমাত্র সম্বল। আমরাও বলি, উভয় ক্ষেত্র-ই অনুমতিপ্রাপ্ত। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কোনো মযহাবের অন্তর্গত ইমামবৃন্দের এজতেহাদগুলোকে ওই মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমামের এজতেহাদ হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। ওগুলোর একত্রিকরণ বা সংমিশ্রণ সংশ্লিষ্ট ইমাম আল-মযহাবের এজতেহাদকে ত্যাগ করা বোঝায় না। ধর্ম সংস্কারকরা নিজেদের ধূর্ততাপূর্ণ যুক্তি দ্বারা অনুমতিপ্রাপ্ত বিষয়গুলোর কথা উপস্থাপন করে নিজেদের দূষণীয় ও ধ্বংসাত্মক ধ্যান-ধারণাকেও ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও এবাদত-আমল হিসেবে সর্বজনগ্রাহ্য করে নিতে অপতৎপর।

৩৫/ – রশীদ রেযা নিজ দাবির পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে তার ধ্যান-ধারণাকে আঁকড়ে ধরতে চায়। সে আবারও বলে: "আমি এবাদতের ক্ষেত্রে কেয়াসকে মানি না। প্রত্যেক মুসলমান যিনি দালিলিক প্রমাণগুলো দেখেন এবং মতামতগুলোও যথাক্রমে গ্রহণ করেন, তিনিও মুজতাহিদ বটে। অধিকন্তু, যে সকল মুজতাহিদ বিভিন্ন মযহাবের অন্তর্গত ছিলেন, তাঁরাও কিছু কিছু বিষয়ে তাদের (মযহাবগুলোর) সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন। আল-বাগ্বাভী, আল-আওযাঈ ও আল-গাযযালী শাফেঈ মযহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের ইমাম আল-মযহাবের সাথে একমত হননি; আর যামাখশারী দ্বিমত পোষণ করেন আবূ হানিফার সাথে। চার খলীফার শাসনামলের পরে রাজতান্ত্রিক শাসনের সূচনা হয়। এতে ধর্মীয় শিক্ষা বিকৃত হয়ে পড়ে।" ['মুহাওয়ারাত']
ধর্ম সংস্কারকের মতে, ইসলামে কোনো কেয়াস নেই; সকল মুসলমান-ই মুজতাহিদ; মতপার্থক্যের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে প্রামাণিক দলিল দেখে তাঁরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। আরেক কথায়, মুসলমান সর্বসাধারণ কেয়াস্ প্রয়োগ করতে পারবেন! তার দুটো দাবি-ই পরস্পরবিরোধী। উসূল আল-ফেকাহ'র বইপত্র থেকে যদি সে এজতেহাদ ও কেয়াসের মানে বুঝতে পারতো, তাহলে এই পরস্পরবিরোধিতার মুখোমুখি হতো না। মিসরীয় ধর্ম সংস্কারক তার মাতৃভাষা আরবীতে বেশ

শক্তিশালী এবং সে অন্তত কিছুটুকু হলেও শিক্ষিত। নিশ্চয় সে আহলে সুন্নাতের উলেমাবৃন্দের বইপত্র পড়ে নিজের সীমা অনুযায়ী বুঝতে সক্ষম। কিন্তু ‘এলম আল-উসূল আল-ফেকাহ’ শাস্ত্রটি মহাসাগরের মতোই গভীর। এই বিদ্যাশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হতে হলে আশিটি প্রাথমিক জ্ঞানের শাখায় পূর্ণ পাণ্ডিত্য অর্জন করা জরুরি। যে ব্যক্তি এই আশিটি শাখা সম্পর্কে জানে না, এবং এমন কি এগুলোকে অস্বীকারও করে, সে এই জ্ঞানের শাখা সম্পর্কে অজ্ঞ ছাড়া কিছুই নয়। যদি সে আরবীতে অত্যন্ত দক্ষ হয়, তবুও সে অজ্ঞ-ই থেকে যাবে। এই যুগ হচ্ছে বিশেষায়িত শিক্ষার। শুধু চিকিৎসা বিজ্ঞান কিংবা পদার্থ বা রসায়নবিদ্যার ক্ষেত্রেই বিশেষায়িত শিক্ষার কতো নতুন শাখার প্রতিনিয়ত উৎপত্তি হচ্ছে। শরীরের অভ্যন্তরীন রোগব্যাধির কোনো চিকিৎসক হয়তো তার রোগীকে কোনো স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে ’রেফার’ করতে পারেন; তিনি হয়তো তাকে কোনো মনোবিজ্ঞানীর কাছে ’রেফারেল’ দিতে পারেন; আবার ওই মনোবিদ হয়তো তার রোগীকে কোনো মানসিক রোগের চিকিৎসকের কাছে পাঠাতে পারেন। ফিজিওথেরাপীর বিশেষায়িত শাখাগুলোর সংখ্যা আরও বেশি। বিজ্ঞানের যেখানে বিভিন্ন বিশেষায়িত শাখার সংখ্যা এতো অধিক, সেখানে বিজ্ঞানের চেয়েও উচ্চতর ও ব্যাপক ধর্মীয় জ্ঞানের বিশেষায়িত শাখাগুলো এবং সেগুলোর বিশেষজ্ঞবৃন্দকে হেয় করা, বা এক কদম বেড়ে গিয়ে অস্বীকার করা কীভাবে সঠিক হতে পারে? এটি কখনাোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, বিশেষ করে ধর্মীয় জ্ঞানের নামে যে ব্যক্তি কথা বলে তার তরফ থেকে। ধর্ম সংস্কারক যে উসূল আল-ফেকাহ’র শাস্ত্রে নিতান্ত এক গণ্ডমূর্খ, তা এক্ষণে পরিষ্কার। কোনো আলেম তথা ধর্মীয় জ্ঞান বিশারদ সম্পর্কে একজন মূর্খ লোক মন্দ কথা বল্লেও তার কোনো মূল্য-ই নেই। আলেম-ই আলেম চেনেন, মূর্খ চেনে না। সুবিধাজনক হোক বা অসুবিধাজনক-ই হোক, মূর্খের কথার কোনো মূল্য নেই, মূল্যায়নও নেই। যে গণ্ডমূর্খ উলামা-এ-কেরামের বাণী না বুঝে অনেক পৃষ্ঠাজুড়ে লিখে ভরিয়ে দেয়, সে কেবল তার মতো গণ্ডমূর্খদেরকেই ধোকা দিতে সক্ষম হবে। এ সব কথা যখন লিখছি, তখন আমরা কোনো অবস্থাতেই এই মহৎ বিদ্যার শাখায় নিজেদেরকে কর্তৃত্বশীল বলে দাবি করছি না। কেননা, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আলেম হওয়া তো দূরে, (প্রাথমিক যুগের) ওই গভীর জ্ঞানী পণ্ডিতদের সামনে আমরা একেবারেই কিছু না। তাই এই জ্ঞানের শাখায় নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলা বা লেখা আমরা মনে করি বে-আদবি। কিন্তু আমরা কী-ই বা করতে পারি, যেখানে গণ্ডমূর্খ এবং ইসলামের শত্রুরা অগ্রসর হয়ে বিদ্যার এই শাখার ওপর পদদলন করছে? ইসলাম ধর্মকে আক্রমণের বেলায় তারা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করছে। তাদের প্রতি জবাব দেবার জন্যে কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ইসলাম ধর্ম আজ আক্রান্ত, ধ্বংসের মুখোমুখি। আল্লাহর দরবারে অসংখ্য শোকরিয়া যে এমনই এক আলেমে হক্কানীর সাক্ষাৎ পাওয়ার সৌভাগ্য দ্বারা আমরা ধন্য হয়েছি, যিনি ইসলামের এই জ্ঞানের শাখার এক বিশেষজ্ঞ; যিনি এ পরিস্থিতি বহুকাল আগে থেকেই পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং তখন থেকেই চিন্তিত ছিলেন; কিন্তু যিনি এ বিষয়ে কথা বলা বা লেখালেখি করা থেকে ছিলেন বঞ্চিত। আল্লাহতা’লার এই মহান অনুগ্রহের জন্যে আমরা আবারও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের শরীরের প্রতিটি লোমও যদি কথা বলতে আরম্ভ করতো, তথাপিও আল্লাহর এই দানের প্রতি প্রাপ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপনের দশ লাখ ভাগের এক ভাগও পূর্ণ করতে পারতাম না। হযরত সাইয়্যেদ আবদুল হাকিম-ই আরওয়াসী, যিনি সেই মহান ইসলামী জ্ঞানের বিশেষজ্ঞ, তাঁর হেকমত ও মা’রেফতের ভাণ্ডার থেকে কিছু বাস্তব জ্ঞান আহরণ করতে না পারলে আমরা এই সুউচ্চ, অত্যন্ত গভীর ও বিপদের ঝুঁকিপূর্ণ সূক্ষ্ম বিষয়ে বইপত্র লেখা তো দূরে, মুখ খোলার দুঃসাহসও দেখাতে পারতাম না। কিন্তু ওই জ্ঞান যা আমরা লাভ করেছি, তা আমাদের দ্বীনী ভাইদেরকে জানানো কর্তব্য, এমন কি আমাদের ঋণ হিসেবে বিবেচনা করেছি। আমরা যা শুনেছি এবং শিখেছি, তা দ্বীনী ভাইদেরকে জানানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি হাদীসে বর্ণিত সতর্কবাণী আমলে নেয়ার খাতিরেই। এরশাদ

হয়েছে: **“যখন ফিতনার উদ্ভব হবে এবং বেদআত ছড়িয়ে পড়বে, তখন যে ব্যক্তি সত্য জানে, সে যেন তা প্রকাশ করে। অন্যথায় তার প্রতি আল্লাহ তা’লা, ফেরেশতাকুল ও মানবজাতির (মো’মেন মুসলমানদের) লা’নত তথা অভিসম্পাত।”** আল্লাহ পাক আমাদেরকে সত্য লেখার ক্ষেত্রে আশীর্বাদধন্য করুন! যাঁরা তা পড়বেন, তাঁদের ওপর এর প্রভাব বিস্তারের অনুগ্রহ বর্ষণ করুন! আমরা যে ভুলত্রুটি করেছি তাও তিনি মাফ করুন! আর পৃথিবীর অন্তিমলগ্নে আগত ফিতনার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বিবাদ-বিসম্বাদ থেকে তিনি উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে রক্ষা করুন, আমীন!
মযহাবগুলোর অনুসারী উলেমাবৃন্দের কেউই কখনো নিজ ইমাম আল-মযহাবের উসূল (মৌলনীতি)-এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেননি, এমন কি তাঁরা মুজতাহিদের পর্যায়ে উন্নীত হলেও এটি হয়নি। কোনো মযহাবের শিক্ষা বিস্তারকারী মুজতাহিদদের মধ্যে বিভিন্ন স্তরবিন্যাস ছিল। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ‘আরবাব আত্ তারজিহ’, যাঁরা ইমাম আল-মযহাব হতে আগত রওয়ায়াতগুলোর প্রামাণিক দলিলসমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করতেন এবং এরপর সেগুলোর মধ্য থেকে একটিকে বেছে নিতেন। যে রওয়ায়াতকে বাছাই করা হতো না, সেটিকেও কিন্তু প্রত্যাখ্যাত বলা যায় না। অসুবিধার সময় সে সব হাদীস বা বর্ণনানুযায়ী আমল পালন করা যায়। ইমাম আল-মযহাব হতে আগত রওয়ায়াতগুলোর মধ্যে কোনো একটি বেছে নেয়াকে ইমাম আল-মযহাবের সাথে ভিন্নমত পোষণ করা বোঝায় না। সর্ব-হযরত আল-আওযাঈ (রহ:), আল-বাগাভী (রহ:) ও ইমাম আল-গাযযালী (রহ:)-ও ইমাম শাফেঈ (রহ:)-এর মতোই একেকজন মোতলাক্ক (স্বনির্ভর) মুজতাহিদ ছিলেন। অনেক বিষয়ে তাঁদের এজতেহাদগুলো ইমাম শাফেঈ (রহ:)-এর এজতেহাদের সাথে মিলে গিয়েছিল। গণ্ডমূর্খরা ধারণা করে বসে আছে যে তাঁরা বুঝি শাফেঈ মযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং ওই মযহাবের ইমাম সাহেবের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন। আর যামাখশারীর ব্যাপারে বলতে হয়, হানাফী তো দূরে থাক, সে আহলুস্ সুন্নাতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সে ছিল বাহাত্তরটি ভ্রান্ত দলের অন্যতম মো’তাযেলা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু মো’তাযেলা গোষ্ঠীর এবাদত-বন্দেগীর পদ্ধতি হানাফীদের মতোই দেখতে, সেহেতু মূর্খরা মনে করে তারা বুঝি হানাফী মযহাবেরই অন্তর্গত।

চার ইসলামী খলীফার পরে ধর্মে পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে মর্মে ধর্ম সংস্কারকের কথাটি ধর্মীয় পদে সমাসীন কোনো ব্যক্তিকেই শুধু নয়, বইপত্র যাঁরা পড়েছেন তাঁদেরকেও আশ্চর্যান্বিত করবে; ধার্মিক বা অধার্মিক যে কেউই এই কথা প্রত্যাখ্যান করবেন। কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফ ব্যক্ত করে যে মহাপ্রলয় দিবস পর্যন্ত আমাদের ধর্মীয় জ্ঞান টিকে থাকবে। মুসলমানদের মধ্যে একটি দল সবসময়-ই সঠিক পথের ওপর বহাল থাকবেন। প্রতিটি ইসলামী শতাব্দীতে একজন মোজাদ্দেদ তথা ধর্মের নবায়নকারী বা পুনরুজ্জীবনকারী আগমন করবেন। এ কথা সত্য যে বাহাত্তরটি পথভ্রষ্ট দলের আবির্ভাব ঘটেছে এবং ভ্রান্ত আকীদার লোকদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে, আর আহলে সুন্নাতের মধ্যেও দ্বীনের বিধি-বিধান না জানা মানুষ ও পাপী-তাপী রয়েছেন; কিন্তু এও তো সত্য যে সঠিক পথের ওপর কায়েম মানুষেরাও বিদ্যমান। সঠিক পথ-ই হক্ক, আর আমাদের ধর্মও ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে যেমন নির্মল ছিল, আজো তেমনি আছে।

চার মযহাবের উলেমাবৃন্দ সর্বসম্মতভাবে বলেছেন **‘মেশকাতুল মাসাবিহ’** শিরোনামের হাদীসগ্রন্থটি বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। এই পুস্তকের ‘**কিতাবুল ফিতান**’ অধ্যায়ে হযরত সাওবান (রা:) থেকে বর্ণিত একখানি হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (দ:) এরশাদ ফরমান: **“এমন এক সময় আসবে**

যখন আমার উম্মতের একটি অংশ মুশরিক (মূর্তিপূজারী)-দের সাথে যোগ দেবে। তারা ওদের মতোই মূর্তিপূজা করবে। (ওই সময়) মিথ্যেবাদীদেরও আবির্ভাব ঘটবে। তারা নিজেদেরকে নবী মনে করবে। কিন্তু আমার পরে কোনো নবী আসবেন না। আমার উম্মতের মধ্যে সবসময়-ই কিছু মানুষ থাকবে যারা সঠিক পথে পরিচালিত হবে। তাদের বিরোধিতাকারীরা কখনোই তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যতোক্ষণ না আল্লাহতা'লার আজ্ঞা আসে।" [**অনুবাদকের নোট**: এটি হযরত আবূ বকর (রা:)-এর শাসনামলে রিদ্দাহ তথা ধর্ম হতে প্রত্যাবর্তনকারীদের উদ্দেশ্যে বর্ণিত; ওই সময় ভণ্ড নবী মুসায়লামা কাযযাব (মিথ্যুক)-সহ কয়েকজন নবী দাবিদার মিথ্যুকেরও আবির্ভাব হয়েছিল; এতে মহানবী (দ:)-এর অদৃশ্য জ্ঞান সপ্রমাণিত হয়] এই হাদীস শরীফটি পরিস্ফুট করে যে মহাপ্রলয় দিবস অবধি ধর্ম সংস্কারক বা যিনদিক্ক চক্র কখনোই আমাদের মহান ধর্মকে বিকৃত করতে পারবে না। যদিও সারা বিশ্বের পাঠাগারগুলোতে বিকৃত, ধ্বংসাত্মক ও বিভাজন সৃষ্টিকর বইপত্র অনেক এবং সেগুলো দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তথাপি সঠিক পথের বইপত্রও সেখানে শোভা পাচ্ছে। ওই গ্রন্থসম্ভার কখনোই নিশ্চিহ্ন হবে না, আর কেউ সেগুলোকে নির্মূলও করতে পারবে না। কেননা, সেগুলো আল্লাহতা'লার হেফাযতে সংরক্ষিত আছে। যাঁরা ওই সব বইপত্র খুঁজে বের করে পড়ে সুখ-শান্তি অর্জন করবেন, তাঁদের জন্যে সুখবর! দু'টি পংক্তি:

"আমি তোমার কাঙ্ক্ষিত রত্ন-ভাণ্ডারের চাবি তোমায় করছি দান,

যাতে আমরা অর্জনে ব্যর্থ হলেও তুমি তার পেতে পারো সন্ধান।"

৩৬/ – ধর্ম সংস্কারক বলে, "মানুষেরা দুটি শ্রেণীভুক্ত: শিক্ষিত মানুষ ও সাধারণ মানুষ। প্রথমোক্ত শ্রেণীটি দালিলিক প্রমাণ খুঁজে বের করে তার অনুসরণ করবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীটি মুজতাহিদ ও ফকীহ'দের অনুসরণ করবেন, তবে শর্ত থাকবে যে তাঁরা কোনো নির্দিষ্ট কাউকে অনুসরণ করবেন না। সাধারণ মানুষদের কোনো নির্দিষ্ট মযহাব নেই। এটি-ই হলো নিম্নের উক্তিটির অর্থ, যা'তে বলা হয়েছে, 'তাদের মযহাব হচ্ছে মুফতীর মযহাব।' আবারও, প্রাথমিক যুগের উলেমাবৃন্দ-ই বলেছেন যে নির্দিষ্ট কোনো মুফতীকে অনুসরণ করা জরুরি নয়। প্রত্যেকে যাকে ইচ্ছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারবেন। সাধারণ মুসলমানগণও নিজে নিজে হাদীস অনুযায়ী আমল করতে পারবেন। এই ব্যাপারে ইমামবৃন্দ একে অপরের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেননি। '**আল-হেদায়া**' পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে যে, কোনো রোযাদার ব্যক্তি শিঙ্গা অস্ত্রোপচারের পর নিজের রোযা ভেঙ্গে গিয়েছে ভেবে কিছু খেয়ে নিলে তাকে ওই রোযা কাযা করতে হবে এবং এর পাশাপাশি কাফফারাও করতে হবে; কেননা, রোযা ভঙ্গ হয়েছে মর্মে তার এই ধারণা কোনো শরয়ী দলিলভিত্তিক ছিল না। তবে কোনো মুফতী (বিষয়টির ক্ষেত্রে বিপরীত) এই ধরনের কোনো ফতোওয়া দিলে, তা তার জন্যে দলিল হবে। তিনি যদি কোনো হাদীসকে মেনে এটি করে থাকেন, তাহলেও একই অবস্থা হবে এবং তাকে কাফফারা দিতে হবে না (আল-কাফী ও আল-হামিদী)। রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর কথা তো মুফতীর চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। সকল ইমাম-ই বলেন, 'আমাদের কথাকে রেখে হাদীসের অনুসরণ করো।' কিন্তু কিছু লোক বলে, যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করতে চায়, সে যিনদিক্ক হয়ে যাবে। আবূ হানিফা বলেন, 'আমার প্রামাণিক দলিল যে ব্যক্তি জানে না, তার কোনো অনুমতি নেই আমার এজতেহাদ অনুসারে ফতোওয়া জারি করার।' ফলে তিনি এমন এজতেহাদ প্রয়োগ করতে বলেননি যা দ্বারা মানুষেরা তাঁকে অনুসরণ করবে এবং কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, বরং তাঁর এজতেহাদগুলোর উদ্দেশ্য ছিল মানুষদেরকে এটি দেখাতে কীভাবে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে

আইন-কানুন বের করতে হয়। ইবনে আবেদীনের মতো পরবর্তী প্রজন্মের আলেমদের কথা অনুসরণ করে কুরআন-সুন্নাহ থেকে আইন-কানুন বের করা হারাম বলা আবূ হানিফার সাথে ভিন্নমত পোষণ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সকল অনুকরণকারীরা অন্যান্য অনুকরণকারীদের কাছ থেকে নকল করেছে নিম্নের বক্তব্যটি: 'আমল (ধর্ম অনুশীলন) হতে হবে ফেকাহ'ভিত্তিক, হাদীসভিত্তিক নয়।' যদিও **'যাহিরিয়্যা'** পুস্তকটি ব্যক্ত করে যে এই কথার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষ, তথাপি এর মানে এই দাঁড়ায় যে ফেকাহ থাকতে কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করা অনুমতিপ্রাপ্ত নয়। আর এটি নিশ্চিত যে এ কথাটি ভুল। যারা এ কথা বলে তারা অজ্ঞ ও একগুঁয়ে। আল-কায়দানী বলেন, দশম হারাম কাজ হচ্ছে নামাযে (বৈঠকে) আঙ্গুল ওঠানো। আলী আল-কারী বলেন, এই বিবৃতি পাপযুক্ত এবং একে তা'উইল (ভিন্নতর ব্যাখ্যা) করা যায় না; সে (আল-কায়দানী) একজন কাফের হিসেবে বিবেচিত হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (দ:) যে আঙ্গুল উত্তোলন করতেন তা নিশ্চিত।" [রশীদ রেযা কৃত 'মুহাওয়ারাত']
হ্যাঁ, মানুষ দুটি শ্রেণীভুক্ত। প্রথম শ্রেণীতে রয়েছেন সে সকল ইসলামী উলেমা যাঁরা এজতেহাদের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। আর দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হলেন এজতেহাদের পর্যায়ে উন্নীত নন এমন উলেমাবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষ জানার জন্যে কোনো মুফতীকে জিজ্ঞেস করার কথা যেখানে বলা হয়েছে, তাতে 'মুফতী' বলতে বোঝানো হয়েছে 'তাঁদের নিজেদের মযহাবের অন্তর্গত মুফতী'। ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (রহ:) **'হাযানাত আর-রিওয়ায়াত'** গ্রন্থের সূত্রে নিজ **'রাদ্দুল মোহতার'** শীর্ষক পুস্তকের মুখবন্ধে লেখেন: "যে সকল আলেম কুরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফ থেকে অর্থ বের করতে পারতেন, তাঁদের বলা হতো আহল্ আদ্ দিরাএয়া। তাঁরা ছিলেন এজতেহাদ প্রয়োগের পর্যায়ে উন্নীত। তাঁদের ইমাম আল-মযহাব কর্তৃক বর্ণিত কোনো মারজুহ (অপছন্দকৃত) বা যয়ীফ (অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণিত) হাদীস/রেওয়ায়াত অনুযায়ী আমল করার অনুমতি তাঁদের ছিল, যদিও বা তাঁরা যে মযহাবের অন্তর্গত ছিলেন তার সাথে সেটি অসঙ্গতিপূর্ণ হতো। অসুবিধার সময় এটির ওপর নির্ভর করে তাঁরা মুসলমান সর্বসাধারণের জন্যে ফতোওয়াও জারি করতে পারতেন।" অতএব, পরিদৃষ্ট হলো যে, অসুবিধার সময় মুজতাহিদ ফীল্ মযহাব তথা মযহাবের অন্তর্গত মুজতাহিদবৃন্দের জন্যে নিজেদের মযহাবের ভেতরে সহজ পন্থা প্রদর্শনকারী কোনো এজতেহাদের অনুসরণ করা সব সময়-ই জায়েয এবং তা সর্বসাধারণের অনুসরণ করার অনুমতিও রয়েছে (আমাদের লেখা Endless Bliss, ৪র্থ খণ্ডের 'গোসল' অধ্যায় দেখুন)। ইমাম ইবনে আবেদীন (রহ:) মুখবন্ধে আরও লেখেন: "মুসলমান সর্বসাধারণের কোনো মযহাব নেই, তাঁদের মযহাব হলো তাঁদের মুফতীর মযহাব। ইবনে হুমামের **'তাহরির'** পুস্তকের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থে এই বিবৃতির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মযহাবের অনুসরণ সে ব্যক্তির জন্যেই যিনি মযহাব কী তা জানেন ও বোঝেন, কিংবা যিনি মযহাবের কোনো বই পড়ে ওই মযহাবের ইমামবৃন্দের ফতোওয়াগুলো বুঝতে সক্ষম; আর যে ব্যক্তির এই যোগ্যতা নেই সে যদি দাবি করে সে হানাফী বা শাফেঈ, তবে তাতে প্রতীয়মান হবে না সে এই দুইটির কোনোটিরই অনুসারী। এ থেকে বোঝা যায়, কোনো সাধারণ মানুষ মযহাব পরিবর্তন করার দাবি করলে তার দাবির কোনো মূল্যই নেই; অন্য কোনো মযহাবের মুফতীর কাছে জিজ্ঞেস করলেই সে এই পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হবে। ইবনে হুমাম নিজ **'ফাতহুল কাদীর'** পুস্তকে লেখেন, 'মুফতীকে অবশ্যই মুজতাহিদ হতে হবে। যে আলেম-ব্যক্তি মুজতাহিদ নন, তিনি নাক্কিল (নকলকারী/রেফারেন্সদাতা), কিন্তু মুফতী নন। মুজতাহিদ নন এমন মুফতীগণও মুকাল্লিদ বটে। তাঁরা এবং মুসলমান সর্বসাধারণ হাদীস থেকে সঠিক অর্থ (মর্মার্থ) বের করতে অক্ষম। তাই মুজতাহিদবৃন্দ যেভাবে বুঝেছিলেন, ঠিক

সেভাবে এঁদেরকেও বুঝতে হবে; অর্থাৎ, মুজতাহিদদেরকে অনুসরণ করতে হবে। ইমামবৃন্দ এ বিষয়ে একে অপরের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেননি।”

রোযা অবস্থায় শিঙ্গা অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে মীমাংসা হলো, তাতে হানাফী মযহাবের কোনো অনুসারীর রোযা নিশ্চিতভাবে ভাঙ্গবে না। তিনি রোযা ভেঙ্গে গিয়েছে ভেবে কিছু খেলে রোযার কাযা এবং কাফফারা বাধ্যতামূলক হবে। শিঙ্গা অস্ত্রোপচারের পরে রোযা যে ভাঙ্গে না তা যে ব্যক্তি জানেন না, তিনি একজন সাধারণ মানুষ। যদি কোনো হাম্বলী মুফতী বলেন এতে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে, কিংবা যদি তিনি এই রোযা ভেঙ্গে যাবার মতের পক্ষে কোনো হাদীস পান এবং তা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা না যায়, তাহলে তার রোযা না ভাঙ্গার বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়বে; আর এর পরে যখন তিনি কোনো কিছু খাবেন, তখন কাফফারা বাধ্যতামূলক হবে না। কেননা, একজন সাধারণ মুসলমানের মযহাব হলো সেই মুফতীর মযহাব, যাকে তিনি জিজ্ঞেস করেন। এই উদাহরণটি হচ্ছে ইমাম আল-আ’যম হযরত আবূ হানিফা (রহ:)-এরই একটি এজতেহাদ। এটি পরিস্ফুট করে যে হানাফী মযহাবের অনুসারীদেরকে ইমাম আল-মযহাবের এজতেহাদকে মান্য করতে হয়। ধর্ম সংস্কারক এই উদাহরণটি পেশ করে প্রমাণ করেছে সে সঠিক নয়, বরং ভ্রান্ত। ইবনে হুমাম নিজ **‘আল-হেদায়া’** পুস্তকে ’কোনো ধর্মীয় প্রমাণের ওপর নির্ভর করা’ বাক্যটি ব্যাখ্যাকালে বলেন, ‘এটি হলো রোযা ভাঙ্গার কারণগুলোর মধ্যে কোনো একটির সাথে তুলনা করা।’ এই ব্যাখ্যা এবং মুফতীর ফতোওয়া একটি শরয়ী দলিল মর্মে বর্ণনা এ কথা প্রমাণ করে যে ধর্ম সংস্কারক ভ্রান্ত। সে যে ফাঁদ মুসলমানদের জন্যে পেতেছে, তাতেই সে পড়ে গিয়েছে! ‘আমার কথাকে বাদ দিয়ে হাদীসের অনুসরণ করো’, প্রত্যেক ইমাম আল-মযহাবের এই বাণী তাঁদের শিষ্যদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল, যাঁরা নিজেরাও মুজতাহিদ ছিলেন। কোনো মুজতাহিদকে নিজের এজতেহাদেরই অনুসরণ করতে হয়। কোনো ফকীহ বা ফেকাহবিদ-ই কখনো বলেন নি, ‘যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করতে চায়, সে যিনদিক্ব হয়ে যাবে।’ এই কথাগুলো ধর্ম সংস্কারকেরই উদ্ভাবিত। প্রকৃত বাণীটি হলো, ‘যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নিজে যা বোঝে সেই অনুযায়ী আমল করে, সে যিনদিক্ব হয়ে যাবে।’ এই কথা উলামা-এ-ইসলাম বলেছিলেন এবং এটি-ই বাস্তবতা। কেননা, এজতেহাদের পর্যায়ে যে ব্যক্তি উন্নীত হতে পারে নি, সে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সঠিক অর্থ বের করতে অক্ষম। আমাদের রাসূলুল্লাহ (দ:) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি (কুরআন-সুন্নাহ থেকে) ভুল অর্থ বের করে সে কাফের তথা অবিশ্বাসীতে পরিণত হয়। এই মহাবিপদের কারণে এমন কি আইম্মা-এ-মযাহিববৃন্দও সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর কাছ থেকে কুরআন-সুন্নাহ’র মর্মার্থ শিক্ষা করেছিলেন এবং এই সঠিক অর্থের আলোকে এজতেহাদ প্রয়োগ করেছিলেন। এই সঠিক অর্থ ও তার ওপর ভিত্তিশীল সঠিক এজতেহাদগুলোকে অপছন্দ করার মানে হলো দ্বীন ইসলামকেই অপছন্দ করা, যা কাউকে যিনদিক্বে পরিণত করে। ‘যে ব্যক্তি আমার দালিলিক প্রমাণগুলো জানে না, তার কোনো অনুমতি নেই আমার এজতেহাদ অনুযায়ী ফতোওয়া জারি করার’, ইমামুল আযম হযরত আবূ হানিফা (রহ:)-এর এই কথা প্রতীয়মান করে যে ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (রহ:) এটির ওপর ভিত্তি করেই নিজের বক্তব্য পেশ করেছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে ইবনে আবেদীন (রহ:)-এর বইটি নির্ভরযোগ্য ও সঠিক। কোনো ইমাম আল-মযহাবের তাকলীদ বা অনুসরণের মানে কুরআন ও সুন্নাহ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া নয়। এর মানে হলো ইমাম আল-মযহাবের বের করা সঠিক অর্থ অনুযায়ী নিজেদের আমল পালন করা এবং কুরআন-সুন্নাহ হতে ভুল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বের করার অপচেষ্টা না করা। আইম্মা-এ-মযাহিব (মযহাবের ইমাম)-বৃন্দ কুরআন ও সুন্নাহ হতে কীভাবে অর্থ বের করতে হবে তার নীতিমালা ও পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ মযহাবের

অন্তর্গত মুজতাহিদ শিষ্যদেরকে তা শিখিয়েছিলেনও। মুকাল্লিদ (অনুসারী)-গণ, বিশেষ করে ধর্ম সংস্কারকের মতো অতি সাধারণ মুকাল্লিদরা, এই সব নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানা ও বোঝা থেকে এবং এজতেহাদ প্রয়োগের যোগ্যতা থেকে একেবারেই মাহরুম (বঞ্চিত)। ইবনে আবেদীন (রহ:) কখনোই এ কথা বলেন নি মুজতাহিদদের জন্যে কুরআন-সুন্নাহ থেকে আইন-কানুন বের করা হারাম, বরং তিনি বলেছিলেন ধর্ম সংস্কারকের মতো এজতেহাদের পর্যায়ে উন্নীত নয় এমন অজ্ঞদের জন্যে তা করা হারাম। আমাদের মহানবী (দ:) এরশাদ ফরমান, "**যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ থেকে মনগড়া অর্থ বের করে সে কাফের হয়ে যায়**।" ইমাম আল-আযম হযরত আবূ হানিফা (রহ:)-ও বলেন যে এজতেহাদের পর্যায়ে উন্নীত নয় এমন অজ্ঞদের জন্যে ফতোওয়া জারি করার কোনো অনুমতি নেই। ধর্ম সংস্কারক (রশীদ রেযা)-ও এই সত্যটি ওপরে লিখেছে। সুতরাং ইমাম ইবনে আবেদীন (রহ:)-ই সম্পূর্ণ সঠিক। হযরত সাইয়্যেদ আবদুল হাকিম-ই আরওয়াসী, যিনি 'অাল-ওলি আল-কামেল ওয়াল-মোকাম্মেল' (নিজে পূর্ণতাপ্রাপ্ত ওলি এবং অন্যকেও কামেলিয়ত তথা পূর্ণতা দিতে সক্ষম) এবং চার মযহাবের সূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞানী আলেম ছিলেন, তিনি বলেন, "হানাফী মযহাবের অন্তর্গত ফেকাহ'র বইগুলোর মধ্যে (ইবনে আবেদীনের) **'রাদ্দুল মোহতার'** গ্রন্থটি সবচেয়ে উপকারী ও মূল্যবান। এর প্রতিটি কথা-ই একেকটি প্রমাণ; প্রতিটি সিদ্ধান্ত-ই একেকটি দলিল।" ইসলামের এ রকম একখানা মৌলিক কেতাবের কুৎসা রটনাকারী ও অবজ্ঞাকারী ব্যক্তি যিনদিক্ব ছাড়া আর কী-ই বা হতে পারে? ইমাম ইবনে আবেদীন (রহ:) ছিলেন হানাফী মযহাবের একজন মহান আলেম। তিনি তাঁর সমস্ত কথা ও সিদ্ধান্ত সে সকল মুজতাহিদদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন, যাঁরা তা ইমাম আল-আযম (রহ:)-এর কাছ থেকে নিয়েছিলেন; আর এই মহান ইমাম আবূ হানিফা (রহ:) কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই তা নিয়েছিলেন। অতএব, এটি পরিস্ফুট, যে মুসলমান-ব্যক্তি ইমাম ইবনে আবেদীন (রহ:)-এর বর্ণিত আইন-কানুন অনুসরণ করেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে কুরআন-সুন্নাহ'কেই মেনে চলেন। কিন্তু যে ব্যক্তি ইমাম ইবনে আবেদীন (রহ:)-কে অনুসরণ করতে চায় না, সে প্রকৃতপ্রস্তাবে কুরআন-সুন্নাহকে মানে না, বরং নিজের মনগড়া মতবাদ ও নফসানী খায়েশকে অনুসরণ করে থাকে। কুরআন ও হাদীস ঘোষণা করে এ ধরনের লোকেরা জাহান্নামে যাবে। আমরা আবারও বলছি, 'ফেকাহশাস্ত্র থাকতে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার অনুমতি নেই', এই কথাটি ধর্ম সংস্কারকদের বানানো একটি উক্তি। কোনো আলেম বা মুসলমান-ই এ কথা বলেন নি। এটি ধর্ম সংস্কারকদের বইতেই শুধু পাওয়া যায়।

নামাযে (বৈঠকে) আঙ্গুল উঁচু করার প্রসঙ্গে **'মা'আরিফ আস্ সুনান'** গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। বহু বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে এতে আঙ্গুল উঁচু করার পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়। তবে হযরত ইমামে রব্বানী (মোজাদ্দেদে আলফে সানী) নিজ '**মকতুবাত**' পুস্তকের ১ম খণ্ডের ৩১২তম পত্রে মযহাবের নীতিমালা ও পদ্ধতি এবং মুজতাহিদদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিজস্ব গবেষণার দিকে ইঙ্গিত করে আঙ্গুল উঁচু করার পক্ষে হাদীসগুলো লিপিবদ্ধ করার পাশাপাশি এই অনুশীলনকে হারাম ও মকরুহ বর্ণনাকারী বিভিন্ন মূল্যবান ফতোওয়াও তালিকাবদ্ধ করেন। অত্যন্ত শক্তিশালী দলিলাদি দ্বারা তিনি আঙ্গুল উঁচু না করাই বিচক্ষণতাপূর্ণ হবে মর্মে যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি মানবতার মুক্তিদূত হযরত রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর একটি হাদীসের ওপরই নির্ভর করেছেন। 'মকতুবাত' গ্রন্থের এই পত্রটি পরিদৃষ্ট করে কতোটুকু সতর্কতার সাথে ইসলামের ইমামবৃন্দ হাদীস শরীফ অনুযায়ী কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন। ভারত উপমহাদেশের উলেমাদের মধ্যে (অপর) একজন হযরত আহমদ সাঈদ আল-ফারুকী দেহেলভী, যিনি তাসাউফ-শাস্ত্রেও ইমাম ছিলেন, তিনি আঙ্গুল উঁচু করার ব্যাপারে ফকীহ'দের সমস্ত বক্তব্য বিশ্লেষণ করেন।

অতঃপর তিনি নিজ **‘মকতুবাত’** গ্রন্থের ৬৩তম পত্রে লেখেন, “কতিপয় উলেমা এই (আঙ্গুল উঁচু করার) বিষয়ে বেশ অনেকগুলো রওয়ায়াত দেখে এটিকে সুন্নাহ বলে অভিহিত করেন। অপর কিছু আলেম ওই রওয়ায়াতগুলোকে অসংলগ্ন দেখতে পেয়ে আঙ্গুল উঁচু না করার পক্ষে রায় দেন। যখন কোনো বিষয়ে দুই (ধরনের) ফতোওয়া জারি হয়, তখন মুসলমানগণ যে কোনোটি অনুশীলন করতে পারেন। যে ব্যক্তি একটি ফতোওয়া অনুসারে আমল করেন, তিনি অপর ফতোওয়ার অনুসারীকে হেয় প্রতিপন্ন বা সমালোচনা করতে পারবেন না।” অতএব, পরিস্ফুট হলো যে ফেকাহ’র উলেমাবৃন্দ মুসলমানদেরকে একে অপরের মযহাবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আলী আল-কারী কর্তৃক আল-কায়দানীর ফেকাহ-কেতাবের সমালোচনা করা আশ্চর্যের কোনো বিষয় নয়। **‘আল-ফাওয়াইদ আল-বাহিয়্যা’** পুস্তকে লেখা আছে যে তিনি ইমাম শাফেঈ (রহ:) ও ইমাম মালেক (রহ:)-এর মতো ইসলামের স্তম্ভসদৃশ উলেমা-মণ্ডলীর প্রতিও প্রধৃষ্ট মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। শায়খ মোহাম্মদ মিসকিন তাঁর প্রতি যথাযথ উত্তর দেন। আলী আল-কারী একটি আলাদা পুস্তিকা লিখে তাতে মহানবী (দ:)-এর পিতা-মাতার প্রতি কুফরীর অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং স্বরচিত ’শেফা’ গ্রন্থের ব্যাখ্যামূলক পুস্তকে এ ব্যাপারে গর্ব প্রকাশ করেন। এটি নিশ্চিত যে বিভিন্ন বিখ্যাত গ্রন্থের ওপর তাঁর প্রণীত ব্যাখ্যামূলক বই ও পার্শ্বটীকাসমূহ তাঁকে ইসলামের ব্যাপারে কর্তৃত্বশীল করে না। ধর্মে কর্তৃত্বসম্পন্ন হতে হলে অবশ্যই মুজতাহিদ হতে হবে। কোনো অ-মুজতাহিদের দ্বারা মুজতাহিদদেরকে বিচার করার চেষ্টা করা আদবেরই খেলাফ মাত্র।

ইমাম আহমদ রেযা খান (বেসাল ১৩৪০ হিজরী/১৯২১ খৃষ্টাব্দ, ভারত) লেখেন: “আলী আল-কারী নিজস্ব ‘**মিনাহ আর-রওদ**’ পুস্তকে অস্বীকার করেন যে রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর পুণ্যাত্মা পিতা-মাতা বিশ্বাসী (মো’মেন) হিসেবে ইন্তেকাল করেছিলেন এবং তাতে তিনি লেখেন, ‘আমি এটি খণ্ডন করতে একটি আলাদা পুস্তিকা লিখেছি। তাতে আমি কুরআন, সুন্নাহ, কেয়াস ও এজমা’ আল-উম্মাহ হতে প্রামাণিক দলিল পেশ করে ইমাম সৈয়ুতীর তিনটি পুস্তিকায় তিনি যা লিখেছিলেন তা খণ্ডন করি।’ বস্তুত ইমাম সৈয়ুতী (রহ:) ছয়টি পুস্তিকা লেখেন এ বিষয়টি প্রমাণ করতে যে হুযূর পূর নূর (দ:)-এর পুতঃপবিত্র পিতা-মাতা ঈমানদার হিসেবে ইন্তেকাল করেন। এই বিষয়টি আসলে ফেকাহ’র কোনো বিষয় নয়; অর্থাৎ, এটি এমন কোনো শিক্ষা নয় যাকে **‘আফ’আল আল-মোকাল্লাফীন**’-এর অন্তর্ভুক্ত করা চলে এবং হালাল, হারাম, সহীহ বা ফাসিদ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। অতএব, এক্ষেত্রে কোনো কেয়াস বা এজমা’ নেই। এই বিষয়ে উলেমাবৃন্দের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। মহান ইসলামী আলেম ইমাম সৈয়ুতী (রহ:)-ই সম্পূর্ণ সঠিক। এটিও আশ্চর্যের বিষয় যে আলী আল-কারী দাবি করেন তিনি কুরআন মজীদ থেকে প্রমাণ পেশ করেছিলেন। অথচ আল-কুরআান এ ব্যাপারে কোনো কিছুই উল্লেখ করেনি, প্রকাশ্যেও নয়, রূপকভাবেও নয়। উপরন্তু, কতিপয় আয়াতের নাযেল হবার কারণ হিসেবে এই ধরনের বিষয়গুলোর মধ্যে সাযুজ্য দেখাতে কাউকে এর সমর্থনে হাদীসও পেশ করতে হয়। ইমাম সৈয়ুতী (রহ:) এতো বড় মাপের আলেমে দ্বীন যে তাঁর সাথে আলী আল-কারীর মতো আলেমদের তুলনা-ই চলে না। তিনি হাদীসগুলোর মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে এবং সেগুলোর ‘ইল্লা, রিজাল ও আহওয়াল জানার ক্ষেত্রে আলী আল-কারীর মতো আলেমদের চেয়ে এতোই খোদায়ী আশীর্বাদধন্য ছিলেন যে তাঁর লেখনীর সামনে উক্ত আলেমদের চুপ থাকা বা আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর গত্যন্তর-ই ছিল না। এই মহান ইমাম তাঁর লেখনীকে একচেটিয়া ও স্তব্ধকারী দালিলিক প্রমাণসমূহ দ্বারা সমৃদ্ধ করেন। যদি পাহাড় তাঁর প্রামাণ্য দলিলের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে উপলব্ধি করতে সক্ষম হতো, তাহলে তাও গলে যেতো।” [**আল-মোস্তানাত আল-মো’তামাদ**]

৩৭/ – ধর্ম সংস্কারক (রশীদ রেযা) ১১তম সংলাপের শুরুতে ধর্ম প্রচারকের পক্ষ হয়ে লিখেছে:

“আমাদের নিজেদের মযহাবের বইপত্র ছাড়া অন্যান্য বইপত্রে আমরা যা দেখতাম তার দিকে নজর করা বা সে অনুযায়ী আমল পালন করা আমাদের জন্যে নিষিদ্ধ ছিল। বস্তুতঃ আমাদেরকে বলা হয়েছিল কামাল ইবনে হুমাম যিনি মুজতাহিদ ফীল মযহাব (মযহাবের অন্তর্গত মুজতাহিদ) ছিলেন, তাঁর যে সব লেখনী মযহাবের নিয়ম-কানুনের বিরোধী হবে সেগুলোর অনুসরণও করা যাবে না, যদিও বা সেগুলো শক্তিশালী দলিলনির্ভর হয়ে থাকে।” [‘মুহাওয়ারাত’]
দ্বীন ইসলামের কোনো ধর্ম প্রচারকের পক্ষে কি এ ধরনের উদ্ভট ও অসত্য বিবরণ প্রদান করা কখনো সম্ভব? কিন্তু ধর্ম সংস্কারক আহল্ আস্ সুন্নাহ’কে আক্রমণ করার সময় এতোই রাগান্বিত ও প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে যায়, সে শুধু জ্ঞান ও ভদ্রতার সীমাই তখন ছাড়িয়ে যায় না, রাগের মাথায় বিচার-বিবেচনা ও হুঁশ-জ্ঞানও তার ওই সময় লোপ পায়। এখানে ধর্ম সংস্কারক ’এলম আল-উসূল আল-ফেকাহ’র সূক্ষ্ম বিষয়গুলোর মধ্যে একটি সম্পর্কে আলোকপাত করেছে, যাকে নিম্নে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যায়: চার মযহাবের ফুকাহা (ফেকাহবিদ)-মণ্ডুলী সাতটি স্তরে বিন্যস্ত ছিলেন। প্রথম স্তরে ছিলেন **‘মুজতাহিদ ফীশ্ শার’**। এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন চার আইম্মা-এ-মযাহিব। তাঁরা নিজ নিজ মযহাবের পদ্ধতি (উসূল) ও নীতিমালা (কাওয়াঈদ) প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয় স্তরে ছিলেন ’**মুজতাহিদ ফীল্ মযহাব**’। এঁরা ছিলেন কোনো মযহাবের অন্তর্গত মুজতাহিদ, যেমন নাকি ইমামুল আ’যম (রহ:)-এর শিষ্যবৃন্দ, যাঁরা তাঁরই প্রতিষ্ঠিত নীতির ভিত্তিতে দলিল হতে আইন-কানুন বের করতেন। তৃতীয় স্তরে ছিলেন ’**মুজতাহিদ ফীল্ মাসা’ইল**’, যাঁরা সে সব বিষয়ে আইন-কানুন বের করতেন যেগুলো ইমাম আল-মযহাব ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ উল্লেখ করেননি। তবে এঁরা তাঁদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করতে পারতেন না। আত্ তাহাবী (রহ:), আবূল হাসান আল-কারখী (রহ:), শামসুল আইম্মা আল-হালওয়ানী, শামসুল আইম্মা আস-সারাহসী ও কাযী খান এই পর্যায়ভুক্ত ছিলেন। চতুর্থ স্তরের মধ্যে ছিলেন ‘**আসহাব আত্ তাখরিজ**’, যাঁরা মুজতাহিদ ছিলেন না। তাঁরা কেবল সংক্ষিপ্ত বিবৃতিগুলো ও মুজতাহিদদের অস্পষ্ট সিদ্ধান্তগুলো ব্যাখ্যা করতেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী এই পর্যায়ভুক্ত ছিলেন। পঞ্চম স্তরে ছিলেন ‘**আসহাব আত্ তারজিহ**’। এঁরা বিভিন্ন রওয়ায়াতকে সেগুলোর নির্ভরযোগ্যতার ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করতেন। আল-কুদুরী ও ‘**আল-হেদায়া**’ গ্রন্থপ্রণেতা আল-মারগিনানী এই স্তরের ছিলেন। ষষ্ঠ স্তরে ছিলেন ‘**আসহাব আত্ তাময়িয**’, যাঁরা কাওয়ী, যয়ীফ, যাহের ও নাদের বর্ণনাগুলোর একে অপরের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করতেন। ’**কানয**’, ‘**মোখতার**’ ও ’**বেকায়া**’ গ্রন্থগুলোর রচয়িতাবৃন্দ এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। সপ্তম স্তরের আলেমগণ এগুলোর কোনোটি-ই করতে পারতেন না; মযহাবের সাথে মতপার্থক্যকারী কোনো ফতোওয়া তাঁদের কেউই জারি করতে পারতেন না, শুধুমাত্র জরুরি প্রয়োজন বা অসুবিধা দেখা দিলেই তাঁরা তা করতে পারতেন।

ধর্ম সংস্কারক ওপরে প্রদত্ত তথ্যকে বিকৃত করে এবং দাবি করে যে নিজের মযহাব ভিন্ন অন্য মযহাবের বইপত্র পড়া বা তা অনুযায়ী আমল পালন করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। অথচ ওপরে উল্লেখিত উলেমাবৃন্দের মতোই যে কোনো মুসলমান তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো মযহাবের বইপত্র পড়তে এবং তা থেকে জ্ঞান শিক্ষা করতে পারবেন। তিনি চাইলে এক মযহাব থেকে অন্য মযহাবে চলেও যেতে পারবেন। অসুবিধার সময়, অর্থাৎ, জরুরি প্রয়োজনের মুহূর্তে যে কেউ তাঁর নিজ মযহাবের রুখসাত তথা সহজ পন্থাগুলো অনুশীলন করতে সক্ষম হবেন। যদি তিনি তা করতে না পারেন, তবে তিনি অন্য কোনো মযহাবের রুখসাত পালন করে অসুবিধা দূর করতে পারবেন। তবে অন্য মযহাব অনুযায়ী কোনো কাজ করার সময় তাঁকে অবশ্যই সেই মযহাবের ওই কাজ সংক্রান্ত আদেশ ও নিষেধ মেনে চলতে হবে। এই কারণে সেই মযহাবের এতদসংক্রান্ত বিধানগুলো তাঁর

জানা অত্যাবশ্যক। ইবনে আবেদীন (রহ:) নিজ **‘রাদ্দুল মোহতার’** গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের শুরুতে লেখেন যে ইবনে হুমাম ছিলেন ‘আসহাব আত্ তারজিহ’র অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, ধর্ম সংস্কারকের দাবি অনুযায়ী তিনি মুজতাহিদ মোতলাক্ব হওয়া তো দূরে, এমন কি মুজতাহিদ-ও ছিলেন না। অন্য যে কোনো মুকাল্লিদের মতো তাঁকেও কোনো একটি মযহাবের অনুসরণ করতে হয়েছে। ধর্ম সংস্কারক ইতিপূর্বে বলেছিল যে ইবনে আবেদীনের মতো উলেমাবৃন্দ ছিলেন ‘অনুকরণকারীদের অনুকরণকারী’, কেননা তাঁরা ইবনে হুমামের মতো মুকাল্লিদদের অনুসরণ করেন। আর এখন সে ইবনে আবেদীনের মতো আলেমদেরকে দোষারোপ করছে যে তাঁরা ইবনে হুমামের মতো আলেমদের অনুসরণ করেননি কেন। আহলুস্ সুন্নাহকে হেয় প্রতিপন্ন করতে সে যে কী করবে তাও বুঝে উঠতে পারছে না! সুন্নী উলেমাবৃন্দের লেখা বইপত্র সব বিষয় সহজভাবে বিবৃত করে। উদাহরণস্বরূপ, মহান আলেমে দ্বীন ইমাম ইবনে হাজর মক্কী (রহ:) তাঁর **‘আল-ফাতাওয়া আল-হাদিসিয়্যা’** শীর্ষক গ্রন্থে এক মযহাবের অনুসারী অন্য মযহাবের অনুসরণ করতে পারবেন কি-না তা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লেখেন:
”ইমাম আবূল হাসান আলী সুবকী (রহ:)-এর মতে অন্য মযহাবকে অনুসরণের সাতটি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টান্ত বিদ্যমান: **১**/ কেউ যদি এ মর্মে অন্তরে প্রত্যয় পোষণ করেন যে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে তাঁর মযহাবের চেয়ে অন্য কোনো মযহাবের এজতেহাদ আরও অধিক নির্ভরযোগ্য, তাহলে সেই মযহাব অনুযায়ী উক্ত বিষয়ে আমল পালন করা তাঁর জন্যে অনুমতিপ্রাপ্ত। **২**/ যে ব্যক্তি বুঝতে পারেন না কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে দুইটি মযহাবের উভয় ইমামের মধ্যে কে সঠিক এজতেহাদ প্রয়োগ করেছেন, তিনি উভয় মযহাবের যে কোনোটি অনুযায়ী ওই আমল পালন করার ক্ষেত্রে অনুমতিপ্রাপ্ত। **৩**/ যদিও কারো জরুরি প্রয়োজনের কোনো কাজে অন্য মযহাবের রুখসাত তথা সহজ পন্থা পালনের অনুমতি রয়েছে, তথাপি তিনি উভয় মযহাবের দুইজন ইমামের মধ্যে যাঁর দলিলকে শক্তিশালী বলে বিশ্বাস করেন তাঁকে অনুসরণ করা তাঁর জন্যে ওয়াজিব। **৪**/ জরুরি প্রয়োজন ব্যতিরেকে এবং কোন্ এজতেহাদটি বেশি শক্তিশালী না জেনে সহজ পন্থা অবলম্বনের খায়েশে অন্য মযহাব অনুসরণের কোনো অনুমতি-ই নেই। **৫**/ বিভিন্ন মযহাবের রুখসাতগুলো একত্র করে নিজের যাবতীয় আমল পালনের কোনো অনুমতিও কারো নেই; কেননা তা ইসলাম ধর্মেরই খেলাফ। **৬**/ ঐকমত্য অনুসারে কোনো আমলের বেলায় একাধিক মযহাবের বিধানানুযায়ী তা পালন করার অনুমতি নেই, যদি তা যে কোনো একটি মযহাবে সহীহ বলে সাব্যস্ত না হয়। কামাল ইবনে হুমাম একে অনুমতিপ্রাপ্ত বলাটি যয়ীফ (দুর্বল/সম্ভাব্য নয়)। **৭**/ কোনো মযহাবের বিধানানুযায়ী পালিত কাজের প্রভাব থাকতে থাকতে অন্য মযহাব অনুসরণের কোনো অনুমতি নেই। উদাহরণস্বরূপ, হানাফী মযহাবে ‘শুফ’আ’ (কোনো বাড়ি বা জমির শরিকদার অথবা নিজ সম্পত্তির সাথে যুক্ত সম্পত্তি বলে তা ক্রয়ের অগ্রাধিকার-ই শুফ’আ; বিস্তারিত জানতে দেখুন আমার লেখা **Endless Bliss**, ২য় খণ্ড)-এর অধিকার আছে বিধায় কেউ যদি তাঁর প্রতিবেশির বাড়ি ওর পূর্ববর্তী ক্রেতার কাছ থেকে কিনে নেন, তাহলে তিনি আর এই বাড়ির কোনো ব্যাপারেই শাফেঈ মযহাবের অনুসরণ করতে পারবেন না।”

৩৮/ – ধর্ম সংস্কারক বলে: “কোনো মুকাল্লিদকে অনুসরণ করা হারাম। যে ব্যক্তি একটি হাদীস শুনেছেন, তাকে এ কথা বলা যাবে না যে অমুকের এজতেহাদের সাথে সেটির তুলনা করে এজতেহাদ হাদীসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলে সেই অনুযায়ী আমল পালন করতে হবে। সেটি মনসুখ (রহিত) কিনা তা অনুসন্ধান করতেই শুধু তাকে বলা যাবে। কিন্তু এই কাজ তো একজন বিশেষজ্ঞের। যারা তা নন, তাদেরকে নিম্নের আয়াতটি মেনে চলতে হবে, “**যারা জানে না, তাদের**

উচিত জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করে শেখা।” অর্থাৎ, জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে। সকল মুজতাহিদ ইমামের প্রতি প্রত্যেকের মহব্বত রাখা ভাল; আর সুন্নাহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নিশ্চিত হলে তাঁদের প্রত্যেককে সে সব (এজতেহাদের) ক্ষেত্রে অনুসরণ করা উচিত।” [রশীদ রেযা রচিত ‘মুহাওয়ারাত’]

কোনো মুকাল্লিদকে অনুসরণ করা অবশ্যই হারাম। কিন্তু কোনো মুকাল্লিদ-মুসলমানের দেয়া তথ্যের ওপর আস্থা রেখে সেই অনুযায়ী আমল পালন করার মানে তাঁকে অনুসরণ করা নয়। কাউকে এ কথা বলা যাবে না, “অমুকের এজতেহাদের সাথে এই হাদীসটির তুলনা করে এজতেহাদ হাদীসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলে সেই অনুযায়ী আমল পালন করো।” তবে তাকে বলা যাবে, “আপনার মযহাবের ইমামের এজতেহাদের সাথে এই হাদীসটি হতে আপনি যা বোঝেন তার তুলনা করুন। যদি এ দুইয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য পান, তাহলে হাদীস হতে নিজে যা বোঝেন সেই অনুযায়ী নয়, বরং আপনার মযহাবের ইমাম যেভাবে বুঝেছিলেন, সেভাবে অনুশীলন করুন।” মহান ভারতীয় আলেম-এ-হক্কানী মওলানা সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ:), যিনি ১২২৫ হিজরী/১৮১০ খৃষ্টাব্দ সালে বেসালপ্রাপ্ত হন, তিনি ১১৯৭ হিজরী সালে তাঁর প্রণীত ‘**তাফসীরে মাযহারী**’ গ্রন্থে সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতের তাফসীরে বলেন, “কেউ যদি একটি সহীহ হাদীস পান, আর যদি তা মনসুখ নয় বলে জ্ঞাত হয়ে থাকে, এবং যদি, উদাহরণস্বরূপ, ইমামুল মাযহাব হযরত আবূ হানিফা (রহ:)-এর কোনো একটি ফতোওয়া ওই হাদীসের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয় কিন্তু বাকি তিন মযহাবের কোনো একটির এজতেহাদ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে হানাফী মযহাবের অনুসারী (আলেম হতে হবে) মুকাল্লিদকে নিজ মযহাবের ইমামের ফতোওয়া অনুশীলন না করে হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অপর ইমামুল মযহাবের এজতেহাদ অনুযায়ী ওই হাদীসের ওপর আমল পালন করতে হবে [ইমাম আবূ হানিফা (রহ:) এ ধরনের হাদীসগুলোতে তাওয়িল তথা অস্পষ্ট অর্থ বা ভিন্নতর ব্যাখ্যা দেখে স্পষ্ট অর্থবোধক হাদীসের অনুসরণ করেন; কোনো একটি মযহাব একটি হাদীস অনুসরণ করে থাকলে, আমাদেরও তা মেনে চলতে হবে – আল্লামা ইশিক]। কেননা, ইমামুল আ’যম বলেছেন, ’তোমরা (অবশ্যই আলেম হতে হবে) কোনো সহীহ হাদীস বা সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর কোনো আসার (বাণী) পেলে, আমার ফতোওয়াকে রেখে তার অনুসরণ করবে!’ ফলে এতে কেউ এজমা’র অবজ্ঞাকারী বলে সাব্যস্ত হবে না, কারণ ৪র্থ ইসলামী শতকের পরে উলেমা-এ-আহল-এ-সুন্নাত এই চার মযহাব ছাড়া আর অন্য কোনো মযহাবকে পাননি। সুন্নী মুসলমানদের জন্যে এবাদত পালনের বেলায় এই চার মযহাব ভিন্ন অন্য কোনো মযহাব নেই। এজমা’ অনুযায়ী, এই চার মযহাবের যে কোনো একটির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কথাবার্তা বাতেল বা ভ্রান্তি বলে পরিগণিত হবে। একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (দ:) এরশাদ ফরমান, ’**উম্মাহ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে বিবৃত বিষয়/বাণী দালালাত (গোমরাহী) বা মিথ্যে হতে পারে না**।’ সূরা নিসার ১১৫ নং আয়াতে এরশাদ হয়েছে, ‘**ঈমানদারদের পথ হতে বিচ্যুত ব্যক্তিকে আমি (খোদা) জাহান্নামে ছুঁড়ে ফেলবো**।’ চার মযহাবের ইমামমণ্ডলী ও তাঁদের দ্বারা প্রশিক্ষিত মহান উলেমাবৃন্দের পক্ষে এমন কি একটি হাদীসও বাদ দিয়ে যাওয়া অসম্ভাব্য ও অসম্ভব ছিল। যদি তাঁদের কেউই কোনো একটি নির্দিষ্ট হাদীস অনুসরণ না করে থাকেন, তবে সেটি হয় মনসুখ (রহিত), নয়তো তাওয়িল (অস্পষ্ট)” [মওলানা পানিপথী]। অতএব, কেউ ইমামুল মযহাবের এজতেহাদের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হাদীস পেলে তার বলা উচিত, “ইমাম সাহেব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই হাদীস মনসুখ অথবা তাওয়িল”; কিন্তু এ কথা বলা যাবে না, “ইমাম সাহেব এই হাদীস শোনেননি বা অনুসরণ করেননি।” ধর্ম সংস্কারক

ইতিপূর্বে ৩০তম অনুচ্ছেদে বলেছিল, “**জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করে শেখো যা তোমরা জানো না**, এই আয়াতটি হতে উসূলের উলেমাদের দ্বারা তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা নিরর্থক ও ভিত্তিহীন যুক্তি।” কিন্তু এখানে সে বলছে, “যারা বিশেষজ্ঞ নন, তাদেরকে নিম্নের আয়াতটি মেনে চলতে হবে, ’**যারা জানে না, তাদের উচিত জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করে শেখা**।’ অর্থাৎ, জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে।”

৩৯/ – ধর্ম সংস্কারক (তার বইয়ে) বারোতম সংলাপ নিয়ে শব্দ-কৌতুক পরিবেশন করে মুসলমানদের ধোকা দেয়ার উদ্দেশ্যে বলে: “ইমাম শাফেঈকে কেউ একজন প্রশ্ন করলে তিনি জবাবে যখন বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (দ:) এ কথা এরশাদ ফরমান’, তখন ওই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন, ‘আর আপনিও তো তাঁর এই সিদ্ধান্ত মানেন, তাই নয় কি?’ এমতাবস্থায় ইমাম শাফেঈ বলেন, ‘যদি আমি মহানবী (দ:) হতে আমার কাছে (পরম্পরায়) আগত হাদীসকে সম্মান না করি, তবে এ জমিনের কোন্ অংশ আমাকে গ্রহণ করবে?’ অতএব, ইমামবৃন্দ তাকলীদ নিষেধ করেছেন এবং এজতেহাদের দ্বার উম্মোচন করেছেন। কোনো হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক এজতেহাদকে পরিহার করতে হবে। ইমাম শাফেঈ সব সময়ই বলতেন, ‘তোমরা কোনো সহীহ হাদীস পেলে আমাকে জানাবে, যাতে আমি সেই অনুযায়ী অনুশীলন করতে পারি!’ তাই হাদীসের সাথে দ্বিমত পোষণকারী কোনো কথা ইমাম শাফেঈ‘র প্রতি আরোপ করার কোনো অনুমতি-ই নেই। ইযয আদ্ দ্বীন ইবনে আব্দিস্ সালাম, যিনি ‘সুলতানুল উলামা’ (উলেমাবৃন্দের সরদার) হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি বলেন, ‘কতো আশ্চর্যজনক সেই ফকীহ’র আচরণ, যিনি অপর কোনো মযহাবের ইমাম নিশ্চিতভাবে সঠিক এজতেহাদ প্রয়োগ করেছেন জেনেও নিজ মযহাবের দুর্বল সিদ্ধান্তকে একগুঁয়েভাবে মেনে চলেন; আর তিনি মনে করেন যে বাস্তবতা ও সঠিক সিদ্ধান্ত কেবল তার মযহাবের ইমামেরই নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বাধীন। এ সকল লোকের চোখ তাকলীদ দ্বারা এমনভাবে বাঁধা হয়েছে যে তারা আজ এ অবস্থায় অধঃপতিত। এদের সাথে সালাফ আস্ সালেহীনের কোনো সাযুজ্য-ই নেই’।” [রশীদ রেযা কৃত ‘মুহাওয়ারাত’]

রশীদ রেযা এরপর ধর্ম প্রচারকের মুখ দিয়ে বলায়: “এই মহান আলেমের (ইমাম ইযয আদ্ দ্বীন) কথা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু বেশির ভাগ ফুকাহা-ই নিজেদের মযহাবের চক্করে পড়ে আছেন। এই সব লোক ‘মোহাম্মদী’ হওয়ার চেয়ে ‘হানাফী’ বা ‘শাফেঈ’ হওয়াকেই বেশি পছন্দ করে।” [‘মুহাওয়ারাত’]

ধর্ম সংস্কারক (রশীদ রেযা) এখানে নিজের কথারই দৃঢ়োক্তি করেছে। অবশ্য এ রকম-ই তো হওয়া চাই ফ্রী-মেইসন অপকৌশল! নতুবা কীভাবে সারা পৃথিবীতে তারা বিস্তৃত হয়েছে? তাদের এই ধোকাপূর্ণ নীতি ও মিথ্যের বেসাতি ছাড়া কীভাবে এটি সম্ভব হতো? কিন্তু এলম-এ-হাল বইপত্র যে সকল মুসলমান পড়েছেন, তাঁদেরকে তারা ধোকা দিতে পারবে না। উলেমা-এ-আহল-এ-সুন্নাত (সুন্নী উলেমাবৃন্দ) এই সব লোকদের ধূর্ততাপূর্ণ লেখনীর উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন নিজেদের বইপত্রে; আর তাদেরকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যানও করেছেন। তাঁদের মূল্যবান বইগুলোর মধ্যে একটি হলো মওলানা ইউসূফ নাবহানী (রহ:) প্রণীত ‘**হুজ্জাত-আল্লাহি আ’লাল আ’লামীন**’ (আমাদের **Belief and Islam** পুস্তকের ৪৯-৫৫ পৃষ্ঠায় এর অনূদিত অংশ বিদ্যমান)। তবে আশংকা করা হয় যে যারা সুন্নী উলামাদের দেয়া এ সকল জবাব জানেন না বা তাঁদের বইপত্র পড়েননি, তারা লা-মযহাবী/’সালাফী’দের ধোকায় পড়ে অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে পারেন। এ কারণেই আমরা কলম ধরেছি। ধর্মীয় পদে অধিষ্ঠিত তরুণরা যাতে এই ধ্বংসাত্মক ঝড়ো হাওয়ার কবলে পড়ে বিলীন

হয়ে না যান, সে জন্যে আমরা এ সব মিথ্যের জবাব দিতে বাধ্য হয়েছি। এতদুদ্দেশ্যে আমরা '**শওয়াহিদুল হক্ক**' ও '**সিহাম আস্ সা'য়বা লি আস'হাবিদ্ দা'য়াউইল কাযিবা**' বইগুলো থেকে উদ্ধৃতিসমূহ আমাদের বিভিন্ন পুস্তকে পেশ করা যথাযথ বিবেচনা করেছি।

ইমাম শাফেঈ (রহ:) যেমনটি বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমান-ই প্রতিটি সহীহ হাদীস মান্য করেন। এমন কোনো মুসলমান নেই যিনি এ বিষয়টি সম্পর্কে অনবধান। ধর্ম সংস্কারক কর্তৃক তার নানা অভিযোগের সমর্থনে এই বক্তব্য পেশ করাটি সত্যি আজব; বস্তুতঃ সে একে মুখোশ হিসেবেই ব্যবহার করেছে। অথচ এর সাথে তাকলীদ বা এজতেহাদের কোনো সম্পর্ক-ই নেই। এ কথা যে কোনো মুসলমান-ই বলবেন।
ধর্ম সংস্কারকের আরেকটি বারংবার উচ্চারিত কুৎসা হলো, 'কোনো হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক এজতেহাদকে পরিহার করতে হবে।' আইম্মা-এ-মযাহিব (চার মযহাবের ইমামবৃন্দ) যখন এজতেহাদ প্রয়োগ করতেন, তখন এমন কিছু হাদীস ছিল যেগুলো তাঁদের জ্ঞাত ছিল না। ওই সব হাদীস জ্ঞাত হবার পরে তাঁদের মুজতাহিদ শিষ্যবৃন্দ ওগুলোর সাথে ভিন্নমত পোষণকারী ইমামবৃন্দের এজতেহাদকে পরিহার করেন। কেননা, চার মযহাবের চারজন ইমাম-ই তাঁদেরকে এ রীতি মেনে চলতে আদেশ করেছিলেন। ধর্ম সংস্কারকের ওপরের উদ্ধৃতিতেও ইমাম শাফেঈ (রহ:)-এর অনুরূপ আদেশ বিধৃত হয়েছে। যেহেতু এখন আর কোনো নতুন হাদীস পাওয়া যাচ্ছে না, সেহেতু এজতেহাদের সাথে সাংঘর্ষিক হাদীসের প্রশ্ন-ই ওঠে না। সমস্ত হাদীস-ই বর্ণিত হয়েছে। ইসলামের মৌলিক কেতাবসমূহে সহীহ হাদীসের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো হাদীস লিপিবদ্ধ নেই। এমন কিছু হাদীস ছিল যেগুলো থেকে মুজতাহিদবৃন্দ আইন-কানুন বের করেননি; এগুলো তাঁরা বাদ দিয়েছিলেন মনসুখ (রহিত) হবার কারণে; অথবা এগুলোর রাবী (বর্ণনাকারী)-রা নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। এগুলোর সাথে অবশ্যই বিভিন্ন এজতেহাদের পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু ওই সব এজতেহাদ সহীহ হাদীসের ভিত্তিতেই প্রয়োগ করা হয়েছিল।

হযরত সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ:) ১১৯৭ হিজরী সালে লেখেন: "আল্লাহতা'লা এরশাদ করেছেন, '**উলুল আমরকে মান্য করো**।' এ কারণে ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আলেম-উলেমা, আউলিয়া কেরাম, সুলতান ও সরকারের আদেশ-নিষেধগুলো মেনে চলা ওয়াজিব। আর ইসলামের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বিষয়ে আজ্ঞাসমূহ মানার মানে হলো আল্লাহর সাথে শরীক করা। আল-বোখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেন হযরত আলী (ক:)-এর বাণী, যিনি বলেন: '(অসঙ্গতিপূর্ণ) কোনো আজ্ঞা মান্য করা গুনাহ; কেবল ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রেই মানা উচিত।' একটি হাদীস শরীফে মহানবী (দ:) এরশাদ ফরমান, '**স্রষ্টার প্রতি অবাধ্যতা সংঘটিত হয় এমন কোনো বিষয়ে সৃষ্টিকে মানা অনুচিত**।' স্রষ্টার প্রতি অবাধ্যতা নয় এমন রাষ্ট্রীয় হুকুম ও আইন-কানুনের বিরোধিতা করা বা সেগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কোনো অনুমতি-ই নেই। ফিতনা (গণ্ডগোল, বিভেদ) সৃষ্টি করা মহাপাপ। মুসলমান যেমন তাঁর স্রষ্টার অবাধ্য নন, তেমনি রাষ্ট্রপক্ষের আইন-কানুনেরও অমান্যকারী নন। তিনি পাপ বা অপরাধ সংঘটন করেন না। এটি সর্বদা অর্জন করা খুব-ই সহজ। ধরা যাক, যদি কোনো হানাফী মনসুখ হয় নি এমন একখানি সহীহ হাদীস শিক্ষা করেন, এবং জানতে পারেন যে ইমামুল আ'যম আবূ হানিফা (রহ:)-এর এজতেহাদ উক্ত হাদীসের সাথে দ্বিমত পোষণ করে, আর চার মযহাবের কোনো একটির এজতেহাদ ওই হাদীসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তাহলে তাঁর ওই হাদীসকে অনুসরণ করা ওয়াজিব হবে। হাদীসকে

অনুসরণ না করলে তিনি ইমামুল আ'যমকে আল্লাহর সাথে শরিক করার দায় বহন করবেন।
ইমামুল আ'যম হযরত আবূ হানিফা (রা:) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর প্রতিটি হাদীসকেই আমি মহা সম্মান করি। আসহাব-এ-কেরাম (রা:)-এর বাণীকেও আমি মূল্যায়ন করি। তাবেউন (রহ:)-বৃন্দের কথা যেন আমাদেরই ভাষ্য।' ইমাম সাহেবের এ কথা ইমাম বায়হাকী (রহ:) তাঁর '**আল-মাদখাল**' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন। '**রওদাত আল-উলামা**' পুস্তকে ইমামুল আ'যমের বাণী উদ্ধৃত হয়েছে; তিনি বলেন: 'মহানবী (দ:)-এর কোনো হাদীস বা কোনো সাহাবী (রা:)-এর আসার তথা বাণী পেলে তোমরা আমার কথা অগ্রাহ্য করবে।'
"ওপরে আমরা ইমামুল আ'যমের এজতেহাদ বাদ দিয়ে সহীহ হাদীসকে অনুসরণের জরুরাত (প্রয়োজনীয়তা) ব্যাখ্যাকালে বলেছি, '(তা করা সম্ভব) যদি চার মযহাবের কোনো একটির এজতেহাদ ওই হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।' কেননা, ওই সহীহ হাদীসের সাথে খাপ খায় এমন কোনো এজতেহাদ না থাকলে কিন্তু আমরা এজমা' আল-উম্মাহ হতে বিচ্যুত হবো। ইসলামী তৃতীয় বা চতুর্থ শতকের পরে শুধুমাত্র এই চার মযহাব-ই টিকে গিয়েছে; অন্যগুলো বিস্মৃত হয়েছে। ইসলামী জ্ঞান বিশারদমণ্ডলী সর্বসম্মতভাবে বর্ণনা করেছেন যে চার মযহাবের কোনো একটির সাথে ভিন্নমত পোষণকারী কোনো বাণী/বিবরণ-ই সহীহ নয়। হুযূর পূর নূর (দ:) এরশাদ ফরমান, '**লা তাজতামিউ উম্মাতী আলাদ্ দালালাত**', মানে '**ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত আমার উম্মতের কোনো সিদ্ধান্ত/কথা গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা হতে পারে না**।' আল্লাহতা'লা তাঁর কালাম-এ-পাকের সূরা নিসায় এরশাদ ফরমান, '**আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের পথ থেকে আলাদা পথে চলে, আমি তাকে তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবো এবং তাকে দোযখে প্রবেশ করাবো; আর তা প্রত্যাবর্তন করার কতোই মন্দ স্থান**' (১১৫ নং আয়াত)। এটি ভালভাবে জ্ঞাত হওয়া উচিত যে, সহীহ হাদীসগুলো আমাদের আইম্মা-এ-মযাহিব ও তাঁদের শিষ্যদের মধ্যে মহান উলামাবৃন্দ না দেখা বা না শোনা একেবারেই অসম্ভব। যদি ওই মহান ইসলামী পণ্ডিতদের কেউই ও রকম একটি হাদীসের ওপর ভিত্তি করে এজতেহাদ প্রয়োগ না করে থাকেন, তবে ওই হাদীসটি অন্য কোনো হাদীস দ্বারা মনসুখ বা রহিত হয়েছে; কিংবা তা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। তাসাউফের (সূফীশাস্ত্রের) কোনো পীর/মোর্শেদ-ই চার মযহাব হতে বিচ্যুত হননি। চার মযহাব হতে বিচ্যুত হবার মানে হলো দ্বীন ইসলাম থেকেই বিচ্যুতি।" [মওলানা সানাউল্লাহ পানিপথী কৃত '**তাফসীর আল-মাযহারী**', সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা]
প্রত্যেক মুসলমানকেই চার মযহাবের কোনো একটির অনুসারী হতে হবে ('**বাহর আর-রা'ইক**', '**হিন্দিয়্যা**' ও '**আল-বাসা'ইর**' গ্রন্থগুলোতে লেখা আছে, অ-মুজতাহিদ প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে চার মযহাবের যে কোনো একটির অনুসারী হওয়া ওয়াজিব; কেউ অনুসরণ না করলে আহল্ আস্ সুন্নাহ'র অন্তর্ভুক্ত থাকবে না; অধিকন্তু, ওই লোক আহল্ আস্ সুন্নাহ'র মধ্যে না থাকার দরুন গোমরাহ-পথভ্রষ্ট বা বে-ঈমান হয়ে যাবে। এ সব সংশ্লিষ্ট লেখনী ইস্তাম্বুল থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে)।
কোনো ইমাম আল-মযহাবের এজতেহাদের সাথে সামঞ্জস্যহীন একখানি হাদীস পাওয়া গেলে এটি জানা থাকা উচিত যে ওই হাদীস ইমাম আল-মযহাব বা তাঁর শিষ্য মুজতাহিদবৃন্দ দেখেছিলেন, আর সেটিকে তাঁরা মনসুখ (রহিত) বা দালিলিক প্রমাণে অনির্ভরযোগ্য পেয়েছিলেন। আরও জ্ঞাত হওয়া উচিত যে সংশ্লিষ্ট এজতেহাদটি অন্য কোনো সহীহ হাদীসের ভিত্তিতেই গৃহীত হয়েছিল। অতএব, আহলে সুন্নাতের বইপত্রে লেখা হয় নি এমন কোনো সহীহ হাদীস আজ আর অস্তিত্বশীল নেই। এ কথা বিস্মৃত হওয়া চলবে না যে ভুল এজতেহাদ প্রয়োগের জন্যে মুজতাহিদবৃন্দ এবং তাঁদের অনুসারীরা সওয়াব পাবেন। বর্তমানে সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক চার মযহাবের কোনো এজতেহাদ নেই। ইবনে আবেদীন ('**রাদ্দুল মোহতার**' গ্রন্থের) 'ওযূ' অধ্যায়ের প্রারম্ভে লেখেন,

“মুজতাহিদ-মণ্ডলীর বর্ণনাসমূহের দলিল-প্রমাণ তালাশ করা প্রয়োজনীয় নয়।” মুসলমানদেরকে মুজতাহিদবৃন্দের প্রামাণিক দলিল অন্বেষণ বা অধ্যয়ন করতে আদেশ করা হয়নি। তাঁদেরকে শুধু মুজতাহিদদের অনুসরণ করতেই বলা হয়েছে। ওপরের আয়াতে করীমা এই বাস্তবতাকে পরিস্ফুট করেছে। এই কারণেই কোনো এজতেহাদকে অস্বীকার করার অনুমতি নেই। অস্বীকার করলে সেটি যে আয়াত বা হাদীসের ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছিল, তাকেই অস্বীকার করা হয়। প্রত্যেকেরই এ মর্মে প্রত্যয় পোষণ করা উচিত যে তাঁর মযহাব-ই সঠিক। যে আলেম (মুজতাহিদ) বুঝতে পারেন যে তাঁর মযহাবের চেয়ে অন্য কোনো মযহাবের এজতেহাদ অধিকতর সঠিক, তাঁর ওই মযহাব পরিবর্তন করা উচিত। বস্তুতঃ এমন কোনো ফকীহ’কে দেখা যায় নি এ রকম না করে থাকতে; নিজ মযহাবের ওপর ‘অটল’ থাকতে কোনো ফকীহ’কেই দেখা যায়নি (মযহাব পরিবর্তনকারী আলেমবৃন্দের অনেকের নামের তালিকা দেখার জন্যে ‘**আল-মিযান আল-কুবরা**’ পুস্তকের মুখবন্ধ দেখুন)।

একজন ডাক্তারের স্নায়ুরোগ-বিশেষজ্ঞ কিংবা শিক্ষানবিশ (ইন্টারনী) খেতাব ধারণের ফলে যেমন তাঁর ডাক্তারি ছেড়ে দেয়া বোঝায় না, তেমনি শাফেঈ বা হানাফী হওয়ার মানেও ‘মোহাম্মদী’ হওয়া বাদ দেয়া নয়। কেননা, হানাফী ও শাফেঈ উভয়ই মোহাম্মদী। বরঞ্চ মোহাম্মদী হতে হলে শাফেঈ, বা হানাফী, কিংবা মালেকী, অথবা হাম্বলী হওয়া জরুরি। বস্তুতঃ তিয়াত্তরটি ফেরকাহ’র মধ্যে নির্মল আকীদা-বিশ্বাস পোষণকারী একটি দলের মানুষ-ই হলেন মোহাম্মদী। যে ব্যক্তি মোহাম্মদী নয়, সে অবিশ্বাসী। ধর্ম সংস্কারক (রশীদ রেযা) ওপরে উদ্ধৃত নিজ বক্তব্যে কোটি কোটি মুসলমানকে ‘অবিশ্বাসী’ আখ্যা দিয়েছে। এ হীন কথাবার্তা যে ব্যক্তি বলে, তার সম্পর্কে যতোই লেখা হোক না কেন, তা যথেষ্ট হবে না। তবে এটি বোধগম্য হওয়া উচিত, যে ব্যক্তি মুসলমানদের সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলে, সে হয় নিরেট মূর্খ, নয়তো ইসলামের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন যিনদিক্ব।

৪০/ – ধর্ম সংস্কারক ক্রোধে ভাষা হারিয়ে আবোল-তাবোল বকছে: “যে সকল মানুষ কারো পরোয়া না করে সত্য বলে থাকেন, তারা বলেছেন যে তাকলীদ অদ্যাবধি অস্তিত্বশীল আলোচনার খাতিরেই; খ্যাতি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জন ও তাকলীদে অভ্যস্ত হওয়ার দরুনও এটি টিকে আছে।

”ইমাম সৈয়ুতী বলেন যে প্রতিটি ইসলামী শতকেই এজতেহাদ প্রয়োগ ‘ফরযে কেফায়া’। মানে প্রতি শতাব্দীতেই একজন মুজতাহিদ থাকা ফরয। এঁদেরকে মোতলাক (স্বয়ংসম্পূর্ণ) মুজতাহিদ হতে হবে। এ কথা বলা ভুল, ’(ইসলামী) চতুর্থ শতাব্দীর পরে আর কোনো মোতলাক মুজতাহিদ আবির্ভূত হননি। কতিপয় মোতলাক মুজতাহিদ পরবর্তীকালে এসেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তাঁদের এজতেহাদগুলো তাঁদের শিক্ষাদাতা ইমাম আল-মযহাবের এজতেহাদের সাথে মিলে গিয়েছিল, সেহেতু তাঁদেরকে তাঁর-ই মযহাবের অন্তর্গত বলে বিবেচনা করা হয়েছিল।’ সুতরাং কেউ যদি চার মযহাব বাদ দিয়ে স্বাধীন কোনো এজতেহাদ অনুসরণ করেন, তাহলে তাঁর এ আমলের প্রতি আপত্তি উত্থাপনের অধিকার কারোরই নেই। এই পদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত একজন মোতলাক মুজতাহিদ হলেন হযরত ইমাম মোহাম্মদ শওকানী, যিনি ১২৫০ হিজরী/১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ সালে মারা যান। জ্ঞাত সকল মযহাবের মধ্যে তাঁর মযহাব-ই হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী, আর তাঁর কথাবার্তা সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য।” [রশীদ রেযা প্রণীত ‘মুহাওয়ারাত’]

ধর্ম সংস্কারক (রশীদ রেযা) দাবি করে যে উলামা-এ-আহল-এ-সুন্নাহ সত্য বলতে ভয় পান। সে তাঁদের কুৎসা রটনা করছে। প্রকৃতপক্ষে আহলে সুন্নাতের উলেমাবৃন্দ প্রতিটি শতাব্দীতেই সত্য বলেছেন; সত্যকে সমুন্নত রেখেছেন। সবাই জানেন, এর জন্যে তাঁদের অনেককেই শহীদ করা হয়। ইসলাম ধর্মে কোনো গোঁড়ামি নেই; তাহলে কেন আমরা এর কারণগুলো তালাশ করবো? আজকে চারটি মযহাব বিদ্যমান। এগুলোর কোনোটি-ই কারো মালিকানাধীন নয়। প্রত্যেক মুসলমান-ই নিজের পছন্দ অনুযায়ী কোনো একটি মযহাবের অনুসরণ করেন, কারণ চারটি মযহাব-ই সঠিক। চারটি-ই সত্য এবং আহল আস্ সুন্নাহ'র অন্তর্ভুক্ত। চার মযহাব-ই মোহাম্মদী। এগুলোর অনুসারীরা একে অপরকে দ্বীনী ভাই হিসেবে বিবেচনা করেন। এই চার মযহাবের ঈমান তথা আকীদা-বিশ্বাস একই। তাদের অধিকাংশ আমল (অনুশীলন)-ও এক। কিছু অনুশীলনগত এখতেলাফি (মতপার্থক্যের) বিষয়ে এগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। উপরন্তু, এই মতপার্থক্য মুসলমানদের প্রতি আল্লাহতা'লার একটি রহমত (করুণা), এক আশীর্বাদস্বরূপ।

ধর্মীয় পদে কর্তব্যরত এমন কোনো আলেম নেই যিনি হযরত আবদুল ওয়াহহাব শারানী (রহ:)-এর ধর্মীয় উচ্চ পদমর্যাদা, বাতেনী ও যাহেরী এলমে তাঁর কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জানেন না। শুধু ধর্ম সংস্কারকরাই তাঁর মর্যাদাকে অস্বীকার করে থাকে। এই মহান আলেম নিজ '**মিযানুল কুবরা**' গ্রন্থের মুখবন্ধে লেখেন:

"চার মযহাবের ইমামবৃন্দ এবং তাঁদের অনুসারী সকল আলেম বলেন যে প্রত্যেক মুসলমানের স্বাধীনতা রয়েছে নিজস্ব পছন্দ মোতাবেক চার মযহাবের কোনো একটিকে অনুসরণ করার; অনুমতি রয়েছে এক মযহাব থেকে অন্য মযহাবে স্থানান্তরিত হবারও; অধিকন্তু, খারাজ (জরুরি প্রয়োজন বা বাধ্যবাধকতা) থাকলে অন্য কোনো মযহাব অনুসরণেরও। আল্লাহ পাক অনন্ত অতীতে এরাদা (ইচ্ছে/ডিক্রী) ও পূর্বনির্ধারণ করেছিলেন যে মুসলমান সমাজ চার মযহাবে বিভক্ত হবেন এবং এটি তাঁর বান্দা মনুষ্য জাতির জন্যেও উপকারী হবে। তিনি এ রকম ইচ্ছে না করলে এমনটি হতো না; আর তাঁর প্রিয়নবী (দ:)-ও বলতেন না যে এই বিভক্তি খোদায়ী করুণাস্বরূপ; উপরন্তু, যেহেতু খোদাতা'লা এ'তেকাদ তথা বিশ্বাসে পৃথক হতে নিষেধ করেছেন, সেহেতু আমল বা ধর্ম অনুশীলনেও বিভক্তি তিনি নিষেধ করতেন। প্রতিটি বিষয় সম্পাদনের ক্ষেত্রেই একটি '**আযিমাত**' (কঠিন পন্থা)-এর পাশাপাশি একটি '**রুখসাত**' (সহজ উপায়)-ও বিরাজমান। কোনো বিষয় একটি মযহাবের মধ্যে আযিমাত হলে, অপর কোনো মযহাবের মধ্যে এর রুখসাত-এর অনুমতি রয়েছে। যে ব্যক্তি আযিমাত পালনে সক্ষম, তার কোনো অনুমতি নেই চার মযহাবের রুখসাতগুলো বেছে নিয়ে পালন করার। এ রকম করার মানে হলো ইসলাম ধর্মের সাথে তামাশা করা। রুখসাত পালন কেবল তাদের জন্যেই বিহিত, যারা আযিমাত পালনে অক্ষম। অধিকন্তু, সক্ষম ব্যক্তির জন্যে নিজ মযহাবের রুখসাতগুলোও পালন না করা উত্তম। প্রত্যেকের উচিত যতো বেশি সম্ভব আযিমাতগুলোই পালন করা। অ-মুজতাহিদদেরকে কোনো একটি মযহাব বেছে নিয়ে নিজেদের সকল কাজে সেটির অনুসরণ করতে হয়। নস (আয়াত ও হাদীস) হতে নজর (সতর্ক যাচাই-বাছাই) ও এসতিদলাল (দলিলের যুক্তিনির্ভর বিচার-বিশ্লেষণ) দ্বারা সিদ্ধান্ত নেয়ার পর্যায়ে পৌঁছুলেই কেবল তারা নিজেদের এজতেহাদ অনুসরণ করতে বাধ্য। এ কথা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ:)-এর বাণীতে বিধৃত; তিনি বলেন, 'তোমাদের জ্ঞান তোমরা সে উৎস থেকে গ্রহণ করো, যেখান থেকে তোমাদের ইমামমণ্ডলী সংগ্রহ করেছিলেন। ওই অবস্থায় আর তাকলীদ করো না।' আবূ মোহাম্মদ আল-জাউইনী (ইন্তেকাল: ৪৭৮ হিজরী/১০৮৫ খৃষ্টাব্দ) তাঁর '**মুহিত**' পুস্তকে লেখেন:

’সক্ষম ব্যক্তিদের জন্যে চার মযহাবের আযিমাতগুলো পালন করা ’ওয়ারা’ ও ’তাকওয়া’ এবং এটি-ই উত্তম পন্থা। অক্ষম ব্যক্তিদের জন্যে চার মযহাবের রুখসাতগুলো পালন করার অনুমতি আছে বটে, তবে কোনো মযহাবের রুখসাত-সংক্রান্ত সকল শর্ত পূরণ করা বাধ্যতামূলক।’

”ইমাম সৈয়ুতী (রহ:) বলেন, ‘মুজতাহিদ দুই প্রকার: মুজতাহিদ মোতলাক ও মুজতাহিদ ফীল মযহাব। যে আলেম মুজতাহিদ ফীল মযহাব, তিনি নিজ মযহাবের ইমামকে অনুসরণ করেন না; তিনি নিজের বের করা সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ফতোওয়া জারি করেন। তবে তাঁকে নিজ মযহাবের ইমাম সাহেবের নীতিমালা (কাওয়াঈদ) অনুযায়ী দলিল খুঁজতে হয়। তিনি এ সকল নীতি বা পদ্ধতির বাইরে যেতে পারেন না। চার মযহাবের ইমামবৃন্দের পরে কোনো মোতলাক মুজতাহিদ আর এ পৃথিবীতে আগমন করেননি। অর্থাৎ, কোনো আলেম-ই আর এই দাবি করেননি। শুধু ইবনে জারির তাবারী এই দাবি করেছিলেন, কিন্তু কোনো আলেম-ই তাঁর সে দাবি মেনে নেননি।

”শায়খ ইযয আদ্ দ্বীন ইবনে জামা’আ যখন কোনো বিষয়ে অন্য মযহাবের সাথে সঙ্গতি রেখে কোনো ফতোওয়া জারি করতেন, তখন ওই মযহাবের ইমামের আরোপিত সকল শর্ত তিনি সর্বদা তাতে অন্তর্ভুক্ত করতেন এবং বলতেন যে এ সকল শর্ত পূরণ করতে হবে; তিনি আরও যোগ করতেন, ‘তোমরা যদি এ শর্তাবলী না মানো, তবে এটি এবাদত হিসেবে সহীহ হবে না। কেননা, মযহাবগুলোর রুখসাতগুলো পালন করা শুধু তখন-ই অনুমতিপ্রাপ্ত হয়, যখন আযিমাতগুলো পালন করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। অধিকন্তু, রুখসাতের সকল শর্ত পূরণ করাও এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক।

”হাত দ্বারা কেউ যদি কোনো নারীকে স্পর্শ করে (যার সাথে তার নেকাহ হবার অনুমতি আছে এবং/বা
ছিল), তবে শাফেঈ মযহাব অনুযায়ী তার ওযূ ভেঙ্গে যায়; কিন্তু হানাফী মযহাব অনুসারে তা ভাঙ্গে না। কোনো শাফেঈ মযহাবের অনুসারীর পক্ষে এমন কোনো নারীকে স্পর্শ করার পর যখন ওযূ করা সম্ভব, তখন তাঁর পক্ষে সহীহ (বৈধ) হবে না যদি তিনি হানাফী মযহাবকে অনুসরণ করে ভাঙ্গা অযূ নিয়ে সালাত আদায় করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর দ্বারা হানাফী মযহাবকে অনুসরণ করতে হলে একটি বাধ্যতামূলক আযিমাত তথা কঠিন শর্তের অস্তিত্ব থাকতে হবে। অর্থাৎ, আবারো ওযূ করা অসম্ভব হলেই কেবল তিনি তা করতে পারবেন; তবে তাঁকে হানাফী মযহাবের রীতি অনুযায়ী ওযূ ও সালাতের সকল ফরয ও ওয়াজিব বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে।” [আবদুল ওয়াহহাব শারানী প্রণীত ‘আল-মিযানুল কুবরা’, মুখবন্ধ]

মুজতাহিদ ফী’ল্ মযহাব প্রতি শতাব্দীতেই হয়তো আগমন করতে পারেন মর্মে উলেমাবৃন্দের মন্তব্যকে অজুহাত করে ধর্ম সংস্কারক দাবি করেছে যে চার মযহাবের অনুসারী নয় এমন মোতলাক মুজতাহিদের আবির্ভাব ঘটবে। ‘হযরত’ শওকানী এ পদ্ধতির এক নতুন মযহাবের গোড়াপত্তন করেছে বলে দাবি করে সে তার মতোই আরেক ধর্ম সংস্কারকের গুণকীর্তন করেছে। মহান আলেমে হক্কানী হযরত সাইয়্যেদ আবদুল হাকীম-ই আরওয়াসী (কুদ্দেসা সিররূহ) তাঁর এক পত্রে শওকানীর আসল মতলব তুলে ধরেছেন। তিনি লেখেন, “আশ-শওকানী ও তার মতো অনেক লোক ধর্মে কর্তৃত্বশীল ব্যক্তি নয়। ধর্মীয় বিষয়াদিতে তার কথাবার্তা দলিল হতে পারে না। তুমি (হুসাইন হিলমী) লিখেছো সে দাবি করেছে, ‘তাফসীরে ইবনে আব্বাস’ নাকি কোনো তাফসীর-ই

নয়। আসলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা:)-এর কোনো তাফসীর বই ছিল না, কেননা তিনি কোনো বই লিখে যাননি। দো'জাহানের বাদশাহ হযরত রাসূলে পাক (দ:)-এর মূল্যবান সোহবত (সান্নিধ্য) অর্জন করে এবং হযরত জিবরীল আমীন (আ:)-এর দর্শন লাভ করে, আর সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বোযর্গ হয়ে তিনি আল-কুরআনের কিছু আয়াতের পাশাপাশি কিছু হাদীসেরও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করেন। আমাদের বিজ্ঞ তাফসীরকার উলেমাবৃন্দ এই সকল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গ্রহণ করে তা দ্বারা তাঁদের নিজেদের বইপত্রের শোভা বর্ধন করেন। এ ধরনের একটি তাফসীর হলো ইমাম বায়দাবী (রহ:)-এর রচিত 'তাফসীরে বায়দাবী'। ইসলামী উলেমাবৃন্দ সর্বসম্মতভাবে বলেন যে এ ধরনের তাফসীর অত্যন্ত উচ্চস্তরের। শওকানীর কথা সংশোধন করা উচিত; আর যিনি তা করবেন তাঁর অন্ততঃ এলম-এ-উসূল-এ-হাদীস শাস্ত্রের সূক্ষ্ম জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। তবে শওকানী ওই উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছিল কিনা তা অজ্ঞাত। কেননা, সে যদি সে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হতো, তাহলে মহান উলেমা-এ-কেরামের নীতিমালার সাথে মতানৈক্য সৃষ্টিকারী কোনো কথা সে বলতো না।" বস্তুতঃ শওকানী যাইদী শিয়া গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল [মোহাম্মদ ইবনে আহমদ খালাফ, কুয়েতের মুফতী, '**জওয়াব আস্ সা'য়েল**', ৬৯ পৃষ্ঠা]।

শওকানীর রচিত '**এরশাদ আল-ফুহুল**' সহ অন্যান্য বইপত্র মনোযোগের সাথে পড়লে দেখা যাবে, সে যাইদী শিয়া হওয়া সত্ত্বেও '**তাক্বিয়্যা**' অবলম্বন তথা নিজ আকীদা-বিশ্বাস লুকিয়ে সুন্নীর ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল। কেননা, এ ধরনের গোমরাহ লোকদের জন্যে এটি করা অপরিহার্য, যখন তারা আহলে সুন্নাতের মাঝে বসবাস করে। শওকানীর উপরোক্ত এই বইটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সে আহলে সুন্নাতের উলেমাদের নাম উচ্চারণ ও তাঁদের উদ্ধৃতি পেশের ফাঁকে ফাঁকে সেই সকল পুরোনো গোমরাহ দলের আলেমদের নাম ও উদ্ধৃতি পেশ করে, যাদের নাম ও বইপত্র ইতিপূর্বে বিস্মৃত হয়েছিল এবং যাদের ফিতনা দমন হয়ে গিয়েছিল; আর সে এদের মধ্যে ধর্ম সংস্কারক লা-মযহাবী/'সালাফী'গুলোকে সঠিক প্রমাণ করার জন্যে তার বইতে বিতর্কও করেছে। উদাহরণস্বরূপ, সে দাবি করে যে নিরঙ্কুশ বা স্বয়ংসম্পূর্ণ (মোতলাক) এজতেহাদ পৃথিবীর শেষ সময় পর্যন্ত প্রয়োগ করা যাবে। সে আরও দাবি করে ইবনে আব্দিস্ সালাম ও তাঁর শিষ্য ইবনে দাকিক আল-ঈদ (বেসাল: ৭০২ হিজরী/১৩০২ খৃষ্টাব্দ), এবং তাঁর শিষ্য ইবনে সাইয়্যেদ আন্ নাস্, আর তাঁর শিষ্য যাইনউদ্দীন আল-এরাকী (বেসাল: ৮০৬ হিজরী/১৪০৪ খৃষ্টাব্দ) এবং তাঁর শিষ্য ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (রহ:) ও অন্যান্য আরও অনেকে মোতলাক মুজতাহিদ ছিলেন। ফলে শওকানী গোপন চক্রান্ত দ্বারা আহলে সুন্নাতকে নিশ্চিহ্ন করার অপপ্রয়াস পেয়েছে এবং নিজেকে সুন্নী উলেমা-এ-কেরামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো মোজাদ্দেদ ও 'উলামা'দের মধ্যে একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে প্রতীয়মান করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। আজকে ধর্মীয় পদে অধিষ্ঠিত তরুণ সমাজ শওকানীকে তার মাতৃভাষা আরবীতে অনেক বইপত্র অধ্যয়ন করতে এবং 'উলামা'দের মধ্যে দৃশ্যতঃ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে দেখে এই মুলহিদকে 'মুজতাহিদ' মনে করে থাকে; আর তাকে অনুসরণ করে আহলে সুন্নাহ'র সাথে ভিন্নমত পোষণ করে।

মোহাম্মদ আশ্ শওকানী স্বরচিত 'এরশাদ আল-ফুহুল' শীর্ষক পুস্তকে লেখে: "তাকলীদ বলতে বোঝায় কারো রায় (মত) কিংবা এজতেহাদকে তাঁর প্রামাণিক দলিল না জেনেই মেনে নেয়া। কারো খবর তথা বর্ণনাকে মেনে নেয়ার মানে হলো যাঁর কথা উদ্ধৃত হয়েছে তাঁর কথাকে স্বীকার করে নেয়া। অধিকাংশ উলামা-এ-কেরামের মতানুযায়ী, আমল বা ধর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে তাকলীদ কখনোই অনুমতিপ্রাপ্ত নয়। ইবনে হাযম বলেছেন এ ব্যাপারে এজমা' হয়েছে। আল-কুরাফী বলেন

যে মালেকী মযহাবে এই নিয়ম-ই বহাল আছে। সর্ব-ইমাম আবূ হানিফা (রহ:) ও শাফেঈ (রহ:) বলেন, ’আমাকে অনুসরণ করো না!’ মৃতদেরকে অনুসরণ না করার ব্যাপারেও এজমা’ হয়েছে। উসূলের উলেমাবৃন্দ কর্তৃক এই বিষয়টি না জানানো সত্যি আজব! চার মযহাবের ইমামমণ্ডলীর অনেক মুকাল্লিদ (অনুসারী) বলে ’আম’ তথা সাধারণ মুসলমানদের জন্যে তাকলীদ করা ওয়াজিব। এ কথা যারা বলে তারা মুকাল্লিদ হওয়ার দরুন তাদের কথা দলিল হতে পারে না। সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) ও তাবেউন (রহ:)-দের সময়ে কোনো তাকলীদ ছিল না। তাঁরা একে অপরকে জিজ্ঞেস করে কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা করেছিলেন। বস্তুতঃ ‘যারা জানে তাদের জিজ্ঞেস করে শেখো’ – এ আয়াতটির মানে হলো, ’ঐশী আইন কী তা জিজ্ঞেস করো।’ এর মানে এই নয় ‘যারা জানে তাদের মতামত জেনে নাও।’ ‘তোমাদের মধ্যকার মতানৈক্যের বিষয়গুলোর মীমাংসা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (দ:)-এর কাছে ছেড়ে দাও’ – এ আয়াতটি তাকলীদকে নিষেধ করে। রাসূলুল্লাহ (দ:) যখন-ই কোনো সাহাবী (রা:)-কে কোথাও (বিচারকের দায়িত্ব দিয়ে) পাঠাতেন, তখন তিনি বলতেন, ‘তুমি কোনো বিষয়ের সমাধান সুন্নাহ’তে খুঁজে না পেলে তোমার নিজের রায় দ্বারা বিচার করবে।’ যে ব্যক্তি কোনো মুজতাহিদকে অনুসরণ করে, সে তাঁকে ইসলাম ধর্মে কর্তৃত্বশীল হিসেবে মেনে নেয়, যে কর্তৃত্ব রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর অধিকারে।”

’অধিকাংশ উলামা-এ-কেরামের মতানুযায়ী, আমল বা ধর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে তাকলীদ কখনোই অনুমতিপ্রাপ্ত নয়’ – শওকানীর এই মন্তব্যটি একান্তই তার নিজের, যা’তে সে মুজতাহিদদের একে অপরের অনুসরণের অনুমতি না থাকার বিষয়টির অপব্যাখ্যা করেছে (মানে এ নিয়ম মুজতাহিদবৃন্দের বেলাতেই কেবল প্রযোজ্য)। চার মযহাবের ইমামবৃন্দ কখনোই এ কথা বলেননি মুসলমান সর্বসাধারণ কাউকে অনুকরণ বা অনুসরণ করতে পারবেন না। আমরা ইতোমধ্যেই এ ব্যাপারে লিখেছি। আর ‘মৃতদেরকে অনুসরণ করার অনুমতি নেই’ মর্মে ধারণাটি শিয়াদেরই একটি আকীদা, যে শিয়া গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল শওকানী। আহলে সুন্নাহ’র উলেমাবৃন্দ অনুরূপ ধারণার বশবর্তী নন দেখে সে যে বিস্ময় প্রকাশ করেছে, তাতেই প্রতিভাত হয় সে গোমরাহ শিয়া আকীদা পোষণকারী ছিল। অধিকন্তু, ’ফেকাহ’র উলেমাবৃন্দ যাঁরা চার মযহাবের যে কোনো একটির অনুসারী, তাঁরা মুকাল্লিদ হওয়ায় তাঁদের কথা দলিল হতে পারে না’ মর্মে শওকানীর আপত্তি তার-ই আপন গোমরাহী ও মাত্রাতিরিক্ত ধর্মীয় একগুঁয়েমিজনিত বিভ্রান্তি পরিস্ফুট করে। অথচ সে তার প্রথম দু’টি বাক্যে স্বীকার করেছে যে ফেকাহ’র কোনো আলেম যিনি মুকাল্লিদ, তিনি তাঁর ইমাম আল-মযহাবকে অনুসরণ করেন এবং নিজ হতে কোনো কথা বলেন না; উপরন্তু, ইমাম আল-মযহাবের কথাই হচ্ছে তাঁর কথা, যে বিষয়টি শওকানীর নবম বাক্যে বর্ণিত নিজস্ব বক্তব্য অনুযায়ী দলিল হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। এ কথা অবশ্যই সত্য যে সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর জমানায় তাকলীদের কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ তাঁরা সবাই মুজতাহিদ ছিলেন। কিন্তু বহু বইপত্রে লিপিবদ্ধ হাজার হাজার উদাহরণ সাক্ষ্য বহন করে তাবেউন (রহ:)-দের মধ্যে মুজতাহিদের চেয়ে মুকাল্লিদের আধিক্য ছিল। রাসূলুল্লাহ (দ:) সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-কে বিভিন্ন স্থানে বিচারক নিয়োগ করার সময় তাঁদের নিজেদের রায় প্রয়োগ করার আদেশ দেন মর্মে দৃষ্টান্ত পেশ করে শওকানী তার নিজের অপযুক্তিরই খণ্ডন করেছে। আহলে সুন্নাহ যে সঠিক, তা স্বীকার করতে আল্লাহতা’লা তাকে বাধ্য করেছেন।

অতএব, এটি স্পষ্ট যে লা-মযহাবী/’সালাফী’ গোষ্ঠী ও ধর্ম সংস্কারকচক্র আশ্ শওকানীর জিহ্বা দ্বারা কথা বলে থাকে। আহলে সুন্নাহ’কে ধোকা দেয়ার জন্যে ধর্ম সংস্কারক (রশীদ রেযা) আহলে সুন্নাহ’র

এক শত্রু (শওকানী)-কে মুজতাহিদ মোতলাক হিসেবে উপস্থাপন করেছে। ‘আল-উসূল আল-আরবা’আ’ শিরোনামের বইতে লেখা হয়েছে, শওকানী কোনো মযহাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল না; আর যাঁরা মযহাবের অনুসারী, তাঁদেরকে সে ’কাফের (অবিশ্বাসী) ও মুশরিক (অংশীবাদী)’ আখ্যা দিয়েছিল। অধিকন্তু, লা-মযহাবী গোষ্ঠী তাকে মুজতাহিদ মনে করে থাকে বলেও ওই বইতে মত ব্যক্ত করা হয়।

৪১/ – তেরোতম সংলাপে ধর্ম সংস্কারক (রশীদ রেযা) বলে: “ইমাম আহমদ (রা:) ইমাম আবূ দাউদকে বলেন, ‘ধর্মের বিষয়ে কাউকেই অনুসরণ করবে না! সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) কর্তৃক যা বর্ণিত হয়েছে, কেবল তা-ই আঁকড়ে ধরবে। তাঁদের পরে যাঁরা আগমন করেছেন, তাঁদের মান্য (তাবে’) করার বেলায় তুমি স্বাধীন।’ ’মান্য’ করার মানে কিন্তু তাকলীদ নয়। তাকলীদের অর্থ হচ্ছে কারো কথা বা মতের অনুসরণ করা; তিনি কোত্থেকে তা পেয়েছেন বা তাঁর দলিল কী, সে সম্পর্কে না জেনেই এই অনুসরণ। হাম্বলী মযহাব হলো হাদীসের মযহাব। এই মযহাবের অনুসারী কোনো আলেম-ই তাঁর ইমাম আল-মযহাবের মত মানতে গিয়ে হাদীস পরিত্যাগ করেননি। তাকলীদ মেধাকে অথর্ব, অকার্যকর করে দেয়। যে ব্যক্তি উলেমাবৃন্দের রায় (সিদ্ধান্ত) বা এজতেহাদের সাথে ’নসের’ তুলনা করে ওর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ রায় বা এজতেহাদগুলো পরিহার করেন, তিনি উলেমাবৃন্দের কথাকে অমান্য করেন না। এজতেহাদ অনুসরণ করা ফরয নয়, আর যারা তা অনুসরণ করেন না, তারাও পাপিষ্ঠ বা অবিশ্বাসীতে পরিণত হন না। ইমামমণ্ডলী বা তাঁদের শিষ্যবৃন্দ এ কথা বলেন নি যে তাঁদের রায় বা এজতেহাদকে মান্য করা আবশ্যক। ইমাম আবূ হানিফা (রহ:) বলেন, ‘এটি আমার এজতেহাদ; এর চেয়ে ভাল কারো কোনো এজতেহাদ থাকলে আমি তার অনুসারী হবো।’ খলীফা হারুনুর রশীদ যখন সকলকে ইমাম মালেক (রহ:)-এর মযহাবের অনুসারী হবার জন্যে আদেশ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তখন ইমাম সাহেব বলেন, ‘(খলীফা), এই কাজ করবেন না! কোনো হাদীস একটি জায়গায় জানা না থাকলেও অপর কোনো জায়গায় হয়তো জ্ঞাত হতে পারে।’ কোনো হাদীসের রাবী তথা বর্ণনাকারী মাত্র একজন হলে তা অনুমান নির্দেশ করে। ওই রকম একখানি হাদীস সহীহ হলেও তা যদি সর্বসাধারণের সুবিধার পরিপন্থী হয়, তাহলে তা পরিহার করতে হবে। এতে সুন্নাহ’কে পরিত্যাগ করা বোঝায় না। এটিকে বাদ দেয়া হয়েছে এই কারণে যে এর বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রামাণ্য দলিল পরিদৃষ্ট হয়েছে। হযরত উমরের তালাক ও মোতা‘ বিবাহসম্পর্কিত এজতেহাদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। এ কথা বলা যাবে না যে হযরত উমর ওই হাদীসের বিরোধিতা করেছিলেন।” [রশীদ রেযা কৃত ‘মুহাওয়ারাত’]

রশীদ রেযা ধর্ম প্রচারকের মুখ দিয়ে নিজের গুণকীর্তন করে এ কথা বলে, “ওহে সৎ যুবক, আমি এখন তোমার সুগভীর ও ব্যাপক জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারছি।” সে আবারও ধর্ম প্রচারকের মুখ দিয়ে বলে, ”তাকলীদের ক্ষতির কারণে যদি কেউ নিজ মযহাবের বইপত্রে আটকে থাকে এবং হাদীসগ্রন্থগুলোকে অবহেলা করে, তাতেও এটি (তাকলীদ) নিজেকে ভ্রান্ত প্রমাণ করবে।” [রশীদ রেযা কৃত ‘মুহাওয়ারাত’]

ইমাম আহমদ হাম্বল (রহ:)-ই শুধু নন, অন্যান্য আইম্মা-এ-মযাহিব (রহ:)-মণ্ডলীও তাঁদের শিষ্যদেরকে বলেছিলেন, “অন্য কারো অনুসরণ করবে না, এমন কি আমাকেও না। আসহাবে কেরাম (রা:) থেকে যা পাবে তা-ই গ্রহণ করবে।” এ কথা বলার কারণ হলো তাঁদের শিষ্যদের মধ্যে মুজতাহিদবৃন্দ ছিলেন। মুজতাহিদদেরকে তাই করতে হয়। ‘আসহাবে কেরামের পরে যাঁরা

আগমন করেছেন, তাঁদের মান্য (তাবে') করার বেলায় তুমি স্বাধীন', রশীদ রেযার এই উদ্‌ধৃতিটি ডাহা মিথ্যে; কেননা, কোনো মুজতাহিদের পক্ষে অপর কোনো মুজতাহিদের অনুসরণ করার অনুমতি ছিল না। হযরত আবদুল ওয়াহহাব শারানী (রহ:) নিজ '**আল-মীযান আল-কুবরা**' গ্রন্থে লেখেন:

"এজতেহাদের মর্যাদায় উন্নীত কোনো আলেম, যিনি **আদীল্লা** খুঁজে বের করতে পারেন এবং তা থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তাঁর দ্বারা অন্য কারোর অনুসরণের অনুমতি নেই। তবে উলেমাবৃন্দের মতানুযায়ী, কোনো মুজতাহিদের অনুসরণ করা সাধারণ মুসলমানদের জন্যে ওয়াজিব। তাঁরা আরও বলেন যে অ-মুজতাহিদ মুসলমান সর্বসাধারণ কোনো মুজতাহিদকে অনুসরণ না করলে পথভ্রষ্ট হবেন। সকল মুজতাহিদ-ই ইসলাম ধর্মের প্রামাণিক দলিল-আদিল্লা থেকে আইন-কানুন বের করেছেন। আল্লাহতা'লার এই ধর্মের বিষয়ে কোনো মুজতাহিদ-ই নিজস্ব ধ্যান-ধারণা পরিবেশন করেননি বা মনগড়া কথা বলেননি। প্রতিটি মযহাব-ই কুরআন-সুন্নাহ'র সুতোয় বোনা একেকটি (পরিধেয়) বস্ত্র। যে ব্যক্তি এজতেহাদের পর্যায়ে উন্নীত নন, তিনি চার মযহাবের কোনো একটিকে নিজস্ব পছন্দানুযায়ী বেছে নিয়ে সেটির অনুসরণ করবেন। কেননা, সবগুলোই বেহেশ্তী পথ ও মত। আর যে ব্যক্তি কোনো একজন ইমাম আল-মযহাবের সমালোচনা করে, সে তার অজ্ঞতাই প্রকাশ করে মাত্র। উদাহরণস্বরূপ, প্রাথমিক সময়কার উলেমামণ্ডলী ও তাঁদের উত্তরসূরীবৃন্দ সর্বসম্মতভাবে জানান যে ইমামুল আযম হযরত আবূ হানিফা নুমান বিন সাবেত (রহ:) গভীর জ্ঞানী ও 'ওয়ারা'সম্পন্ন আলেম ছিলেন; তিনি প্রচুর এবাদত-বন্দেগী করেন এবং এজতেহাদ প্রয়োগ করে আইন-কানুন বের করার বেলায় খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন ও বিচক্ষণতা দেখাতেন। এই ধরনের একজন মহান ইমাম সম্পর্কে উচিত নয় এ কথা বলা – 'তিনি আল্লাহর ধর্মে কুরআান-সুন্নাহ পরিপন্থী নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও মনগড়া মতামত পরিবেশন করেন।' এ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া উচিত! আইম্মা-এ মযাহিবের প্রতি প্রত্যেক মুসলমানের শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। ইমামুল আযম হযরত আবূ হানিফা (রহ:)-এর সুউচ্চ মাকাম সম্পর্কে কেবল 'কাশফ' (দিব্যদৃষ্টি)-এর অধিকারী আউলিয়া কেরাম (রহ:)-বৃন্দই উপলব্ধি করতে সক্ষম।" [**আল-মীযান আাল-কুবরা**]

হাম্বলী মযহাবের উলেমাবৃন্দ হাদীস শরীফ পরিত্যাগ করেন নি মর্মে ধর্ম সংস্কারকের দাবিটি অপরাপর তিন আইম্মা-এ-মযাহিবের প্রতি বিষোদগার ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের দ্বারা ওপরে উদ্‌ধৃত তার কথায়ও সে স্বীকার করেছে, 'প্রত্যেক ইমাম আল-মযহাব-ই বলেছিলেন যে সহীহ হাদীস পেলে তাঁর এজতেহাদকে পরিহার করতে হবে।' আর এখানে সে তার ওই কথাকে অস্বীকার করছে। উপরন্তু, 'তাকলীদ মেধাকে অথর্ব, অকার্যকর করে দেয়', এ কথা যে ব্যক্তি বলে, তা তারই মূর্খতার প্রতিফলন করে। আল্লাহতা'লার এই ধর্ম মস্তিষ্ক, জ্ঞান-বুদ্ধি, উপলব্ধি ক্ষমতা এবং ধারণারও উর্ধ্বে। মস্তিষ্ক দ্বারা যদি তা বোঝার চেষ্টা করা হয়, তবে ধীশক্তি বিকল হয়ে যাবে। ধর্মীয় বিষয়ে মস্তিষ্ককে এই বালা-মসীবত থেকে রক্ষার সবচেয়ে কার্যকর ওষুধ হলো মুজতাহিদ ইমামবৃন্দের অনুসরণ-অনুকরণ। উলেমাবৃন্দের বিভিন্ন রায় বা এজতেহাদের সাথে 'নসের' তুলনা এমন এক কাজ, যা কেবল মুজতাহিদবৃন্দ-ই করতে সক্ষম। আমাদের মতো অজ্ঞ লোকেরা, যারা এজতেহাদ সম্পর্কে বা তাফসীর কিংবা হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞান সম্পর্কে কিছুই জানি না, তাদের জন্যে কোনো ইমাম আল-মযহাবের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব জেনে ও মেনে নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই। উলামা-এ-ইসলামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী কোনো ইমাম আল-মযহাবকে অনুসরণ করা মুসলমান সর্বসাধারণের জন্যে ওয়াজিব [আবদুল ওয়াহহাব শারানী কৃত

‘**আল-মীযান আল-কুবরা**’, ৬৮ পৃষ্ঠা]। যে ব্যক্তি কোনো ইমাম আল-মযহাবের অনুসরণ করে না, সে গুনাহগার হয়। ফেকাহ’র বইপত্রে লেখা আছে যে চার মযহাবের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রদত্ত কোনো ফতোওয়া, যেটি বিশ্বের সব দেশে প্রসার লাভ করেছে, কেউ তা না মানলে অ-মুসলিমে পরিণত হবে [ইবনে আবেদীন প্রণীত ‘**রাদ্দুল মোখতার**’, সালাতুল বিতর অধ্যায়ের প্রারম্ভে; এ বক্তব্যের কারণেই ধর্ম সংস্কারক (লা-মযহাবী/‘সালাফী’) চক্র হানাফী মযহাবের নয়নমণি ইমাম ইবনে আবেদীন ও তাঁর এই মহামূল্যবান কেতাবকে আক্রমণ করে থাকে]। ইমাম আল-আযম হযরত আবূ হানিফাহ (রহ:) নিজ এজতেহাদ সম্পর্কে বলেন, ‘এই হচ্ছে আমার এজতেহাদ। আমি যতোটুকু পেরেছি করেছি। কেউ এর চেয়ে ভাল করতে পারলে তাঁর সিদ্ধান্ত সঠিক হবার সম্ভাব্যতা-ই বেশি।’ কিন্তু ইমামে আযম এ কথা বলেন নি, ‘আমি তাঁকে অনুসরণ করবো।’ এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলোকে আইম্মা-এ-মযাহিব (রহ:)-বৃন্দ হালাল, হারাম বা ওয়াজিব শ্রেণীভুক্ত করেছিলেন; যদিও এগুলো সম্পর্কে কুরআনুল করীম বা হাদীস শরীফে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। তাঁরা ধর্মের ওই দুইটি উৎসে কোনো ইঙ্গিত না পেলে সিদ্ধান্ত দিতেন না। তাঁরা ছিলেন আকাশে তারকার মতো। আর অন্যান্যরা হলো পৃথিবীতে বিচরণকারী মানুষের মতো। এই মানুষেরা ওই তারকাসম ব্যক্তিত্বদের চেহারার প্রতিবিম্ব পানিতে পড়তে দেখে মনে করছে যে তারা বুঝি ওই মহাত্মণদের চেনে। খলীফা হারুনুর রশীদ একবার ইমাম মালেক (রহ:)-এর সান্নিধ্যে গিয়ে তাঁকে বলেন, ‘আমি আপনার বইপত্র সর্বত্র প্রচার-প্রসার করতে চাই, যাতে সবাই আপনার বইগুলো-ই পড়েন।’ হযরত ইমাম জবাবে বলেন, ‘ওহে আমীরুল মো’মেনীন, ইসলামী উলেমাবৃন্দের মধ্যকার মতপার্থক্য উম্মতের প্রতি আল্লাহতা’লারই রহমত তথা করুণা। প্রত্যেক মুজতাহিদ তিনি যে দলিলকে সহীহ বিবেচনা করেন, তার-ই অনুসরণ করেন। তাঁদের দ্বারা বের করা আইন-কানুন সবই সঠিক পথপ্রদর্শন করে। তাঁরা সবাই আল্লাহর পথের ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত।’ এ কথায় তিনি বুঝিয়েছেন যে সকল মযহাব ও মুজতাহিদ-ই সঠিক পথের ওপর আছেন। লক্ষ্য করার মতো আজব ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ধর্ম সংস্কারক ইতিপূর্বে হাদীসের মোকাবেলায় এজতেহাদ পরিত্যাগের বিষয়ে বারংবার তাকিদ দিলেও এক্ষণে সে মো’আমালতের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীস পরিত্যাগের কথা বলছে। ইমাম আল-আযম হযরত আবূ হানিফা (রহ:) এজতেহাদ প্রয়োগের সময় নিজ রায়ের চেয়ে কোনো যয়ীফ হাদীস, এমন কি কোনো সাহাবী (রা:)-এর বাণীকেও অগ্রাধিকার দিতেন। যয়ীফ হাদীস কেবল ফাযাইল তথা অতিরিক্ত সওয়াব-পূর্ণ এবাদতের ক্ষেত্রেই দলিল হিসেবে সাব্যস্ত হয়; আরেক কথায়, নফল এবাদত-বন্দেগী এই ধরনের হাদীস দ্বারা সাবেত করা যায়। কিন্তু ফরয, ওয়াজিব বা সুন্নাতে মোয়াক্কাদা এবাদতের ক্ষেত্রে শুধু মশহুর (জনশ্রুত) ও সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদীস-ই দলিল হতে পারে। যে বিষয়ে কুরআন-হাদীসে স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়নি, সেটির দলিল খোঁজার সময় বা সে বিষয়ে এজতেহাদ প্রয়োগের সময়, আরেক কথায়, আলোচ্য বিষয়ের অনুরূপ কোনো বিষয়ের দলিল খোঁজার সময় ইমামে আযম হযরত আবূ হানিফা (রহ:) নিজ রায় বা সিদ্ধান্তের চেয়ে কোনো যয়ীফ হাদীসকেই বেশি পছন্দ করতেন। অর্থাৎ, তিনি কোনো যয়ীফ হাদীসের দলিলকে নিজ রায়ের ওপরে প্রাধান্য দিতেন। কেননা, ইমাম আল-বোখারী (রহ:) প্রণীত ‘**আল-মাদখাল**’ পুস্তকে বর্ণিত একটি হাদীসে মহানবী (দ:) এরশাদ ফরমান: ”**কুরআন মজীদের অনুসরণ তোমাদের জন্যে ফরয। এটি পরিত্যাগ করার কোনো ওজর নেই। তাতে কোনো বিষয় না পেলে তোমরা আমার সুন্নাহ’র অনুসরণ করো! যদি তাতেও কোনো বিষয়ের সমাধান না পাও, তবে আমার সাহাবাদের বাণীর অনুসরণ করো! কারণ আমার আসহাব হচ্ছে আকাশের নক্ষত্র সমতুল্য। তাদের যে কাউকে অনুসরণ করলে তোমরা সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে। আমার সাহাবাদের মধ্যকার মতপার্থক্য তোমাদের প্রতি (আল্লাহর) রহমতস্বরূপ**।” এই হাদীস

শরীফ প্রমাণ করে যে চার আইম্মা-এ-মযাহিবকে অনুসরণকারী মুসলমানবৃন্দ সঠিক পথের হেদায়াতপ্রাপ্ত। এতে আরও প্রমাণ হয় যে চার মযহাব-ই সঠিক পথ প্রদর্শন করে। ধর্ম সংস্কারক যে তালাক ও মোতা' (অনৈসলামী নেকাহ পদ্ধতি) বিবাহবিষয়ক এজতেহাদ প্রয়োগের দায় হযরত উমর ফারূক (রা:)-এর ওপর চাপিয়েছে, তা মিথ্যে। কেননা, কোনো সাহাবী (রা:)-ই খলীফা (রা:)-এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেননি। ফলে এ বিষয়ে সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর এজমা' (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল।

আরেকটি আশ্চর্যজনক বিষয় এই যে, ধর্ম সংস্কারকের দৃষ্টিতে কোনো মযহাবের তাকলীদ মানে হলো হাদীসের বইপত্র অধ্যয়ন পরিত্যাগ করা। অথচ যে সকল আলেম সারা বিশ্বের পাঠাগারগুলোকে পরিপূর্ণতা দানকারী হাদীসশাস্ত্রের সহস্র সহস্র বই-পুস্তক ব্যাখ্যা ও প্রকাশ করেছেন, তাঁরা সবাই ছিলেন আহলুস্ সুন্নাহ (সুন্নী)। এঁরা সবাই কোনো না কোনো মযহাবের অনুসারী ছিলেন। ইমাম হামদান ইবনে সাহল (রহ:) লেখেন: "আমি যদি কাজী (বিচারক) হতাম, তাহলে দুই ধরনের লোককে আমি বন্দী করে কারাগারে পাঠাতাম। প্রথম ধরন হলো তারা, যারা হাদীসের বইপত্র পড়ে, কিন্তু ফেকাহ'র কেতাব পড়ে না; আর দ্বিতীয় কিসিম হলো সে সব লোক যারা ফেকাহ'র কেতাব পড়ে, কিন্তু হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়ন করে না। আপনারা কি দেখেন নি আমাদের আইম্মা-এ-মযাহিব কেমন শক্তভাবে হাদীস-শাস্ত্রবিদ্যাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন, অার কতো গভীরভাবে তাঁরা ফেকাহ-বিদ্যার অধ্যয়ন করেছিলেন, আর এ কাজে তাঁরা এগুলোর কোনো একটিকে নিয়েই তুষ্ট ছিলেন না?" আল্লাহতা'লার ধর্ম বিষয়ে মনগড়া কেয়াস (তুলনামূলক বিচারপদ্ধতি) ও রায় (সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া)-কে উলামা-এ-আহল-এ-সুন্নাত কখনোই অনুমোদন করেন নি, বরং নিষেধ করেছেন। এটি যিনি সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করেছিলেন, তিনি হলেন ইমামুল আযম হযরত আবূ হানিফা (রহ:)। এই বিষয়ে তাঁর এবং অন্যান্য আইম্মা-এ-মযাহিবের বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে 'আল-মীযান আল-কুবরা' পুস্তকে। এমতাবস্থায় এ কথা কি কোনো মুসলমানের পক্ষে বলা সাজে যে "তাঁরা কেয়াস ও রায় দ্বারা 'নস'-এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন এবং হাদীসের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ এজতেহাদ প্রয়োগ করেন?" অথচ এই উলেমাবৃন্দ-ই ছিলেন ঠিক এর বিপরীত মতের প্রচারক। রাসূলে খোদা (দ:)-এর উত্তরাধিকারী আমাদের আইম্মা-এ-মযাহিব সম্পর্কে এ কু-ধারণা অন্তরে পোষণেরও কোনো অনুমতি নেই। যারা এ রকম কথাবার্তা বলে, তারা ওই মহান উলেমাবৃন্দ যে মহানবী (দ:)-এর ওয়ারিস, তা বর্ণনাকারী হাদীসকেই অস্বীকার শুধু করে না, বরং তারা সে হাদীসকে পরিত্যাগও করে থাকে। উপরন্তু, এ কাজ করে তারা মুসলমানদের সম্পর্কে বদ চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ও তাঁদের কুৎসা রটনাও করে বৈ কী। এই দুটি কাজ-ই মহাপাপ। যেহেতু তারা হারাম সংঘটনকারী, সেহেতু তাদের উচিত আল্লাহতা'লার কাছে তওবা করা।

৪২/ – ধর্ম সংস্কারক তার বইয়ের শেষে বলে: "মানবের জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি বড় প্রতিবন্ধকতা হলো কারো তাকলীদ করা। মুজতাহিদবৃন্দ কর্তৃক এজতেহাদ প্রয়োগে বের করা সকল আইন-কানুনের উৎস কিন্তু একই ছিল না। এগুলোর কিছু ছিল কুরআনুল করীম থেকে, বাকিগুলো ছিল সুন্নাহ থেকে নিঃসৃত। তাই এরই ফলশ্রুতিতে কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য বিরাজ করছে।" [রশীদ রেযা কৃত '**মুহাওয়ারাত**']

ধর্ম সংস্কারক নিজেকে এক মহা জ্ঞানের শাখায় জড়িয়ে এর মর্ম বুঝতে না পেরে শেষমেশ দিশেহারা হয়ে গিয়েছে। এই বেচারা ওপরে উদ্‌ধৃত হাদীস শরীফ ও ইতিপূর্বে বহুবার উদ্‌ধৃত আয়াতে করীমাকে মান্যকারী মুসলমান সর্বসাধারণ কর্তৃক আইম্মা-এ-মযাহিব (রহ:)-এর অনুসরণ সহ্য করতে না পেরে এবং তাকলীদকে দোষারোপ করার বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানভিত্তিক কোনো যথাযথ কারণ না পেয়ে বলছে যে তাকলীদ জ্ঞান ও মেধার প্রতিবন্ধক। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা তার এই দাবি খণ্ডন করেছি। আয়াতে করীমা ও হাদীস শরীফকে মান্য করা ক্ষতিকর যে ব্যক্তি বলে সে কি মুসলমান, না দ্বীনের শত্রু? আমাদের বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর সুবিবেচনায় এ প্রশ্নটি ছেড়ে দিলাম। হযরত আবদুল ওয়াহহাব শারানী নিজ '**আল-মীযান আল-কুবরা**' গ্রন্থে লেখেন:

"ওহে আমার মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! গভীরভাবে ভাবুন! রাসূলে পাক (দ:) যদি কুরআন মজীদে সংক্ষিপ্ত ও রূপকভাবে প্রকাশিত বিষয়বস্তু খোলাসাভাবে ব্যাখ্যা না করতেন, তাহলে আল-কুরআন গোপন-ই থেকে যেতো। আর যদি আমাদের আইম্মা-এ-মযাহিব, যারা মহানবী (দ:)-এর ওয়ারিস তথা উত্তরাধিকারী, তাঁরা সংক্ষিপ্ত হাদীসগুলো ব্যাখ্যা না করতেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর সুন্নাহও গোপন থেকে যেতো। তাই প্রতিটি শতাব্দীর উলেমাবৃন্দ-ই বিশ্বনবী (দ:)-এর পদাংক অনুসরণ করে সংক্ষিপ্ত হাদীসগুলো ব্যাখ্যা করেছেন। সূরা নহল ৪৪ নং আয়াতে আল্লাহতা'লা এরশাদ ফরমান, '**এবং হে মাহবুব! আমি আপনার প্রতি এ স্মৃতি অবতীর্ণ করেছি যেন আপনি মানুষের কাছে বর্ণনা (বয়ান তথা ব্যাখ্যা) করেন, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে**' (আল-আয়াত)। 'বয়ান' মানে হলো 'আল্লাহতা'লার আয়াতগুলো ভিন্নভাবে, ভিন্ন শব্দচয়নে ব্যাখ্যা করা'। যদি উম্মতের উলেমাবৃন্দ কুরআন মজীদ থেকে আয়াতের ব্যাখ্যা ও সংক্ষিপ্ত আয়াতের তাফসীর এবং আইন-কানুন বের করার সামর্থ্য রাখতেন, তাহলে আল্লাহ পাক মহানবী (দ:)-কে বলতেন, 'ফেরেশতার মাধ্যমে আপনার কাছে যা প্রেরিত হয়েছে, তা-ই তাদেরকে বলুন'; আর তিনি রাসূলে পাক (দ:)-কে ব্যাখ্যা করার আদেশও দিতেন না। শায়খুল ইসলাম যাকারিয়্যা (রহ:) বলেন, 'যদি রাসূলুল্লাহ (দ:) আল-কুরআনে সংক্ষিপ্তভাবে ঘোষিত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা না করতেন এবং আইম্মা-এ-মযাহিব (রহ:) রূপকভাবে ব্যক্ত বিষয়গুলোর খোলাসা বয়ান না দিতেন, তাহলে আমাদের কারো পক্ষেই তা জানা সম্ভব ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, যদি শারে' (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁর হাদীসসমূহে ওযূর নিয়মকানুন সম্পর্কে ব্যাখ্যা না করতেন, তাহলে আমরা তা সম্পন্ন করার নিয়ম কুরআন মজীদ থেকে বের করতে পারতাম না। অনুরূপভাবে, কুরআন মজীদ থেকে প্রতিটি সালাত (নামায)-এর রাকআত সংখ্যা, যাকাতের নিয়ম, খাত ও নেসাবের পরিমাণ, রোযা, হজ্জ্ব ও যাকাতের শর্তাবলী, ফরয ও সুন্নাতগুলোও নির্ধারণ করা সম্ভব হতো না। হুযূরে পাক (দ:)-এর আহাদীসে ব্যাখ্যা করা না হলে রূপকভাবে ব্যক্ত কুরআনী আইন-কানুনের কোনোটি-ই আমাদের বোধগম্য হতো না।'

"ইসলামী উলামা-এ-কেরামের বিরুদ্ধাচরণ করা অন্তরে নেফাক তথা (বিশ্বাসগত) কপটতারই আলামত। এটি এ কারণে যে, এতে তাঁদের প্রামাণিক দলিলাদিরই বিরুদ্ধাচরণ ও প্রত্যাখ্যান বোঝা যায়। সূরা নিসা'র ৬৫তম আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান, '**সুতরাং হে মাহবুব! আপনার রবের (প্রভুর) শপথ, তারা মুসলমান হবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত পরস্পরের ঝগড়ার ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক মানবে না; অতঃপর যা কিছু আপনি নির্দেশ করবেন, তাদের অন্তরে সে সম্পর্কে কোনো দ্বিধা পাবে না এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেবে**।' এই আয়াতটি পরিস্ফুট করে যারা মহানবী (দ:)-এর সিদ্ধান্তে রাজি থাকে না অথবা ইসলামী বিধি-বিধান মানে না,

তাদের কোনো ঈমান-ই নেই। একটি হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (দ:) এরশাদ ফরমান, '**রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর দরবারে (উপস্থিতিতে) ঝগড়া বা বিভেদ করবে না**!' যেহেতু উলামা-এ-কেরাম হলেন নবী করীম (দ:)-এর ওয়ারিস তথা উত্তরাধিকারী, সেহেতু হুযূর (দ:)-এর আনা ধর্মের অনুসারী মহান উলেমাবৃন্দের সাথে বিভেদ করার, তাঁদের সঠিক এজতেহাদগুলোর নিন্দা ও সমালোচনা করার মানেও দাঁড়ায় মহানবী (দ:)-এর সাথে বিভেদে লিপ্ত হওয়া। মহানবী (দ:)-এর আনা ঐশী বিধানে আমাদের যেমন বিশ্বাস করতে হয়, যদিও এর চূড়ান্ত ঐশী কারণ ও প্রমাণ আমাদের জানা নেই, ঠিক তেমনি আমাদের আইম্মা-এ-মযাহিব যে জ্ঞান আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তাতেও আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, যদিও এর শরয়ী দলিল আমরা বুঝতে অক্ষম। কারণ তাঁরা ইসলাম ধর্মের বিরোধী ছিলেন না। সকল আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম)-এর নিয়ে আসা ধর্মের মধ্যে বিরাজমান বিভিন্ন, এমন কি বিপরীতমুখী রীতিনীতি থাকার সত্যতা সত্ত্বেও আমরা মুসলমান সম্প্রদায় তাঁদেরকে আল্লাহর নবী-রাসূল হিসেবেই বিশ্বাস করি ও স্বীকার করে নেই। কেননা, উলেমাবৃন্দ-ই এ কথা সর্বসম্মতভাবে ঘোষণা করেছিলেন। মযহাবগুলোর বেলায়ও একই কথা। অ-মুজতাহিদ মুসলমানদেরকে চার মযহাবের সবগুলোকেই বিশ্বাস ও স্বীকার করতে হবে, যদিও তাঁরা এগুলোর মধ্যে পার্থক্য দেখে থাকেন। কোনো অ-মুজতাহিদ যদি একটি মযহাবকে ভুল মনে করে, তাতে তা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় না। বরঞ্চ এতে প্রতীয়মান হয় সে নিজেই কম বুঝেছে এবং সে-ই ভ্রান্ত। একবার ইমাম শাফেঈ (রহ:) বলেন, 'নিজেকে (ঐশী বিধানে) সমর্পণ করা ঈমানের অর্ধেক।' এ কথা শুনে হযরত রাবে' (রহ:) বলেন, 'না, তা সম্পূর্ণ ঈমান-ই।' তাঁর এ কথায় ইমাম শাফেঈ (রহ:) সায় দেন। ইমাম সাহেব আবার বলেন, 'পরিপূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি কখনোই উসূলের জ্ঞানের ব্যাপারে কথা বলেন না; মানে এটি এ রকম কেন, কেন ও রকম নয়, এ ধরনের কোনো প্রশ্ন তিনি করেন না।' ইমাম সাহেবকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় উসূলের জ্ঞান কোনটি, তখন তিনি বলেন এটি কুরআন, সুন্নাহ ও এজমা' আল-উম্মতেরই সমষ্টি। তাঁর এই বক্তব্য স্পষ্ট প্রতীয়মান করে যে আল্লাহতা'লা ও তাঁর রাসূল (দ:) কর্তৃক প্রকাশিত সমস্ত জ্ঞানেই আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। উলামা-এ-ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত জ্ঞানের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম বলবৎ হবে। অর্থাৎ, আমাদেরকে আইম্মা-এ-মযাহিবের বাণী বিনা বাক্যে বিশ্বাস করতে ও মেনে নিতে হবে এবং এর সাথে তর্কাতর্কি করা যাবে না। তাই ইমাম ইবনে আব্দিল বিরর (বেসাল: ৪৬৩ হিজরী/১০৭১ খৃষ্টাব্দ) বলেন, 'আমাদের আইম্মা-এ-মযাহিবের মধ্যে কাউকেই তাঁদের শিষ্যদের প্রতি কোনো একটি নির্দিষ্ট মযহাব অনুসরণের আদেশ দিতে শোনা যায়নি। তাঁরা বলেছিলেন শিষ্যদের পছন্দের যে কোনো একটি মযহাবের ফতোওয়াসমূহ তাঁরা অনুসরণ করতে পারবেন। কেননা, সবগুলো মযহাব-ই আল্লাহতা'লার করুণাস্বরূপ। সহীহ বা যয়ীফ হাদীসে মহানবী (দ:) হতে এ কথা কোথাও বিবৃত হয়নি যে তিনি উম্মতের কাউকে কোনো নির্দিষ্ট একটি মযহাব অনুসরণের পক্ষে নির্দেশ দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন।'

"ইমাম আল-কুরাফী বলেন, 'হযরতে সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর সর্বসম্মত সাক্ষ্য অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি সর্ব-হযরত আবূ বকর (রা:) ও উমর (রা:)-এর ফতোওয়া মেনে চলার পাশাপাশি তাঁর বাকি বিষয়াদির বেলায় অন্যান্য সাহাবী (র:)-দেরও জিজ্ঞেস করতেন এবং তদানুযায়ী আমলও করতেন। কেউই সাক্ষী বা দলিলের খোঁজ করতেন না *[আরেক কথায়, তাবেঈন (রহ:)- মণ্ডলীর মধ্যে নও-মুসলিমবৃন্দের পক্ষে শুধু একজন সাহাবী (রহ:)-এর মযহাবকে মান্য করা সম্ভব ছিল না। কেননা, সাহাবা (রা:)- দের কারো মযহাব-ই চার মযহাবের মতো বইপত্রে নিয়মতান্ত্রিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। কোনো একজন সাহাবী (রা:)-এর সাহচর্যে থেকে প্রতিটি বিষয়ের ব্যাপারে ফয়সালা জেনে নেয়া খুব*

কম সংখ্যক মানুষের ভাগ্যেই জুটেছিল। তাই পরবর্তী প্রজন্ম সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর যে কারোর সাক্ষাৎ পেলেই এ সব বিষয়ের ফয়সালা জেনে নিতেন। জরুরাত তথা প্রয়োজনের সময় যে কোনো একটি মযহাবকে অনুসরণ করা যায়। তাবেউন (রহ:)- বৃন্দ কখনোই প্রামাণ্য দলিলের খোঁজ করেননি]। অধিকন্তু, উলেমাবৃন্দের সর্বসম্মত ঘোষণানুযায়ী, বর্তমানকালের কোনো নও-মুসলিমের পক্ষে দলিলের খোঁজ না করে কোনো একটি মযহাবের ফেকাহ মান্য করাই জরুরি। আর যদি তিনি একই মযহাবের আলেম/মুফতী না পান, তাহলে যে কোনো মযহাবের আলেমকে জিজ্ঞেস করা, এবং পরে চার মযহাবের কোনো একটির ফেকাহ শিক্ষা করে তদানুযায়ী আমল পালন করা তাঁর জন্যে জরুরি। যে একগুঁয়ে ব্যক্তি উলামামণ্ডলীর এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করতে চায়, তাকে অবশ্যই তার দাবির পক্ষে দলিল দেখাতে হবে'।" [**আল-মীযানুল আল-কুবরা**, ৪১ পৃষ্ঠা]

মিসরের মহান হানাফী ফেকাহবিদ আল্লামা সাইয়্যেদ আহমদ তাহতাবী নিজ '**হাশিয়াতু দুর্র আল-মোখতার**' গ্রন্থের 'যবায়িহ' বিষয়ে লেখেন: "মোফাসসির তথা তাফসীরবিদ উলামাদের অধিকাংশের মতে, '**তারা ধর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলবিভক্ত হয়েছে**' এই আয়াতটি উম্মতের মধ্যে আবির্ভূত বেদআতীদের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। হযরত উমর ফারূক (রা:) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলে পাক (দ:) হযরত মা আয়েশা (রা:)-কে বলেন, '**ধর্মবিষয়ে দলবিভক্ত হওয়ার ব্যাপারে নাযেলকৃত আয়াতটি এই উম্মতের মধ্যে (ভবিষ্যতে) আগমনকারী বেদআতী ও নফসানীয়াতের অনুসারী লোকদেরকেই উদ্দেশ্য করেছে**।' আল্লাহতা'লা সূরা আন'আমের ১৫৩ নং আয়াতে এরশাদ ফরমান, '**এটি-ই হচ্ছে আমার সরল পথ। সুতরাং এর অনুসরণ করো এবং ভিন্ন পথে চলো না (মানে, দলবিভক্ত হয়ো না)**।' (অর্থাৎ, ইহুদী, খৃষ্টান ও অন্যান্যরা যেভাবে বিচ্যুত হয়েছে, সেভাবে তোমরাও বিচ্যুত হয়ো না) সূরা আলে এমরানের ১০৩ নং আয়াতে আল্লাহতা'লা এরশাদ ফরমান, '**এবং আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো সবাই মিলে! আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন (মানে, দলবিভক্ত) হয়ো না**।' তাফসীরকার উলামাদের কেউ কেউ বলেন যে 'আল্লাহর রজ্জু' হচ্ছে জামাআত, ঐক্য। '**দলবিভক্ত হয়ো না**' খোদায়ী এই আজ্ঞাটি পরিস্ফুট করে যে উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য তা-ই; আর জামাআত হচ্ছেন সেই মহান উলেমাবৃন্দ যাঁরা এলম (ঐশী জ্ঞান) ও ফেকাহ-বিদ্যার অধিকারী। যে ব্যক্তি ফুকাহা (ফেকাহ-বিদ্বান)-মণ্ডলীর সাথে এক বিঘত পরিমাণ দ্বিমত পোষণ করে সে গোমরাহীতে অধঃপতিত হবে এবং আল্লাহতা'লার সাহায্যবঞ্চিত হয়ে জাহান্নামের ভাগীদার হবে। কেননা, ফুকাহা-বৃন্দ রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদীন তথা চার খলীফা (রা:)-এর পথকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। আস্ সাওয়াদ আল-আযম তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ফুকাহাবৃন্দের এই সঠিক পথের পথিক। যারা তাঁদের এই পথ থেকে বিচ্যুত হবে, তারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলে পুড়বে। ওহে ঈমানদার মুসলমান! জাহান্নাম হতে রক্ষাপ্রাপ্ত এই অনন্য সাধারণ দলটির অনুসরণ করুন। এই দলটিকেই ***আহল্ আস্ সুন্নাত ওয়াল জামাআত*** বলা হয়। কেননা, আল্লাহতা'লার সাহায্য, সুরক্ষা ও পথপ্রদর্শন শুধু এই দলটিরই প্রতি বর্ষিত হচ্ছে; আর যারা এর থেকে বিচ্যুত তাদের প্রতি তাঁর গযব (রোষ) ও শাস্তি অবধারিত হয়েছে। আজকে নাজাতপ্রাপ্ত এই দলটির বহিঃপ্রকাশ
ঘটেছে **হানাফী**, **মালেকী**, **শাফেঈ** ও **হাম্বলী** মযহাবে। বর্তমানকালে যে ব্যক্তি এই চার মযহাবের মধে কোনো একটির ফেকাহ অনুযায়ী আমল করে না, সে বেদআতীতে পরিণত হয় এবং জাহান্নামের ভাগীদারও হয়। বেদআতী লোকেরা সবাই দাবি করে তারা সঠিক পথের অনুসারী। কিন্তু এই বিষয়টি শুধু দাবি বা কল্পনার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যায় না, বরং এই পথের বিশেষজ্ঞ ও

হাদীসের আলেমমণ্ডলীর বর্ণনা দ্বারাই তা সাবেত (প্রমাণিত) হয়। এঁদের বর্ণনা সঠিক পথ ও মতভিত্তিক।” [ইমাম তাহতাবীর এই বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট হয় যে ওহাবী, শিয়া ও লা-মযহাবী/’সালাফী’ গোষ্ঠী বেদআতী, গোমরাহ ও জাহান্নামী। ইস্তাম্বুল, তুরস্ক হতে আরবীতে প্রকাশিত ‘**রাদ্দুল ওহাবী**’ বইটিতে ইমাম সাহেবের এই বক্তব্য ফটোস্ট্যাটিকভাবে সংযুক্ত আছে। মূল বইটির সর্বপ্রথম সংস্করণ ১২৬৪ হিজরী/১৮৪৮ সালে ভারতে প্রকাশিত হয়। এতে চার মযহাব যে সঠিক এবং নাজাতের পথ তা দলিলসহ প্রমাণ করা হয়েছে]

৪৩/ – ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের খুঁটি হচ্ছেন আমাদের চার আইম্মা-এ-মযাহিব। তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ও জীবনীবিষয়ক অসংখ্য বইপত্র লিখেছেন উলামা-এ-ইসলাম। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘**আল-মিনহাতুল ওয়াহবিয়্যাহ ফী রাদ্দিল ওয়াহহাবীয়্যাহ**’ পুস্তকের ‘**আশাদ্দুল জ্বেহাদ ফী এবতালি দা’ওয়া’ আল-এজতেহাদ**’ অধ্যায় এবং ‘**হেদায়াতুল মুওয়াফফিকীন**’ ও ‘**সাবিলুন্ নাজাত**’। এ সব বই তুরস্কের ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ‘**আশাদ্দুল জ্বিহাদ**’ অধ্যায় হতে নিম্নের অনুবাদটুকু তরুণ প্রজন্মের জন্যে এক্ষণে উপহারস্বরূপ পেশ করা হলো:

(১) ইমাম আবূ হানিফা (রহ:)

আহল আস্ সুন্নাহ’র চার আইম্মায়ে মযাহিবের প্রথমজন হলেন ইমামুল আযম হযরত আবূ হানিফা নু’মান ইবনে সাবেত (রহ:)। তিনি ৮০ হিজরী/৬৯৯ খৃষ্টাব্দ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০ হিজরী/৭৬৭ খৃষ্টাব্দ সালে বাগদাদে বেসালপ্রাপ্ত হন। তিনি হানাফী মযহাবের গোড়া পত্তনকারী। উসমানীয় তুর্কী, ভারত উপমহাদেশ, সাইবেরিয়া ও তুর্কিস্তানের (মধ্য এশীয় অঞ্চলসহ) মুসলমানবৃন্দ এই মযহাবের নিয়ম অনুযায়ী এবাদত-বন্দেগী পালন করে থাকেন। একটি হাদীসে মহানবী (দ:) এরশাদ ফরমান, “**আবূ হানিফা হলো আমার উম্মতের আলোকবর্তিকা**।” ইমাম সাহেবের ওয়ারা’, যুহদ, মহত্ত্ব, তীক্ষ্ণ দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা সম্পর্কে দ্বিতীয়বার উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, কেননা তাঁর এ সব গুণ সর্বজনবিদিত। ফেকাহ-শাস্ত্রীয় জ্ঞানের তিন-চতুর্থাংশই তাঁর অধিকারে। বাকি এক-চতুর্থাংশ জ্ঞান তিনি অন্য তিনজন ইমামের সাথে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। ইমাম শাফেঈ (রহ:) বলেন, “ফেকাহবিদদের জ্ঞানের উৎস হলেন ইমাম আবূ হানিফা (রহ:) ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ। যে ব্যক্তি ফেকাহ-বিদ্যা অর্জন করতে চায়, তার উচিত ইমাম সাহেব ও তাঁর শিষ্যদের শরণাপন্ন হওয়া। আমি ইমাম মালেক (রহ:)-কে জিজ্ঞেস করি তিনি ইমাম আবূ হানিফা (রহ:)-কে দেখেছিলেন কি-না। তিনি জবাবে বলেন, ‘হ্যাঁ, আমি তাঁকে দেখেছি। তিনি এমনই এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, যদি কোনো স্তম্ভকে স্বর্ণনির্মিত বলে দাবি করতেন, তবে তিনি তা সঠিক প্রমাণ করতে সক্ষম হতেন। কেউই তাঁর বিরোধিতা করে পারতেন না’।” ইতিপূর্বে মানুষেরা ফেকাহ-বিষয়ক জ্ঞানে ঘুমন্ত ছিলেন, ইমাম আবূ হানিফা (রহ:)-ই তাঁদের জাগ্রত করেন। শায়খ ঈসা ইবনে মূসা, যিনি সেই সময়কার বড় মাপের আ’বিদ (এবাদতকারী) ও যাহিদ (কৃচ্ছ্রব্রতকারী) ছিলেন, একবার তিনি আমিরুল মো’মেনীন (খলীফা) আবূ জা’ফর মনসুরের দরবারে উপস্থিত ছিলেন। এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানিফা (রহ:) সেই কক্ষে প্রবেশ করেন। শায়খ ঈসা খলীফা মনসূরকে বলেন যে এই ব্যক্তি মুসলিম বিশ্বের একজন মহান আলেম। খলীফা তখন ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন কোত্থেকে তিনি এই জ্ঞান আহরণ করেছেন। উত্তরে ইমাম আবূ হানিফা (রহ:) বলেন হযরত উমর

ফারূক (রা:)-এর শিষ্যদের কাছ থেকেই তিনি জ্ঞানার্জন করেন। অতঃপর খলীফা মনসুর বলেন, ”নিশ্চয় আপনার ভিত্ বহুত মজবুত।”

ইমামুল আযম আবূ হানিফা (রহ:) প্রতি রাতে নামায পড়তেন। একরাতে তিনি যখন কা'বা শরীফে ঘুমোচ্ছিলেন, তখন এক গায়েবী কণ্ঠের আওয়াজে তিনি জেগে ওঠেন; তিনি শুনতে পান ওই কণ্ঠস্বর তাঁর উদ্দেশ্যে বলছেন, “ওহে আবূ হানিফা! তুমি আমার আনুগত্য করেছ বিশ্বস্ততার সাথে। আমাকে তুমি জেনেছ ভালভাবে। তোমার এই ঈমানদারী ও আনুগত্য প্রকাশের কারণে তোমাকে এবং প্রলয় দিবস পর্যন্ত তোমার অনুসরণকারী সমস্ত মানুষকে আমি ক্ষমা করে দিয়েছি।” ইমাম সাহেব (রহ:) ও তাঁর মযহাবের অনুসারীদের জন্যে এটি কতোই না বড় এক শুভসংবাদ! তাঁর সুন্দর নৈতিকতা, চারিত্রিক মাহাত্ম্য ও সদগুণাবলী কেবল কোনো আ'রিফ ও মুজতাহিদ ইমামেরই থাকতে পারে। তাঁর প্রশিক্ষিত মুজতাহিদ ও পরিপক্ক আলেমদের মধ্যে সর্ব-ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ:), মালেক (রহ:), মিস'আর (রহ:), আবূ ইউসূফ (রহ:), মোহাম্মদ শায়বানী (রহ:), যুফার (রহ:) প্রমুখ মনীষীবৃন্দ তাঁর উচ্চ মর্যাদার সাক্ষী ছিলেন। ইমাম সাহেবের বিনয়ী ও লাজুক মনোভাবের জন্যে যদিও তিনি মানুষদের থেকে দূরে সরে থাকতে চাইতেন এবং নির্জনতাকে পছন্দ করতেন, তবুও রাসূলুল্লাহ (দ:) কর্তৃক হানাফী মযহাব প্রচার-প্রসারের জন্যে স্বপ্নে নির্দেশিত হয়ে তিনি ফতোওয়া দেয়া আরম্ভ করেন। ফলে তাঁর মযহাব দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর অনুসারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। তাঁর প্রতি হিংসাপরায়ণ কতিপয় লোকের আবির্ভাব ঘটলেও তারা সবাই বে-ইজ্জত হয়ে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে যায়। অনেক আলেম-উলামা ইমাম সাহেবের মযহাবের উসূল ও ফুরু' শিক্ষা করে বইপত্র লেখেন। যাঁরা তাঁর নকলী (বর্ণনাসমূহ) ও আকলী (বুদ্ধিবৃত্তিক/যুক্তিনির্ভর) দলিলগুলো দেখে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে লিখেছিলেন। যদিও আবূল ফারাজ ইবনে আল-জাওযী নিজ পুস্তকে ইমামুল আযম (রহ:)-কে হেয়কারী কিছু কাহিনী উদ্ধৃত করেন, তথাপিও তিনি সেগুলো উদ্ধৃত করেছিলেন হযরত ইমাম (রহ:)-কে হেয় প্রতিপন্ন করতে নয়, বরং এ বাস্তবতা পরিস্ফুট করতে যে তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরাও ওই সময় সক্রিয় ছিল। একই পুস্তকে ইবনে আল-জাওযী অন্যান্যদের চেয়েও বেশি প্রশংসা করেন তাঁর। ইমামুল আযম (রহ:)-এর বাবা হযরত সাবেত (রহ:) ইতিপূর্বে হযরত আলী (ক:)-এর সান্নিধ্যে গিয়েছিলেন; সাক্ষাৎকালে খলীফা (রা:) তাঁর এবং তাঁর সন্তানদের জন্যে দোয়া করেন। এই দোয়া বাস্তব রূপ লাভ করে ইমামুল আযম (রহ:)-এর বেলায়। কতিপয় সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর, বিশেষ করে হযরত আনাস বিন মালেক (রা:)-এর সোহবত লাভ করে তিনি তাবেঈনদের অন্যতম হিসেবে পরিগণিত হন।

[শায়খ আবদুল ওয়াহহাব শারানী (রহ:) লেখেন:

”আমার ‘**আদীল্লাত আল-মযাহিব**’ পুস্তকটি লেখার আগে আমি ইমাম আবূ হানিফা (রহ:) ও তাঁর শিষ্যদের এজতেহাদগুলো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে অধ্যয়ন করেছি। আমি দেখেছি, প্রতিটি এজতেহাদ-ই কোনো না কোনো আয়াতে করীমা, হাদীস শরীফ বা সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর বর্ণিত খবরের ওপর ভিত্তিশীল। সর্ব-ইমাম মালেক (রহ:), আহমদ হাম্বল (রহ:) ও শাফেঈ (রহ:)-এর মতো মহান মুজতাহিদবৃন্দ-ও ইমামুল আযম (রহ:)-এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর সম্পর্কে অন্যরা ভাল বলুক বা মন্দ বলুক, তা কোনো গুরুত্ব বহন করে না। কেননা, যারা মালেকী, হাম্বলী বা শাফেঈ মযহাবের অনুসারী, তাদের নিজ নিজ ইমাম সাহেব যাঁর প্রশংসা করেছেন, তাঁর প্রতি ভালোবাসা রাখা ও তাঁর

প্রশংসা করাও তাদের কর্তব্য। তারা তাঁকে ভালো না বাসলে নিজ নিজ মযহাবকে মান্য করতে ব্যর্থ হবে। যে ব্যক্তি কোনো একটি মযহাবের অনুসরণ করেন, তার জন্যে নিজ ইমাম আল-মযহাবকে মেনে ইমামুল আযম (রহ:)-এর প্রশংসা করা ওয়াজিব। একদিন আমি যখন ইমামুল আযম (রহ:)-এর জীবনী লিখছিলাম, তখন এক ব্যক্তি এসে আমাকে এক টুকরো কাগজ প্রদর্শন করেন। ওতে ইমাম আবূ হানিফা (রহ:) সম্পর্কে বিষোদগার করা হয়েছিল। আমি সেই ব্যক্তিকে বলি, যে লোক এ সব কথা লিখেছে, সে ইমামুল আযম (রহ:)-এর এজতেহাদগুলো বুঝতে পারেনি। ওই ব্যক্তি আমাকে জানান যে এই লেখা তিনি ফখরুদ্দীন রাযী (ইন্তেকাল: ৬০৬ হিজরী/১২০৯ খৃষ্টাব্দ)-এর বই থেকে নিয়েছেন। আমি তাকে বলি, 'ফখরুদ্দীন রাযী হচ্ছেন ইমামুল আযম (রহ:)-এর সামনে একজন শিক্ষার্থীর মতো। অথবা, কোনো সুলতানের সামনে একজন গ্রামবাসীর মতো। কিংবা রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশে ঢাকা পড়া কোনো তারকার মতো। প্রামাণ্য দলিল ছাড়া গ্রামবাসীর যেমন সুলতানকে দোষারোপ করা হারাম, ঠিক তেমনি আমাদের মতো মুকাল্লিদদের জন্যে ইমামুল আযম (রহ:)-এর এজতেহাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করা বা তাঁর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলাও হারাম, যদি না দ্বিমত করার পক্ষে এমন কোনো সুস্পষ্ট আয়াত থাকে যেটির ভিন্নতর ব্যাখ্যা দেয়া যায় না' (অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে হযরত আবদুল ওয়াহহাব শারানী শাফেঈ মযহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও ইমামুল আযমের সমালোচনা করার দায়ে আরেক শাফেঈ মযহাবের অনুসারী ফখরুদ্দীন রাযীর সমালোচনা করেন। যে সকল ধর্ম সংস্কারক মুসলমানদেরকে ধোকা দেয়ার জন্যে বলে যে হানাফী ও শাফেঈ মুসলমানবৃন্দ অতীতে সংঘর্ষে জড়িয়েছিলেন এবং ইসলাম ধর্মকে পশ্চাদগতিশীল করেছিলেন, তাদেরকে আমরা বলবো ওপরের লাইনগুলো ভালভাবে পড়ে অনবধানতা থেকে জেগে উঠতে – আল্লামা হুসাইন হিলমী)। ইমামুল আযম (রহ:)-এর এজতেহাদী কোনো সিদ্ধান্ত বুঝতে অক্ষম মুকাল্লিদদের জন্যে সেই অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব, যদি না এর পরিপন্থী কিছু প্রমাণ করা সম্ভব হয়।

"আবূ মু'তী বর্ণনা করেন যে একবার তিনি ইমামুল আযম (রহ:)-এর সাথে কুফা মসজিদে অবস্থান করছিলেন। এমতাবস্থায় সর্ব-হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ:), ইমাম মুকাতিল (রহ:), হাম্মাদ ইবনে সালামা (রহ:), ইমাম জা'ফর ইবনে সাদেক (রহ:) সেখানে তাশরীফ আনেন। তাঁরা তাঁকে বলেন, 'আমরা শুনেছি, আপনি ধর্মীয় বিষয়ে কেয়াস প্রয়োগ করেন। এটি আপনার চরম ক্ষতি করবে। কেননা, শয়তান-ই সর্বপ্রথম কেয়াস প্রয়োগ করেছিল।' ইমামুল আযম (রহ:) সকাল থেকে জুমু'আর নামাযের সময় পর্যন্ত তাঁদের প্রশ্নের জবাব দেন। তিনি তাঁর মযহাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, 'আমি প্রথমে কুরআন মজীদে খুঁজে দেখি; তাতে না পেলে হাদীস শরীফে দেখি; তাতেও না পেলে সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর এজমা' তথা ঐকমত্যের মাঝে তালাশ করি। তাতেও না পেলে (কোনো বিষয়ে) তাঁদের মতানৈক্যের মধ্য থেকে যে কোনো একটি মতকে বেছে নেই। যদি তা-ও না পাই, তবে নিজ এজতেহাদ প্রয়োগ করি।' অতঃপর তিনি কিছু উদাহরণ পেশ করেন। তাঁর জবাবের প্রেক্ষিতে প্রশ্নকারী হক্কানী উলামাবৃন্দ সবাই উঠে দাঁড়ান এবং তাঁর হাত মোবারক চুম্বন করে বলেন, 'আপনি হলেন আলেম-উলেমাদের উস্তাদ। আমাদের মাফ করবেন, অনবধানতাবশতঃ আমরা আপনাকে বিব্রত করেছি।' ইমাম আবূ হানিফা (রহ:) জবাবে বলেন, 'আল্লাহ পাক আমাকে এবং আপনাদের ক্ষমা করুন।'
"ওহে ভাই সকল! ইমামুল আযম আবূ হানিফা (রহ:) ও তাঁর মযহাবের অনুসারী ফেকাহবিদ উলেমামণ্ডলীর কুৎসা রটনা থেকে বিরত থাকুন। গণ্ডমূর্খ লোকেরা কী বল্লো বা লিখলো তাতে বিশ্বাস করবেন না! আপনারা যদি এমন ধর্ম সংস্কারকদের অনুসরণ করেন যারা ওই মহান ইমামের

আহওয়াল (আধ্যাত্মিক অবস্থা), যুহদ, ওয়ারা এবং ধর্মীয় বিষয়াদিতে তাঁর জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও দৃঢ়তা সম্পর্কে একেবারেই বে-খবর এবং যারা বলে যে তাঁর দলিলগুলো নির্ভরযোগ্য নয়, তাহলে আপনারাও তাদের সাথে পারলৌকিক শাস্তির শরীকদার হবেন। আর আপনারা যদি আমার মতো তাঁর দলিলাদি অধ্যয়ন করেন, তবে বুঝতে পারবেন যে চারটি মযহাব-ই সহীহ! যদি আপনারা মধ্যদিবসের সূর্যের মতো স্পষ্টভাবে চার মযহাবের হক্কানীয়াত (সত্যতা)-কে প্রত্যক্ষ করতে চান, তাহলে আল্লাহ-ওয়ালাদের পথকে আঁকড়ে ধরুন! তাসাউফের (সূফীতত্ত্বের) পথে অগ্রসর হোন এবং শুধুমাত্র আল্লাহতা'লার খাতিরেই আপনাদের জ্ঞান ও এবাদত-বন্দেগীকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করুন। তখন-ই আপনারা দেখতে পাবেন ইসলামী শিক্ষার উৎসমূল। আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন যে এই উৎস থেকেই চার মযহাব নিঃসৃত হয়ে সর্বত্র প্রসার লাভ করেছে এবং সেগুলোর কোনোটিতেই ইসলামের খেলাফ কোনো বিধি নেই। আইম্মা-এ-মযাহিব (রহ:) ও তাঁদের অনুসারী উলেমামণ্ডলীকে যারা ভক্তি-শ্রদ্ধা করেছেন, তাঁদের প্রতি শুভসংবাদ! আল্লাহ পাক ওই সকল ইমামকে মনুষ্যকুলের জন্যে সুখশান্তির পথপ্রদর্শক বানিয়েছেন। তাঁরা আমাদের জন্যে খোদাতা'লার মহা আশীর্বাদস্বরূপ। তাঁরা বেহেস্তের পথের পথিকৃৎ" ('**আল-মীযান আল-কুবরা**' পুস্তকের **মুখবন্ধ;** ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত '**উলামা আল-মুসলিমীন ওয়া ওয়াহহাবিউন**', ৬২ পৃষ্ঠা, ১৯৭৩ সংস্করণ)।]

(২) ইমাম মালেক (রহ:)
ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রা:) ৯৫ হিজরী মোতাবেক ৭১৫ খৃষ্টাব্দে মদীনা মোনাওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯ হিজরী/৭৯৫ খৃষ্টাব্দ সালে সেখানেই বেসালপ্রাপ্ত হন। তিনি বলেন যে সত্তরজন ইমাম তাঁকে ফতোওয়া জারি করার তাকিদ দেয়ার পর তিনি তা দেয়া আরম্ভ করেন। তিনি আরও বলেন, "আমার শিক্ষকদের মধ্যে এমন খুব কম সংখ্যক-ই ছিলেন যাঁরা আমার কাছ থেকে ফতোওয়া নেননি।" ইমাম এয়াফী-ই বলেন যে ইমাম সাহেবের এই কথাটি বড়াই করার জন্যে বলা হয়নি, বরং তা আল্লাহতা'লার রহমত-বরকত প্রকাশের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছিল। ইমাম যুরকানী মালেকী '**মুওয়াত্তা**' গ্রন্থের ওপর কৃত তাঁর শরাহ'র মধ্যে লেখেন: "ইমাম মালেক (রহ:) ছিলেন বিখ্যাত ইমাম আল-মযহাব; শীর্ষ স্থানীয় আলেমদের অন্যতম। তিনি ছিলেন সুতীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও সুনৈতিকতার অধিকারী। রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর আহাদীসের তিনি-ই ছিলেন উত্তরাধিকারী। তিনি আল্লাহতা'লার ধর্ম তাঁরই সৃষ্টির মাঝে প্রচার-প্রসার করেন। নয়'শ উলামা-এ-হাক্কানী/রব্বানীর সান্নিধ্য লাভ করে তিনি ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হন। তিনি সংকলন করেন ১ লক্ষ হাদীস। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি শিক্ষা দান আরম্ভ করেন। তাঁর প্রভাষণ শুনতে আসা শ্রোতার সংখ্যা তাঁরই শিক্ষকদের প্রদত্ত প্রভাষণের শ্রোতা সংখ্যার চেয়ে বেশি ছিল। হাদীস ও ফেকাহ শিখতে শ্রোতারা তাঁর দরজার সামনে জড়ো হতো। এতে তাঁকে বৈতনিক একজন দারোয়ান নিয়োগ করতে হয়েছিল। প্রথমে তাঁর শিষ্যদের, তারপর সর্বসাধারণের প্রত্যেককে প্রবেশাধিকার দেয়া হতো। তিনি প্রতি তিন দিনে একবার হাউজে (গোসলখানায়) গমন করতেন। হযরত ইমাম বলতেন, 'হাউজে দীর্ঘক্ষণ থাকতে আমি লজ্জাবোধ করি।' '**মুওয়াত্তা**' গ্রন্থটি লেখার সময় তিনি নিজের বিশ্বস্ততা নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েন। তিনি বইটি (হাউজের) পানিতে রাখেন। তিনি এ সময় বলেন, 'যদি বইটি ভিজে যায়, তাহলে এর কোনো প্রয়োজন আর আমার কাছে থাকবে না।' আশ্চর্য, বইটির কোনো অংশ-ই ভেজে নি।" আবদুর রহমান ইবনে আনাস (রহ:) বলেন, "হাদীসের জ্ঞানে ইমাম মালেক (রহ:)-এর চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য আর কেউই বর্তমান পৃথিবীতে নেই। তাঁর চেয়ে জ্ঞানী আর কাউকেই আমি দেখিনি। হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ:) হাদীসের একজন ইমাম, কিন্তু তিনি সুন্নাহ'র

ইমাম নন। আল-আওযাঈ (রহ:) সুন্নাহ'র ইমাম, কিন্তু হাদীসের ইমাম নন। ইমাম মালেক (রহ:)-ই হাদীস ও সুন্নাহ উভয়েরই ইমাম।" ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহ:) বলেন, "ইমাম মালেক (রহ:) হলেন দুনিয়ার বুকে আল্লাহতা'লার সৃষ্টিকুলের জন্যে মহান প্রভুর সাক্ষীস্বরূপ।" ইমাম শাফেঈ (রহ:) বলেন, "যেখানেই হাদীস অধ্যয়ন করা হবে, ইমাম মালেক (রহ:) সেখানে আকাশের তারকাসদৃশ। (এতদসংক্রান্ত) জ্ঞানের মুখস্থকরণ, উপলব্ধি ও সংরক্ষণে কেউই ইমাম মালেক (রহ:)-এর মতো হতে পারবেন না। আল্লাহ-সম্পর্কিত জ্ঞানেও কেউ তাঁর মতো আস্থাভাজন নন। আল্লাহ পাক ও আমার মাঝে সাক্ষী হলেন ইমাম মালেক (রহ:)। ইমাম মালেক (রহ:) ও হযরত সুফিয়ান ইবনে উবায়না (রহ:) না হলে এতোদিনে হেজায অঞ্চল থেকে জ্ঞান তিরোহিত হতো।" হযরত আবদুল্লাহ (রহ:) যখন তাঁর পিতা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ:)-কে জিজ্ঞেস করেন কে ইমাম যাহরী (রহ:)-এর শিষ্যদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী, তখন তিনি জবাবে বলেন ইমাম মালেক (রহ:)-ই (ইসলামী) জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় সবচেয়ে বেশি জানেন। ইবনে ওয়াহহাব বলেন, "ইমাম মালেক (রহ:) ও লায়েস (রহ:) না হলে আমরা সবাই পথভ্রষ্ট হতাম।" ইমাম মালেক (রহ:)-এর নাম মোবারক যখনই আল-আওযাঈ (রহ:) শুনতেন, তৎক্ষণাৎ তিনি বলতেন, "তিনি জ্ঞানীদের মাঝে সর্বাধিক জ্ঞানী এবং মদীনা মোনাওয়ারার সেরা আলেম; আর তিনি মুফতী-এ-হারামাইন শরীফাইন-ও।" হযরত ইমামের বেসাল হওয়ার খবর শুনে হযরত সুফিয়ান ইবনে উবায়না (রহ:) বলেন, "তাঁর মতো কাউকে আর বর্তমানে ধারণ করে না এই পৃথিবী। তিনি ছিলেন এই দুনিয়ার ইমাম, হেজায অঞ্চলের আলেম, তাঁর সময়ের সাক্ষী এবং উম্মতে মোহাম্মদীয়ার সূর্যতুল্য পুণ্যাত্মা। আমাদেরও তাঁর পথে চলতে হবে।" ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ:) বলেন যে ইমাম মালেক (রহ:) হযরত সুফিয়ান আস্ সাওরী (রহ:), ইমাম লায়েস, ইমাম হাম্মাদ ও আল-আওযাঈ (রহ:)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হযরত সুফিয়ান ইবনে উবায়না (রহ:) জানান যে নিম্নের হাদীসটি ইমাম মালেক (রহ:)-কেই উদ্দেশ্য করে বিবৃত হয়েছে; মহানবী (দ:) এরশাদ ফরমান, "**মানুষদের যখন (কারোর খোঁজ করা) জরুরি প্রয়োজন দেখা দেবে, তখন তারা মদীনায় অবস্থিত আলেমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কাউকে পাবে না**।" ইমাম মালেক (রহ:) বলেন যে তিনি প্রতি রাতেই রাসূলুল্লাহ (দ:)-কে স্বপ্নে দেখতেন। মুসা'আব বর্ণনা করেন তাঁরই পিতা হতে শ্রুত বাণী, যিনি বলেন, "ইমাম মালেক (রহ:) ও আমি একবার মসজিদে নববীতে অবস্থান করছিলাম। কেউ একজন এসে জিজ্ঞেস করেন আমাদের মধ্যে কে আবূ আব্দিল্লাহ মালেক (রহ:)। আমরা ইমাম সাহেবকে দেখিয়ে দেই। ওই ব্যক্তি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে কপালে চুম্বন করেন। অতঃপর তিনি বলেন, 'আমি স্বপ্নে দেখেছি হুযূর পূর নূর (দ:) এখানে বসে আছেন। তিনি আদেশ দেন, মালেককে ডাকো। আপনি কাঁপতে কাঁপতে ছুটে আসেন। মহানবী (দ:) এরশাদ করেন, এয়া আবা আবদ-আল্লাহ, শান্ত হও! বসো এবং নিজ বক্ষ বিদীর্ণ করো! অতঃপর আপনার বক্ষ বিদীর্ণ হলে সর্বত্র সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে।' এ কথা শুনে ইমাম মালেক (রহ:) অনেক কাঁদেন। তিনি বলেন, এই স্বপ্নকে জ্ঞান হিসেবে ব্যাখ্যা করতে হবে।"

(৩) ইমাম শাফেঈ (রহ:)

ইমাম শাফেঈ (রহ:)-এর পুরো নাম মোহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস ইবনে আব্বাস ইবনে উসমান ইবনে শাফেঈ। তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে ৮ম প্রপিতামহ হাশেম ইবনে আব্দিল মোত্তালেবের চাচা হাশেম ছিলেন রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর পূর্বপুরুষ। ইমাম সাহেবের ৫ম প্রপিতামহ সায়িব বদরের যুদ্ধে শত্রু পক্ষে অবস্থান করলেও পরবর্তীকালে তিনি ও তাঁর ছেলে শাফেঈ সাহাবী হবার মর্যাদা লাভ করেন।

এই কারণে ইমাম সাহেবকে 'আশ্ শাফেঈ' বলা হয়। তাঁর মাতা সাহেবানী ছিলেন একজন শরীফা, মানে ইমাম হাসান (রা:)-এর বংশধর। ইমাম শাফেঈ (রহ:)-এর জন্ম গাযায় ১৫০ হিজরী মোতাবেক ৭৬৭ সালে এবং বেসাল মিসরে ২০৪ হিজরী/৮২০ সালে। দু'বছর বয়সে তাঁকে মক্কা মোকাররমায় নেয়া হয়, যেখানে তিনি শৈশবকালে আল-কুরআন হেফয করেন এবং মাত্র ১০ বছর বয়সে ইমাম মালেক (রা:)-এর '**মুওয়াত্তা**' হাদীসের গ্রন্থটি মুখস্থ করেন। পনেরো বছর বয়সে তিনি ফতোওয়া জারি আরম্ভ করেন। একই বছর তিনি মদীনা মোনাওয়ারায় যান এবং সেখানে ইমাম মালেক (রহ:)-এর কাছ থেকে ইসলামী জ্ঞান ও ফয়েয (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) লাভ করেন। তিনি বাগদাদে আসেন ১৮৫ হিজরী সালে। দু'বছর পরে তিনি হজ্জ্ব উপলক্ষে মক্কা মোয়াযযমায় গমন করেন। হিজরী ১৯৮ সালে তিনি আবার বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৯৯ সালে মিসরে বসতি আরম্ভ করেন। তাঁর বেসাল শরীফের দীর্ঘকাল পরে কেউ কেউ তাঁর জিসম মোবারক বাগদাদে ফেরত নিতে চাইলে তাঁর মাযার খনন করা হয়। ওই সময় মাযার শরীফ থেকে কস্তুরিগন্ধ বের হয়ে খননকারী লোকদেরকে বেহাল করে দেয়। তারা খনন কাজ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ইসলামী জ্ঞান, এবাদত-বন্দেগী, যুহদ, মা'রেফত, ধীশক্তি, স্মরণশক্তি ও কুলপরিচয়ে তিনি ছিলেন তাঁর সময়কার ইমামবৃন্দের পাশাপাশি তাঁর আগেকার ইমামদেরও পুরোধা। তাঁর মযহাব দূর-দূরান্তে প্রসার লাভ করে। আল-হারামাইন ও আল-আরদ্ আল-মুকাদ্দাস (প্যালেস্টাইন)-এর অধিবাসীরা সবাই শাফেঈ মযহাবের অনুসারী হন। ইমাম শাফেঈ (রহ:) ছিলেন নিম্নবর্ণিত হাদীসে কৃত ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তব রূপ; মহানবী (দ:) এরশাদ ফরমান, "**কুরাইশ গোত্রের আলেম-ব্যক্তি পৃথিবীকে জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ করবেন**।" ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ:)-এর পুত্র আবদুল্লাহ তাঁর বাবাকে ইমাম শাফেঈ (রহ:)-এর জন্যে কেন এতো বেশি বেশি তিনি দোয়া করেন এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তাঁর বাবা ইমাম সাহেব জবাবে বলেন, "ওহে পুত্র! মানুষের মাঝে ইমাম শাফেঈ (রহ:)-এর মর্যাদা হলো আকাশে সূর্যের উপস্থিতির মতো। তিনি আত্মার (ব্যাধি) নিরাময়কারীস্বরূপ।" ওই দিনগুলোতে '**মুওয়াত্তা**' হাদীসগ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল ৯৫০০ হাদীস। পরবর্তীকালে তা থেকে যাচাই-বাছাই করে বর্তমানের ১৭০০টি হাদীসের সংকলন হিসেবে এটি আকৃতি পায়। ইমাম শাফেঈ (রহ:)-এর উপনাম ছিল '**নাসিরুস্ সুন্নাহ**' (ধর্মের সাহায্যকারী)। মাত্র চার বছরের অল্প সময়ে তিনি একটি মযহাবের গোড়াপত্তন করার ঘটনাটি সত্যি বিস্ময়কর। ইমাম সাহেবের জীবনী ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে ৪০টিরও বেশি বই অদ্যাবধি লেখা হয়েছে।

(৪) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ:)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আশ্ শায়বানী আল-মারুযী (রহ:)-এর জন্ম ১৬৪ হিজরী মোতাবেক ৭৮০ সালে বাগদাদ নগরীতে এবং বেসালও সেখানেই ২৪১ হিজরী/৮৫৫ সালে। তিনি হাদীস ও ফেকাহ উভয় শাস্ত্রেই ইমাম ছিলেন। সুন্নাহ'র সূক্ষ্ম ও অন্তর্নিহিত বিষয়গুলোতেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। যুহদ ও ওয়ারায় তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। হাদীস সংগ্রহের উপলক্ষে তিনি কুফা, বসরা, মক্কা মোয়াযযমা, মদীনা মোনাওয়ারা, ইয়েমেন, দামেশক ও মেসোপটেমিয়ায় ভ্রমণ করেন। ইমাম সাহেব ফেকাহ-শাস্ত্র ইমাম শাফেঈ (রহ:)-এর কাছে শিক্ষা করেন, যিনি পাল্টা তাঁর কাছ থেকে হাদীস-শাস্ত্র শিক্ষা করেন। ইবরাহীম আল-হারবী বলেন, "আমি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ:)-কে দেখেছি। আল্লাহতা'লা তাঁকে ইসলামী জ্ঞানের সকল শাখায় সমৃদ্ধ করেছিলেন।" কুতায়বা ইবনে সাঈদ বলেন, "যদি ইমাম আহমদ (রহ:) সর্ব-হযরত (সুফিয়ান) সাওরী (রহ:), আল-আওযাঈ

(রহ:), ইমাম মালেক (রহ:) ও লায়েস্ ইবনে সাআদ (রহ:) প্রমুখের যুগে জীবিত হতেন, তবে তিনি সবাইকে ছাড়িয়ে যেতেন।” তিনি দশ লক্ষ হাদীস মুখস্থ করেছিলেন। ইমাম শাফেঈ (রহ:) একবার তাঁকে মিসর থেকে একখানি পত্র পেরণ করেন। এই চিঠি পড়ার সময় তিনি কাঁদতে থাকেন। তাঁকে কাঁদবার কারণ জিজ্ঞেস করার পরে তিনি জবাব দেন, “ইমাম শাফেঈ (রহ:) স্বপ্নে দেখেন রাসূলুল্লাহ (দ:)-কে, যিনি তাঁকে আদেশ করেছেন এই বলে, ‘আবূ আব্দিল্লাহ আহমদ ইবনে হাম্বলকে আমার সালাম-সহ একটি পত্র লেখো। কুরআন মজীদ সৃষ্টি কি-না সে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। তাকে বলবে ওই প্রশ্নের উত্তর না দিতে’।” আট লক্ষ পুরুষ ও ৬০,০০০ মহিলা ইমাম সাহেব (রহ:)-এর জানাযায় শরীক হন। যেদিন তিনি বেসালপ্রাপ্ত হন, সেই দিন ২০,০০০ ইহুদী, খৃষ্টান ও প্রাচীন পারসিক পুরোহিত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।
আহলুস্ সুন্নাহ’র এই চার আইম্মা-এ-মযাহিব ইসলামী ২য় শতকের সেরা আলেম ছিলেন, যেমনটি প্রশংসিত হয়েছে হাদীস শরীফে। এঁরা সবাই সেই ‘গুরুজনদের’ অন্তর্ভুক্ত যাঁরা নিম্নের আয়াতে করীমায় উল্লেখিত হয়েছেন: “**সততায় (সত্যনিষ্ঠায়) তাদেরকে (সাহাবাবৃন্দকে) যারা অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন**।” তাঁদেরকে অনুসরণ না করে কেউ যদি সবচেয়ে খারাপ জমানার গণ্ডমূর্খ ও হীন প্রকৃতির কাউকে অনুসরণ করে, তাহলে এই কাজ তার আহাম্মকি-ই প্রকাশ করবে মাত্র। আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান, “**উলূল্ আমর-কে অনুসরণ করো**!” উলূল আমর হলেন সে সকল উলামা বা রাষ্ট্রপক্ষ যাঁরা ‘উলেমা-এ-হাক্কানী’দের ফতোওয়া অনুযায়ী ধর্মানুশীলন করেন। উভয় ব্যাখ্যা মোতাবেক-ই আইম্মা-এ-মযাহিবকে মান্য করা ওয়াজিব। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী এই আয়াতটি থেকেই সিদ্ধান্ত নেন যে কেয়াস শরীয়তের একটি দলিলস্বরূপ; আর উলেমাবৃন্দকে আনুসরণ করা মুকাল্লেদদের জন্যে ওয়াজিব-ও। অধিকন্তু, উসূলের উলেমা-মণ্ডলীর সর্বসম্মতি অনুসারে নির্ধারিত হয় যে মোতলাক মুজতাহিদ নন এমন আলেমবৃন্দও মোকাল্লেদ হিসেবে পরিগণিত হবেন। সূরা নেসা’র ১১৪তম আয়াতে উপলুব্ধ হয় যে মুজতাহিদদের সর্বসম্মতি হতে বিচ্যুতি একেবারেই হারাম। [**এজমা’** ও **কেয়াস** সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে আল-হুসামীর **’আল-মোনতাহাব ফী উসূলিল্ মযহাব’** শীর্ষক গ্রন্থে। এটি পাকিস্তানে দ্বিতীয়বার সম্পাদিত হয় এরই ব্যাখ্যামূলক বই **‘হামী’** সহ। মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ হুসামউদ্দীন আল-হুসামী ফারগানায় ৬৪৪ হিজরী/১২৪৬ সালে ইন্তেকাল করেন। এ বইয়ের ৩৩তম অধ্যায়ও দেখুন]

৪৪/ – মওলানা আবদুল গনী নাবলুসী (রহ:) লেখেন: “একটি আয়াতে করীমায় এরশাদ হয়েছে, ‘**আল্লাহ তা’লা তাঁর বান্দাদের বিষয়াদি সহজসাধ্য বা সুবিধাজনক করতে চান। তিনি তাদেরকে কষ্ট দিতে চান না**।’ একখানি হাদীসে ঘোষিত হয়েছে, ‘**আল্লাহ পাক যেমন আমাদের আযিমাত পালন করাকে পছন্দ করেন, ঠিক তেমনি তিনি আমাদের রুখসাত পালনকেও পছন্দ করেন**।’ আরেক কথায়, তিনি যে সকল রুখসাত পালনের অনুমতি আমাদের দিয়েছেন, তিনি চান আমরা তা পালন করি। এ কথাকে আবার ভুল বোঝা উচিত নয়। ‘**আল-জামেউস্ সাগীর**’ গ্রন্থের ওপর কৃত নিজ ব্যাখ্যামূলক পুস্তকে ইমাম মানাবী (রহ:) লেখেন, ‘মযহাবগুলোর রুখসাত একত্রিত করে রূখসাতের একটি নতুন মযহাব প্রতিষ্ঠা করার কোনো অনুমতি নেই। এ রকম করার মানে হবে ইসলামের সাথে ভিন্নমত পোষণ।’ ইবনে আব্দিস্ সালাম (রহ:) বলেন যে এর অনুমতি আছে, তবে শর্ত হলো ইসলাম হতে বিচ্যুত হওয়া চলবে না। ইমাম সুবকী (রহ:) বলেন, ‘জরুরাত তথা একান্ত প্রয়োজনের সময় কারো জন্যে সহজতর কোনো

মযহাবে নিজেকে স্থানান্তর করার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু জরুরি প্রয়োজন ছাড়া এটি অনুমতিপ্রাপ্ত নয়। কেননা, সে ক্ষেত্রে ধর্ম রক্ষার খাতিরে নয়, বরং নিজের সুবিধার স্বার্থেই তা করা হবে। কারো জন্যে ঘন ঘন নিজের মযহাব পরিবর্তনের কোনো অনুমতি-ই নেই।' কোনো একটি মযহাবের তাকলীদ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আমি আমার 'খোলাসাতুত্ তাহকিক ফী বয়ানি হুকমিত্ তাকলীদ ওয়াত্ তালফিক' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছি [হাকীকত কিতাবেভী, ইস্তাম্বুল হতে ১৯৭৪ সালে মূল আরবী গ্রন্থের ফটোগ্রাফিক ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে]।

"**হিলাত শরীয়্যা** (ইসলামের কোনো সুপ্রসিদ্ধ নিয়মে কার্য সমাধা করা না গেলে কম জ্ঞাত অন্য কোনো সুবিধাজনক নিয়ম মেনে তা সম্পন্নকরণ) ব্যবহার করে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল বানানোর কোনো অনুমতি-ই নেই। অর্থাৎ, এটি আল্লাহতা'লার অনুমোদিত কোনো রুখসাত নয়। অন্য একটি মযহাবের তাকলীদ সম্পর্কে ব্যাখ্যাকালে ইবনে আল-ইযয্ আদ্ দীন জামাআ' (রহ:) লেখেন, 'আইম্মা-এ-মযাহিবের কথা না বুঝে বা হিলাত শরীয়্যা বিষয়ে না জেনে কারো দ্বারা নিজের খায়েশ মেটাবার জন্যে হিলাত শরীয়্যাকে অজুহাত বানানো এড়িয়ে চলা উচিত।' এটি নিশ্চিত যে মুকাল্লিদরা হিলাত শরীয়্যা সম্পর্কে কিছুই জানে না; আর তারা এই 'হিলা' শব্দটি আইম্মা-এ-মযাহিব হতে শুনে নিজেদের খায়েশ অনুযায়ী ব্যবহার করছে। ইমামুল আযম হযরত আবূ হানিফা (রহ:) বলেন যে হিলাত শরীয়্যা শিক্ষা দানকারী মুফতীদেরকে শাস্তি দিতে হবে। "আল্লাহতা'লার আদেশ-নিষেধ পালনকালে অসুবিধার সম্মুখীন মুসলমানদের জন্যে যে সব সুবিধার অনুমতি তিনি দিয়েছেন, সেগুলোই হচ্ছে তাঁর পছন্দকৃত রুখসাত। তবে ঐশী আদেশ মান্য করাকে এড়িয়ে চলার অথবা নিজের বুঝ ও যুক্তির অনুকূল সুবিধা তালাশ করার কোনো অনুমতি-ই নেই। নাজমুদ্দীন আল-গাযযী তাঁর প্রণীত '**হুসন আত্ তানাব্বুহ**' গ্রন্থে লেখেন, 'আল্লাহতা'লার অনুমতিপ্রাপ্ত রুখসাতগুলো কাউকে পালন করতে দেয় না ইবলিস্ শয়তান। উদাহরণস্বরূপ, সে ওই ব্যক্তিকে (পায়ে পরিহিত) চামড়ার মোজার ওপর (ওযূর সময়) মসেহ করতে দেয় না। সে তাকে পা ধুয়ে নিতে বাধ্য করে। প্রত্যেকেরই রুখসাতসমূহ পালন করা উচিত, কিন্তু সার্বক্ষণিক মযহাবগুলোর রূখসাত তালাশ করা উচিত নয়। কেননা, মযহাবগুলোর সুবিধাসমূহ একত্রিত করা হারাম। এটি একটি শয়তানী পথ।'

"বেশির ভাগ সালাফ আস্ সালেহীন (প্রথম দুই ইসলামী শতকের পুণ্যবান মুসলমান)-বৃন্দ কষ্টসাধ্য পরিশ্রম করেন। তাঁরা এবাদত-বন্দেগীতে ছিলেন নিরলস। তোমরা তাঁদের মতো (কঠিন সাধনাকারী) হতে পারবে না! অতএব, কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফে স্পষ্টভাবে বিবৃত রুখসাত (সহজ পদ্ধতি)-গুলো গ্রহণ করো, কিন্তু ওই সকল মহান সালাফ আস্ সালেহীনের সমালোচনা করো না! তাঁরা তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁরা যা জানতেন, তোমরা তা জানো না। তোমরা যে বিষয় সম্পর্কে জানো না বা বুঝো না, তাতে নাক গলিও না; আর ওই পুণ্যাত্মাদের অনুসরণ করো না (মানে তাঁদের মতো নিজেদেরকে মুজতাহিদ মনে করে সিদ্ধান্ত নিও না)। কুরআন ও হাদীস থেকে তোমরা যা বুঝো, তার ওপর নির্ভর করে ওই মহান সিদ্ধপুরুষদের বিরোধিতা করো না! তাঁরা তোমাদের চেয়ে কুরআন-হাদীস ঢের ভাল বুঝতেন। তোমাদের চেয়ে রাসূলে খোদা (দ:)-এর জমানার কাছাকাছি সময়ের হওয়ায়, তাঁদের বিচার-বুদ্ধি আল্লাহর মা'রেফতের (ভেদের রহস্যের) আলো দ্বারা আলোকিত হওয়ায়, তাঁদের দ্বারা সুন্নাহকে পুরোপুরিভাবে আঁকড়ে ধরায়, আর তাঁদের এখলাস্ (আল্লাহর খাতিরে সব কিছু করার ন্যায়নিষ্ঠা), ঈমান, তাওহীদ (আল্লাহর একত্বে দৃঢ় বিশ্বাস) ও যুহদ (দুনিয়ার মহব্বত ত্যাগ) অনেক বেশি হওয়ায়

তাঁরা তোমাদের বা তোমাদের মতো মানুষের চেয়ে ঢের বেশি জানতেন। ওহে (বর্তমানকালের) ধর্মীয় পদে অধিষ্ঠিত হতভাগা! তোমার পেট ও নফসের খায়েশ মেটাবার জন্যে তুমি রাত-দিন চিন্তারত ও চেষ্টারত। ওগুলো পূরণের উদ্দেশ্যে তুমি কিছু ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ করেছ। তোমার এই ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে তুমি নিজেকে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে কর্তৃত্বশীল মনে করছো। তুমি পুণ্যবান সালাফ আস্ সালেহীনের সাথে প্রতিযোগিতা করার অপপ্রয়াস পাচ্ছো। ইসলামের ওই মহাত্মামণ্ডলী যাঁরা ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানে নিজেদের সারা জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং নিজেদের অন্তরকে নেক আমল দ্বারা পরিশুদ্ধ করেছেন, আর হালাল খাদ্য গ্রহণ ও হারাম বর্জন করার মহৎ উদ্দেশ্যে কঠোরভাবে মোশতাবিহাত (সন্দেহজনক বিষয়) পরিহার করেছেন, তাঁদের কুৎসা রটনা করো না! তাঁরা তোমার চেয়ে বহু উচ্চে রয়েছেন। তোমার এই অবস্থা হচ্ছে পানাহারের ক্ষেত্রে কোনো বাজপাখির সাথে চড়ুই পাখির প্রতিযোগিতা করার মতোই ব্যাপার। ওই পুণ্যাত্মা সিদ্ধপুরুষদের মোজাহাদা, রেয়াযত, এবাদত, এজতেহাদ ও কথাবার্তা ছিল কুরআান মজীদ ও হাদীস শরীফের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। সালাফ আস্ সালেহীনবৃন্দ নিজেরা আযিমত অনুযায়ী আমল (অনুশীলন) করতেন, কিন্তু মুসলমানদেরকে রুখসাত অনুযায়ী আমল করানোর লক্ষে ফতোওয়া জারি করতেন।
”অধিকাংশ আহলে সুন্নাতের আলেম বলেন যে স্রেফ ঈমান কবুল তথা গ্রহণ করা সহীহ (বৈধ) হবে, যদিও ঈমানের এ ধরনের মোকাল্লিদ অবাধ্য ও পাপী হতে পারেন। কেননা, তিনি এস্তেদলাল (দলিল দ্বারা নিশ্চিতকরণ) ত্যাগ করেছেন। আরেক কথায়, চিন্তা বা উপলব্ধি ব্যতিরেকে অন্যের কাছ থেকে শিখে কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তিনি মো'মেন বা বিশ্বাসী মুসলমান বলে সাব্যস্ত হবেন। আউলিয়া কেরাম (রহ:)-এর কারামত সত্য। হায়াতে জিন্দেগী বা বেসালের পরেও তাঁদের কারামত বিদ্যমান। হযরত মরিয়ম, আসহাবে কাহাফ এবং হযরত সুলাইমান (আ:)-এর উজির আসফ বিন বারখিয়ার কারামাতের কথা আল-কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে। **কারামত** হচ্ছে আহলে সুন্নাতের উলামা-এ-হক্কানী/রব্বানীবৃন্দের দ্বারা সংঘটিত যুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে উপলব্ধির অতীত অলৌকিক ঘটনাবলী। আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কারো দ্বারা কারামত সংঘটিত না হওয়ায় বাহাত্তরটি ভ্রান্ত দলের কোনোটি-ই কারামতে বিশ্বাস করে না।

”বিভিন্ন আয়াত বা হাদীসের মধ্য হতে কোনো একটিকে দলিল হিসেবে খোঁজার ও বাছাইয়ের সময় একজন মুজতাহিদ ভুল করেন না। তবে তিনি তাঁর প্রাপ্ত দলিল হতে আইন-কানুন বের করার সময় ভুল করতে পারেন। অতএব, যে মুজতাহিদ এ কাজে ভুল করেননি, তাঁকে দশটি সওয়াব দেয়া হবে; অপর দিকে যিনি ভুল করেছেন, তিনি পাবেন একটি সওয়াব। রাসূলুল্লাহ (দ:) যে সব ব্যাপারে হযরত আমর ইবনে আল-আস্ (রা:) কোনো নস্ (শরয়ী দলিল) খুঁজে পেতেন না, সে সব ক্ষেত্রে তাঁকে নির্দেশ দেন, '**তুমি নিজে আইন-কানুন বের করবে! ভুল না করলে তুমি পাবে দশটি সওয়াব; আর ভুল করলে একটি**।' ওই একটি সওয়াব পাওয়া যাবে মুজতাহিদের এজতেহাদ-সংশ্লিষ্ট পরিশ্রমের কারণে নয়, বরং তাঁর সঠিক দলিল পাওয়ার কারণেই। এতেও যদি তিনি ব্যর্থ হন (মানে দলিল না পান), তাহলে তাঁকে কোনো সওয়াব দেয়া হবে না। তবে যারা ওই এজতেহাদের অনুসারী হবেন, তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না। আল্লাহতা'লার দৃষ্টিতে (কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে) বিভিন্ন এজতেহাদের মাঝে কেবল একটি-ই সঠিক এবং অন্যগুলো ভুল হিসেবে গৃহীত। মো'তাযেলা সম্প্রদায়ের পণ্ডিতদের মতে, কোনো মুজতাহিদ কখনোই ভুল করেন না, আর সঠিক হওয়ার ব্যাপারটিতেও তারতম্য বা বিভিন্নতা রয়েছে। এজতেহাদ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে

‘মিরআত আল-উসূল’ পুস্তকে, যেটি ‘মিরকাত আল-উসূল’ গ্রন্থেরই একখানি ব্যাখ্যা। উভয়ই মোল্লা খসরু কর্তৃক প্রণীত।

”একটি হাদীস শরীফে ঘোষিত হয়েছে যে (ইসলামের) তৃতীয় শতকের পরে মিথ্যে ও কুৎসা রটনা বৃদ্ধি পাবে। বেদআত ও গোমরাহীও বৃদ্ধি পাবে। আকীদা-বিশ্বাস ও আমলের ক্ষেত্রে সালাফ আস্ সালেহীনবৃন্দের পথ হতে বিচ্যুত ভ্রান্তদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফ আস্ সালেহীনের এজমা’ (ঐকমত্য)-কে আঁকড়ে ধরে থাকা ফেকাহ’র উলামা-মণ্ডলী ও তাসাউফের (সূফীতত্ত্বের) সালিকূন তথা পথিকবৃন্দ এ থেকে নাজাত (মুক্তি/পরিত্রাণ) পাবেন; অন্যান্যরা শাস্তি ভোগ করবে। দুনিয়ার শেষ অবধি ফেকাহ’র উলামা ও তাসাউফের বিজ্ঞ সূফীবৃন্দ অস্তিত্বশীল বা টিকে থাকবেন। তবে তাঁরা কারা তা নিশ্চিতভাবে জানা যাবে না। শুধু মুসলমান সম্প্রদায় যাঁদেরকে সর্বসম্মতভাবে স্বীকার করবেন, তাঁরাই (দুনিয়াতে) পরিচিতি পাবেন।

”এলম-এ-হাল (কোনো একটি মযহাবের বইপত্র, নীতি-আদর্শ) শিক্ষা করা (প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে) ফরযে আইন। আল্লাহতা’লা এরশাদ ফরমান, ‘**জ্ঞানীদেরদের জিজ্ঞেস করে শেখো**।’ তাই যারা জানেন না, তাদের জন্যে উলামা-এ-কেরামের কাছ থেকে বা তাঁদের বইপত্র থেকে জ্ঞান শিক্ষা করা জরুরি। এই কারণেই একটি হাদীসে মহানবী (দ:) এরশাদ করেন, ‘**প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্যে জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরয তথা বাধ্যতামূলক**।’ এই সকল আদেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান করে যে অন্তর ও শরীর দ্বারা পালনীয় সকল বিষয়ই এলম আল-হাল বইপুস্তক হতে শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং ধর্মীয় পদে অধিষ্ঠিত গণ্ডমূর্খ লা-মযহাবী/’সালাফী’ লোকেরা যা বলে বা লেখে তাতে আমাদের বিশ্বাস করাও উচিত নয়।

”সত্য, সঠিক পথের উলামা-এ-কেরাম সর্বসম্মতভাবে ঘোষণা করেছেন যে প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে তাঁর দৈনন্দিন জীবনে ও এবাদত-বন্দেগীতে আহলুস্ সুন্নাহ’র আকীদা-বিশ্বাস সংক্ষিপ্তভাবে এবং ফরয ও হারাম বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে জানা ফরযে আইন (বাধ্যতামূলক)। তিনি যদি এগুলো এলম-এ-হাল বইপুস্তক থেকে শিক্ষা না করেন, তাহলে তিনি হয় গোমরাহ-পথভ্রষ্ট, নয়তো অবিশ্বাসীতে পরিণত হবেন। এর চেয়ে বেশি, অর্থাৎ, আরবী ভাষা, তাফসীর, হাদীস, বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্র ইত্যাদির বারোটি মৌলিক শাখায় জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরযে কেফায়া (মানে মুসলমান সমাজে অন্তত একজনকে এগুলো শিখতে হবে)। কোনো শহরে যদি একজন মুসলমান তা (ফরযে কেফায়া) শিক্ষা করেন, তাহলে ওই শহরের অন্যান্য অধিবাসীদের জন্যে তা শেখা আর ফরয হবে না, বরং মোস্তাহাব (পছন্দনীয়) হবে। শহরে ফেকাহ’র বইপত্র সংরক্ষণ করা ইসলামী উলামাদের সেখানে অবস্থানের মতোই ব্যাপার। ওই ধরনের শহরে তাফসীর, হাদীস এবং ফেকাহ শাস্ত্রের মধ্যে প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত কোনো কিছু শিক্ষা করা কারো জন্যে ফরয নয়, বরং মোস্তাহাব। অধিকন্তু, ইসলামী আইন-কানুনের প্রামাণ্য দলিল খুঁজে বের করা বা সেগুলো অধ্যয়ন করা কারো জন্যে কখনোই ফরয নয়; যদিও তা সব সময়ই উলামাদের জন্যে মোস্তাহাব। মোস্তাহাব এই সব জ্ঞানের শাখা অধ্যয়ন করা নফল এবাদত পালনের চেয়েও সওয়াবদায়ক। যেখানে কোনো খলীফা নেই, সেখানে উলামাবৃন্দ তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন। যে সকল উলামা

তাঁদের এলম বা জ্ঞান অনুযায়ী আমল তথা কর্ম অনুশীলন করেন, তাঁদেরকে মান্য করা ওয়াজিব।”
[মওলানা আবদুল গনী নাবলুসী (রহ:) কৃত ‘**আল-হাদিকাত আন্ নদীয়্যা**’, ১ম খণ্ড, ৩য় অধ্যায়]

৪৫/ – সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর যুগ হতে ইসলামকে ভেতর থেকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে ধর্মের শত্রুরা আলেম-উলামার ছদ্মবেশে মুসলমানদেরকে ধোকা দিতে অপতৎপর হয়েছে। ধর্মীয় পদে অধিষ্ঠিত এ লোকদেরকে ‘**যিনদিক**’, ’**ধর্ম সংস্কারক**’ বা ‘**বিজ্ঞানের গোঁড়ামিসম্পন্ন ব্যক্তি**’ বলা হয়। এরা প্রতি শতাব্দীতেই অজ্ঞ-মূর্খদেরকে ধোকা দিয়ে ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত করেছে; তবে তারা খোদ ইসলাম ধর্মের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। কেননা, প্রতি শতাব্দীতেই অসংখ্য ফেকাহবিদ আলেম ও তাসাউফের মহান শায়খবৃন্দ তাঁদের প্রভাষণ (ওয়ায-নসীহত) ও লেখনী দ্বারা মুসলমানদেরকে এই ধোকাবাজির ফাঁদে পা দেয়া থেকে সতর্ক করেছেন। কিন্তু এখন ইসলামের প্রকৃত আলেম-উলামা (বোযর্গমণ্ডলী)-এর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, আর দ্বীনের শত্রুরাও সুযোগ পেয়ে গিয়েছে। ধর্মীয় পদধারীর ছদ্মবেশে তারা বর্তমানে ইসলাম ধর্মকে পুরোদমে আক্রমণ করছে। এই অন্তর্ঘাতী শত্রুদেরকে চিনতে হলে ইসলামের একজন প্রকৃত আলেম কেমন হবেন, তা মুসলমানদের জানা প্রয়োজন। হযরত মা’সূম আল-ফারূকী আস্ সেরহিন্দী (রহ:) হক্কানী আলেমবৃন্দের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখেন:

”তোমরা ইসলাম অমান্যকারী বা কোনো গোমরাহ-পথভ্রষ্ট লোকের সাথে বন্ধুত্ব করবে না! ধর্মীয় পদে সমাসীন বেদআতী লোকদের এড়িয়ে চলো! হযরত এয়াহইয়া ইবনে ম’য়ায আর-রাযী (কুদ্দেসা সিররূহ) বলেন, ‘তিন ধরনের লোককে এড়িয়ে চলবে। তাদের থেকে দূরে সরে থাকবে।’ এই তিন শ্রেণী হলো প্রথমতঃ গাফেল (আল্লাহকে ভুলে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত) ও ধর্মীয় পদে আসীন পথভ্রষ্ট লোক; দ্বিতীয়তঃ ধনী ব্যক্তিদের দয়া-দাক্ষিণ্য প্রত্যাশী চাটুকার ক্বারী (কুরআন তেলাওয়াতকারী); এবং তৃতীয়তঃ ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ তাসাউফের ভণ্ড তাপস। ধর্মীয় খেতাবধারী কোনো লোক যদি রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর সুন্নাহ না মানে এবং ইসলামকে আঁকড়ে না ধরে, তাহলে তাকে এড়িয়ে চলার পাশাপাশি তার বইপত্র না কেনা বা না পড়াও আমাদের জন্যে অবশ্য কর্তব্য হবে। সে যেখানে অবস্থান করে, সেখান থেকেও আমাদের দূরে সরে থাকা উচিত। তার সামান্যতম কৃতিত্ব স্বীকার করলেও তোমাদের ঈমান নষ্ট হতে পারে। কেননা, সে ইসলামের কোনো কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তি নয়, বরং ইসলামের অন্তর্ঘাতী শত্রু। সে তোমাদের ঈমান-আকীদাকে কলুষিত করবে। শয়তানের চেয়েও সে বেশি ক্ষতিকর। তার কথাবার্তা মিষ্ট ও প্রভাবময় মনে হতে পারে, কিন্তু তাও তোমাদের উচিত হবে তার থেকে এমনভাবে দূরে সরে যাওয়া যেমনটি হিংস্র জন্তু-জানোয়ার থেকে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার জন্যে করা হয়। মহান আলেম-এ-হক্কানী শায়খ জুনায়দ আল-বাগদাদী (রহ:) বলেন, ‘অনন্ত নেয়ামতের দিকে কাউকে শুধু একটিমাত্র পথই নিয়ে যেতে পারে, আর তা হলো রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর পদাংক অনুসরণ’; ‘আহলে সুন্নাতের উলামাবৃন্দ কর্তৃক লিখিত তাফসীরগ্রন্থ পড়ে না কিংবা হাদীস শরীফে প্রদর্শিত পথে চলে না এমন ধর্মীয় পদে অধিষ্ঠিত কোনো লোককে তোমরা অনুসরণ করবে না। কেননা, একজন ইসলামী আলেম অবশ্যঅবশ্য কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত পথে অটল থাকবেন’; ‘সালাফ আস্ সালেহীন ছিলেন সঠিক পথের পথিক। তাঁরা ছিলেন প্রকৃত বান্দা। আল্লাহতা’লার ভালোবাসা ও রেযামন্দি (সন্তুষ্টি) তাঁরাই অর্জন করেন। তাঁদের পথটি-ই ছিল কুরআন ও সুন্নাহ-প্রদর্শিত পথ। এই সত্য, সঠিক পথকে তাঁরা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন।’ [**নোট**: এখানে বোঝা যায় যে সাহাবায়ে কেরাম (রা:), তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনের সমন্বয়ে প্রথম ইসলামী দুই শতকের মুসলমান যাঁদেরকে **সালাফ আস্**

সালেহীন বলা হয়, তাঁদের পথই ছিল মহানবী (দ:)-এর পথ। চার মযহাবের ইমামমণ্ডলীও এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। অতএব, চার মযহাবের ফেকাহ'র বইপত্রে যে পথের দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে, তা-ই হলো রাসূলে খোদা (দ:)-এর আলোকোজ্জ্বল পথ। এ কারণে চার মযহাবের উলামাবৃন্দ সর্বসম্মতভাবে বলেন যে চার মযহাবের ফেকাহ'র বইপত্র থেকে বিচ্যুত লোকেরা প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর পথ থেকেই বিচ্যুত। উলামাদের এই এজমা' (ঐকমত্য) স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে '**দোররুল মোখতার**' গ্রন্থের 'যাবায়ীহ' অধ্যায়ের ওপর ইমাম তাহতাবী রচিত শরাহ'তে।]
"তাসাউফের মহান মাশায়েখ ও ফেকাহ'র উলেমাবৃন্দ সালাফ আস্ সালেহীনের পথকে অনুসরণ করেন। তাঁরা ইসলামকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হবার মহাসম্মান তাঁরা লাভ করেন। তাঁদের কথাবার্তা, কর্ম ও নৈতিকতায় তাঁরা ইসলাম থেকে এক চুল পরিমাণও সরেননি।

"আমি বারংবার লেখেছি যে তোমরা এমন লোকদেরকে ধর্মীয় বিষয়ে কর্তৃত্বশীল মনে করবে না, যারা মহানবী (দ:)-কে মান্য করার বেলায় শিথিল কিংবা তাঁর আলোকোজ্জ্বল পথ হতে বিচ্যুত! তাদের মিথ্যে কথাবার্তায় বা লেখনীতে বিশ্বাস-ই করবে না! ইহুদী, খৃষ্টান এবং ভারতীয় বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণরাও নিজেদেরকে সঠিক পথের পথিক এবং মানুষকে মঙ্গল ও সুখ-শান্তির দিকে আহ্বানকারী হিসেবে প্রচার করার উদ্দেশ্যে মধুর ও উৎসাহদায়ক কথাবার্তা এবং কূটতর্ক করে থাকে। হযরত আবূ উমর ইবনে নাজিব বলেন, 'যে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও জীবনে অনুশীলিত হয় না, তা এর অধিকারীর জন্যে উপকারী হওয়ার চেয়ে অপকারী-ই হয় বেশি।' সকল ধরনের সুখ-শান্তির একমাত্র পথ ইসলাম। নাজাত পেতে হলে রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর পদাংক অনুসরণ করতে হবে। ভ্রান্তি থেকে মুক্ত সঠিক পথের পার্থক্যকারী চিহ্ন হলো তাঁকে মান্য করা। তাঁর ধর্মের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো কথা, লেখা বা কর্মের কোনো মূল্যই নেই। ক্ষুধার্ত থাকা বা ধ্যান সাধনার মাধ্যমে খারিকা (অত্যাশ্চর্য ঘটনা) সংঘটিত হতে পারে; আর এটি মুসলমানদের জন্যে খাস্ তথা সুনির্দিষ্ট নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ:) বলেন, 'যে ব্যক্তি মোস্তাহাব পালনে শিথিল, সে সুন্নাহ পালনে অক্ষম। আর সুন্নাহ পালনে শৈথিল্য দ্বারা ফরয পালনও কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। সে যদি ফরয পালনে শিথিল হয়, তাহলে মা'রেফত তথা আল্লাহর রেযামন্দি অর্জনেও সে ব্যর্থ হবে।' এ কারণে একটি হাদীস শরীফে হুযূর পূর নূর (দ:) এরশাদ ফরমান, '**পাপাচারের ফলে কোনো ব্যক্তি অবিশ্বাসীতে পরিণত হয়**।' মহান আউলিয়াদের অন্যতম হযরত আবূ সাঈদ আবূল খায়র (বেসাল: ৪৪০হিজরী/১০৪৯ খৃষ্টাব্দ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, 'অমুক পানির ওপর হাঁটতে পারে; এ ব্যাপারে আপনি কী বলবেন?' তিনি উত্তর দেন, 'এটি অর্থহীন, কেননা একটি হাঁসও পানিতে ভাসতে পারে।' আবার যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, 'তমুক আকাশে উড়তে পারে?' তখন তিনি বলেন, 'একটি মাছিও আকাশে উড়তে সক্ষম। ওই লোকের মূল্য মাছির মতোই।' যখন তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, 'অমুক মুহূর্তে এক শহর থেকে আরেক শহরে গমন করতে সক্ষম', তিনি তখন জবাব দেন, 'শয়তানও চোখের পলকে পূর্বদিক থেকে পশ্চিমদিকে যেতে পারে। এ ধরনের জিনিস আমাদের ধর্মে অর্থহীন। একজন সিদ্ধপুরুষ মানুষের মাঝে বসবাস করেন, বাজারে যান এবং বিয়ে-শাদীও করেন, কিন্তু তিনি এক মুহূর্তের জন্যেও আল্লাহকে ভুলেন না।' হযরত আবূ আলী রুদবারী (বেসাল: ৩২১ হিজরী/৯৩৩ খৃষ্টাব্দ, মিসর) যিনি মহান আউলিয়াবৃন্দের অন্যতম এবং হযরত জুনায়দ আল-বাগদাদী (রহ:)-এর মুরীদ, তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, 'ধর্মীয় পদে অধিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তি যদি (শরাবীদের) বাদ্যযন্ত্রের মজলিশে বসে এবং তা শোনে এবং না-মাহরাম মেয়ে ও নারীদের সাথে বন্ধুত্ব করে অথবা স্ত্রী-কন্যাকে অনৈসলামী পন্থায় বেপর্দা চলাফেরা করতে দেয়, আর যদি সে

দাবি করে তার অন্তর নির্মল এবং অন্তরের বিষয়টি-ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাহলে তার সম্পর্কে কী বলবেন আপনি?' তিনি জবাব দেন, 'ওই লোকের গন্তব্য জাহান্নাম।' আবূ সোলাইমান আদ্ দারানী যিনি দামেশকের অন্তর্গত দারিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানেই ২০৫ হিজরী/৮২০ খৃষ্টাব্দ সালে বেসালপ্রাপ্ত হন, তিনি বলেন, 'প্রথমে আমি কুরআন ও সুন্নাহ'র আলোকে আমার চিন্তাভাবনা ও নিয়্যতকে বিচার করি। অতঃপর এই দু'টি ইনসাফপূর্ণ মানদণ্ডের সাথে যেগুলো সামঞ্জস্য রাখে, সেগুলোই পালন করি।' রাসূলুল্লাহ (দ:) একটি হাদীসে এরশাদ ফরমান, '**বেদআতী লোকেরা জাহান্নামে যাবে**'; '**বেদআত প্রবর্তক ও পালনকারীকে শয়তান যথেষ্ট এবাদত-বন্দেগী করতে সহায়তা করে। এটি তাকে যথেষ্ট কাঁদায়ও**।' অন্যত্র এরশাদ ফরমান, '**বেদআত সংঘটনকারী কোনো ব্যক্তির নামায, রোযা, হজ্জ্ব, উমরাহ, জ্বেহাদ এবং ফরয বা নফল এবাদত আল্লাহ তা'লা কবুল করেন না। এ ধরনের লোকেরা সহজে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।**' শায়খ ইবনে আবি বকর মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ আল-আন্দালুসী যিনি মিসরে বসবাস করেন এবং ৭৩৪ হিজরী/১৩৩৪ খৃষ্টাব্দ সালে বেসালপ্রাপ্ত হন, তাঁর **মা'আরিজ আল-হেদায়া** বইতে তিনি বলেন, 'সঠিক পথকে জানো এবং তারপর সঠিক পথে থাকো! কোনো কামেল (পূর্ণতাপ্রাপ্ত) বোযর্গ ব্যক্তির প্রতিটি কাজ, চিন্তা, কথা ও আচরণ মহানবী (দ:)-এর সাথে মিলে যাবে। কেননা, তাঁকে অনুসরণ করেই সব ধরনের সুখ-শান্তি অর্জন করা যেতে পারে। হুযূর পূর নূর (দ:)-কে অনুসরণের মানে' হলো ইসলামকে আঁকড়ে ধরা।'

"**প্রশ্ন**: আমরা কীভাবে রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর অনুসরণ করবো? আমি এখানে এতদসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উল্লেখ করছি:
"কেউ কোনো গুনাহ করা মাত্রই তার তওবা করা উচিত। জনসমক্ষে কৃত গুনাহ'র তওবা জনসমক্ষেই করা উচিত; আর গোপনে কৃত গুনাহ'র তওবা গোপনে করা উচিত। তওবা পরবর্তী সময়ে করার জন্যে ফেলে রাখা যাবে না। কেরামান কাতেবীন ফেরেশতা দু'জন তৎক্ষণাৎ পাপ লিপিবদ্ধ করেন না। তওবা করা হলে ওই পাপ আর কখনোই লিপিবদ্ধ করা হবে না। কেউ তওবা না করলেই কেবল তাঁরা পাপ লিপিবদ্ধ করে থাকেন। হযরত জা'ফর ইবনে সিনান (রহ:) বলেন, 'পাপ সংঘটনের চেয়ে তওবা না করা আরও বড় পাপ।' যে ব্যক্তি ঘটনাস্থলে তওবা করে না, সে যেন জীবনে অন্তত মৃত্যুর আগে হলেও তওবা করে নেয়। ওয়ারা' ও তাকওয়া-কে আমাদের অবহেলা করা উচিত নয়। '**তাকওয়া**' হলো স্পষ্টভাবে যা কিছু হারাম করা হয়েছে, তা থেকে পরহেযগারী করা; আর '**ওয়ারা**' হলো সন্দেহজনক কাজ (**মোশতাবিহাত**) থেকে দূরে থাকা। ফরয (আদিষ্ট) বিষয়গুলো পালনের চেয়ে হারাম (নিষিদ্ধ) বিষয়গুলো এড়িয়ে চলা বেশি উপকারী। আমাদের বোযর্গবৃন্দ বলেছেন, 'নেককারদের পাশাপাশি বদ লোকেরাও ভাল কাজ করতে সক্ষম; কিন্তু একমাত্র সিদ্দিক (বোযর্গ)-মণ্ডলী-ই পাপ এড়িয়ে চলতে সক্ষম।' হযরত মা'রূফ আল-কারখী (রহমতুল্লাহে আলাইহে ছিলেন ফিরোয নামের এক খৃষ্টান ব্যক্তির সন্তান। তাঁকে ইমাম আলী রেযা দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেন; হযরত কারখী ছিলেন হযরত সিররী সাকাতীর পীর; আর হযরত সাকাতী ছিলেন হযরত জুনাইদ বাগদাদীর পীর) বলেন, 'সকল নারীর দিকে তাকানোকে এড়িয়ে চলো, ব্যতিক্রম শুধু মাহরাম মহিলারা। এমন কি মাদী ভেড়ার দিকেও তাকাবে না!' হাদীস শরীফে হুযূর পূর নূর (দ:) এরশাদ ফরমান, '**ওয়ারা ও যুহদ-সম্পন্ন বোযর্গবৃন্দ-ই কেয়ামত দিবসে আল্লাহ পাকের রেযামন্দি হাসিল করবেন**।' তিনি অন্যত্র এরশাদ করেন, '**ওয়ারা-সম্পন্ন নেককার ব্যক্তির সালাত (নামায) গ্রহণীয়**।' তিনি অারও ঘোষণা করেন, '**ওয়ারা-সম্পন্ন বোযর্গ ব্যক্তির সান্নিধ্য একটি এবাদত; তাঁর সাথে কথা বলা সাদকাহ দেয়ার মতোই**

সওয়াবদায়ক।’ তোমরা এমন কোনো কিছু করো না, যা করতে তোমাদের অন্তর কাঁপে! তোমাদের নফস-কে অনুসরণ করো না! যে সব বিষয়ের ক্ষেত্রে তোমরা সন্দিহান, সেগুলোর ব্যাপারে তোমাদের অন্তরকে জিজ্ঞেস করো! রাসূলুল্লাহ (দ:) একটি হাদীস শরীফে এরশাদ ফরমান, ‘**যে কর্ম নফসকে প্রশান্ত ও অন্তরকে স্বস্তি দেয়, তা ভাল; আর যে কর্ম নফসকে অশান্ত করে এবং অন্তরকে উত্তেজিত করে তা পাপ**।’ অপর এক হাদীসে তিনি এরশাদ করেন, ‘**হালাল বস্তু প্রকাশিত হয়েছে, আর হারাম বস্তুও প্রকাশিত হয়েছে। সন্দেহজনক বস্তু এড়িয়ে চলো। যে সকল কাজকে সন্দেহমুক্ত বলে তোমরা জানো, তা-ই কেবল পালন করো**!’ এই হাদীস শরীফ প্রতীয়মান করে, যে সব জিনিস আমাদের অন্তরকে উত্তেজিত করে এবং যেগুলো সন্দেহজনক, সেগুলো আমাদের এড়িয়ে চলা উচিত। সন্দেহ নেই এমন জিনিস পালন করার অনুমতি রয়েছে। আরেকটি হাদীস শরীফে মহানবী (দ:) এরশাদ ফরমান, ‘**আল্লাহ পাক তাঁর কুরআন মজীদে যে বিষয়গুলোকে হালাল ঘোষণা করেছেন, সেগুলো হালাল। আর আল-কুরআনে তিনি যেগুলো সম্পর্কে কিছু বলেননি, সেগুলোর ব্যাপারে তিনি ক্ষমা করবেন**।’ কোনো সন্দেজনক বিষয়ের মুখোমুখি হলে আমাদের উচিত নিজেদের হাতকে বুকের ওপর রাখা। অন্তর যদি না কাঁপে, তাহলে ওই বিষয়টি পালন করতে পারবো। কিন্তু অন্তর কাঁপলে তা আমাদের বর্জন করা উচিত। হুযূর পাক (দ:) আরেকটি হাদীসে বলেন, ‘**তোমাদের বুকের ওপর হাত রাখো! হালাল বিষয় হলে অন্তর শান্ত থাকবে। হারাম কোনো বিষয় হলে অন্তর দুরদুর করবে। তোমরা কোনো বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করলে তা পালন করবে না! ধর্মীয় পদে অধিষ্ঠিত লোকেরা এর পক্ষে ফতোওয়া জারি করলেও তা পালন করবে না**!’ বস্তুতঃ ঈমানদার কোনো ব্যক্তি মহা পাপ এড়াতে ছোটখাটো পাপ হতেও বেঁচে থাকেন।

“আমাদের সমস্ত এবাদত-বন্দেগী ও নেক আমল (পুণ্যদায়ক কর্ম)-কে ত্রুটিপূর্ণ বলে আমাদের বিবেচনা করা উচিত। আমাদের এই ধারণা রাখা উচিত যে আমরা আল্লাহতা’লার আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করতে পারিনি। আবূ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে মানাযিল (কুদ্দেসা সিররুহ’র পীর হলেন হামদুন আল-কাসসার, যিনি নিশাপুরে ২৭১ হিজরী মোতাবেক ৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বেসালপ্রাপ্ত হন) বলেন, ‘আল্লাহ পাক বিভিন্ন ধরনের এবাদত-বন্দেগীর বিধান দিয়েছেন। তিনি ধৈর্য ধারণ, ভক্তি, সালাত (নামায), রোযা (উপবাস) ও এসতেগফার (পাপ মোচনের জন্যে খোদার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা) করতে আদেশ দিয়েছেন, যেগুলোর সবই ফজর তথা ভোরের আগে করা হয়ে থাকে। তিনি এস্তেগফার করার বিষয়টি সর্বশেষে ঘোষণা বা জারি করেন। অতএব, মানুষের জন্যে নিজেদের এবাদত-বন্দেগী ও পুণ্যদায়ক কর্মকে ত্রুটিপূর্ণ বিবেচনা করা এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা জরুরি বলে বিবেচিত হয়েছে।’ হযরত জা’ফর ইবনে সিনান (কুদ্দেসা সিররূহ) বলেন, ‘খোদার আরাধনাকারীরা নিজেদেরকে পাপীতাপীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা পাপীদের দ্বারা সংঘটিত পাপের চেয়েও নিকৃষ্ট (পাপ)।’ একবার হযরত আলী মোরতাঈশ (কুদ্দেসা সিররূহ) মসজিদে রমযানের ২০ তারিখের পরে পালিত এ’তেকাফ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। তাঁর মসজিদ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসার কারণ তাঁকে জিজ্ঞেস করার পর তিনি জবাবে বলেন, ‘আমি ক্বারী (কুরআন তেলাওয়াতকারী)-দেরকে সুর করে (গুন্না করে) কুরআন মজীদ পাঠ এবং এ ব্যাপারে অহংকার করতে দেখে আর মসজিদের ভেতরে থাকতে পারিনি।’ [সুর করে তেলাওয়াত দোষের নয়, বরং ওই ক্বারীদের বদ নিয়্যত-ই এখানে দায়ী – অনুবাদক]

"আমাদের এবং আমাদের প্রত্যেকের পরিবার-সদস্যদের জীবনধারণের জন্যে হালাল তথা সৎ জীবিকা বেছে নেয়া উচিত। এই লক্ষ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারিগরী বিদ্যা অতীব প্রয়োজনীয়। সালাফ আস্ সালেহীন (প্রাথমিক যুগের পুণ্যাত্মাবৃন্দ) সবসময়-ই কাজ করে এভাবে সৎ পথে উপার্জন করেছেন। হালাল উপায়ে আয় করার সওয়াব (পুণ্য) বর্ণনাকারী অনেক হাদীস শরীফ বিদ্যমান। একবার মোহাম্মদ ইবনে সালিম (রহ:)-কে জিজ্ঞেস করা হয়: 'আমরা কি কাজ করে উপার্জন করবো, না শুধু এবাদত-বন্দেগী করবো এবং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল (নির্ভর) করবো?' তিনি উত্তর দেন, 'তাওয়াক্কুল ছিল রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর একটি হাল (আধ্যাত্মিক অবস্থা); আর কাজ করে উপার্জন ছিল তাঁরই সুন্নাহ। অতএব, তোমরা কাজ করে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করো!' আবূ মোহাম্মদ ইবনে মানাযিল (রহ:) আরও বলেন, 'আল্লাহর ওপর আস্থা রেখে কাজ করা নির্জনে বা একাকী এবাদত-বন্দেগী করার চেয়ে বেশি উপকারী।'
"আমাদের পরিমিত খাওয়া উচিত। এমন বেশি খাওয়া উচিত নয় যাতে আমরা অলস হয়ে যাই। একইভাবে এমন কমও খাওয়া উচিত নয় যাতে এবাদত-বন্দেগীতে (দুর্বলতা হেতু) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। আউলিয়াকুল শিরোমণি হযরত শাহ বাহাউদ্দীন নকশবন্দ আল-বোখারী (রহ:) বলেন, 'ভাল খাও এবং ভালভাবে কাজ করো!' সংক্ষেপে, এবাদত-বন্দেগী ও পুণ্যকর্মে যা কিছু সহায়ক, তা-ই উত্তম ও আশীর্বাদধন্য। আর যা কিছু এর পরিপন্থী, তার সবই নিষিদ্ধ। ভাল কোনো কাজ করার সময় আমাদের নিজেদের নিয়্যত (উদ্দেশ্য) যাচাই করা উচিত। নিয়্যত ভাল না হলে ওই কাজ আমাদের করা উচিত নয়।

"ইসলাম ধর্মকে যারা মানে না এবং যারা বেদআত ও পাপকর্মে লিপ্ত হয়, তাদেরকে আমাদের এড়িয়ে ('উযলা) চলা উচিত। আরেক কথায়, তাদের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব রাখা উচিত নয়। একটি হাদীস শরীফে মহানবী (দ:) এরশাদ ফরমান, '**হেকমত (জ্ঞান-প্রজ্ঞা) দশটি অংশ দ্বারা গঠিত, যার নয়টি অংশ হলো 'উযলা। আর বাকি অংশটি হলো নিরবতা**।' তবে ওই ধরনের ব্যক্তিদের সাথে প্রয়োজনে আমাদের দেখা করতে হবে। আমাদেরকে কাজকর্মে, যিকির-আযকার পালনে, ধ্যান সাধনায় এবং এবাদত-বন্দেগীতে আমাদের সময় ব্যয় করতে হবে। আনন্দ-ফুর্তির সময় হলো ইন্তেকালের পর। পুণ্যবান, খাঁটি মুসলমানদের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব করা উচিত; তাঁদের উপকার সাধন করা এবং তাঁদের থেকে উপকার আদায় করাও উচিত। অর্থহীন, বেহুদা কথাবার্তায় সময় নষ্ট করা আমাদের উচিত নয়। [ক্ষতিকর বইপত্র কিংবা খবরের কাগজ পড়া, রেডিও শোনা বা টেলিভিশন দেখা আমাদের উচিত নয়। ইসলামের শত্রুরা এ সব গণমাধ্যমে ধর্মের ক্ষতি সাধনের অন্তর্ঘাতমূলক অপতৎপরতা সর্বদা চালাচ্ছে। যুব সমাজকে অধার্মিক ও নৈতিকতাবিহীন করতে তারা চক্রান্ত করছে। তাদের ফাঁদে পা দেয়া আমাদের উচিত হবে না। – আল্লামা হুসাইন হিলমী]
"ভাল হোক বা মন্দ, সবাইকে আমাদের হাসি মুখে বরণ করা উচিত। [ফিতনা সৃষ্টি করা আমাদের উচিত নয়। কাউকে শত্রুও বানানো উচিত নয়। এক্ষেত্রে হাফেয শিরাযী (রহ:)-এর বাণী অনুসরণীয়; তিনি বলেন, 'বন্ধুদেরকে সত্য কথাটি বলো, আর শত্রুদেরকে হাসিমুখে ও মধুর বচনে বরণ করো।' – আল্লামা হুসাইন হিলমী] যারা ক্ষমাপ্রার্থী, তাদেরকে আমাদের ক্ষমা করা উচিত। সবার প্রতি নম্র আচরণ করা উচিত। কারো কথার বিরোধিতা বা কারো সাথে ঝগড়া করা আমাদের উচিত নয়। সবার প্রতি কঠোর ভাষা ব্যবহার না করে নরম ভাষা ব্যবহার করা উচিত। শায়খ আবদুল্লাহ বায়াল (কুদ্দেসা সিররুহ) বলেন, 'তাসাউফের (সূফী আদর্শের) অর্থ সালাত (নামায) , রোযা বা রাতে পালিত এবাদত নয়। এগুলো খোদার বান্দা হিসেবে সবারই দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাসাউফের মানে হলো কাউকে আঘাত না করা, কারো অন্তরে ব্যথা না দেয়া। যে ব্যক্তি এটি অর্জন করেন, তিনি লক্ষ্যে

পৌঁছে যান।' শায়খ মোহাম্মদ ইবনে সালিম (রহ:)-কে জিজ্ঞেস করা হয় কীভাবে অন্যান্যদের মধ্য হতে কোনো ওলী (আল্লাহর বন্ধু)-কে আলাদাভাবে চেনা যায়। তিনি জবাবে বলেন, 'তাঁকে চেনা যাবে তাঁর নম্র কথাবার্তায়, সুন্দর আচার-আচরণে ও পরোপকারিতায়; আর তিনি কারো সাথে কথা বলার সময় দ্বিমত পোষণ করেন না, কিন্তু যারা ক্ষমা চায় তাদের তিনি ক্ষমা করেন; সবার প্রতি তিনি করুণাশীল।' আবূ আবদিল্লাহ আহমদ আল-মক্কারী বলেন, 'ফুতুওয়াত মানে এমন কারো উপকার করা, যার দ্বারা উপকারকারী আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন; এমন কোনো ব্যক্তিকে উপহারসামগ্রী দান করা, যাকে অপছন্দ করা হয়; এমন কোনো ব্যক্তির প্রতি হাসিমুখে আচরণ করা, যার সঙ্গ বিরক্তিকর বলে অনুভূত হয়।'

"আমাদের উচিত কম কথা বলা, কম ঘুমোনো এবং কম হাসি-তামাশা করা। বেশি বেশি হাসি-তামাশা অন্তরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেয়। আমাদের কাজ করা উচিত, কিন্তু এর প্রতিদান একমাত্র আল্লাহতা'লার কাছ থেকেই আমাদের আশা করা উচিত। তাঁর আদেশ-নিষেধ সানন্দে আমাদের মানা উচিত। আমরা তাঁর প্রতি তাওয়াককুল তথা ভরসা করলে আমরা যা চাই, তা তিনি আমাদেরকে দান করবেন। একটি হাদীস শরীফে মহানবী (দ:) এরশাদ ফরমান, '**যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, সে যা চায় সবই আল্লাহ পাক মঞ্জুর করেন। তিনি মানুষদের দ্বারা তাকে সাহায্য করান**।' হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায আর্ রাযী (বেসাল: নিশাপুরে, ২৫৮ হিজরী/৮৭২ খৃষ্টাব্দ) বলেন, 'তুমি যতোটুকু আল্লাহ পাককে ভালোবাসো, অন্যরাও তোমাকে ততোটুকু-ই ভালোবাসবে। অন্যরা তোমাকে ততোটুকু-ই ভয় করবে, যতোটুকু তুমি আল্লাহকে ভয় করো। তুমি আল্লাহর এবাদত-বন্দেগী যে পরিমাণে করো, ঠিক সেই অনুপাতে অন্যরাও তোমাকে সাহায্য করবে।' অতএব, তোমাদের (নফসানী) সুবিধাগুলোর পিছু পিছু ছুটো না! হযরত আবূ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আর্ রাসিবী (বেসাল: বাগদাদে, ৩৬৭ হিজরী/৯৭৮ খৃষ্টাব্দ) বলেন, 'আল্লাহতা'লা ও মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় পর্দা (বাধা) হচ্ছে মানুষের শুধু নিজেকে নিয়ে চিন্তামগ্ন থাকা এবং নিজের মতোই অক্ষম আরেকজন মানুষের ওপর নির্ভর করা। মানুষের অনুগ্রহভাজন হওয়ার পরিবর্তে আল্লাহর অনুগ্রহভাজন হতে আমাদের চেষ্টা করা উচিত।'

"আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের সাথে মধুর ভাষায় কথা বলা এবং হাসিমুখে আচরণ আমাদের করা উচিত। তাদের প্রাপ্য অধিকার দিতে যতো সময় প্রয়োজন, ততোটুকু সময় তাদের সাথে আমাদের থাকা উচিত। কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে ফিরিয়ে রাখার মতো সংশ্লিষ্টতা তাদের সাথে আমাদের থাকা উচিত নয়।

"ধর্মীয় পদে অধিষ্ঠিত গণ্ডমূর্খ ও গোমরাহ লোকদের কাছে আমাদের দ্বীনী বিষয়গুলো জানতে চেষ্টা করা উচিত নয়। এই দুনিয়ার প্রেমে বিভোর লোকদের সাহচর্য-ও আমাদের ত্যাগ করা উচিত। সমস্ত কাজে সুন্নাহর অনুসরণ ও বেদআত বর্জন করাও আমাদের কর্তব্য। আমরা যখন আনন্দিত হই, তখন ইসলাম-নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করা আমাদের জন্যে অনুচিত; আর বিপদ বা দুঃখকষ্টে আল্লাহর সাহায্য তথা অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হওয়াও আমাদের জন্যে অনুচিত। আমাদের ভুল্লে চলবে না যে প্রতিটি দুঃখের পাশাপাশি সুখ-ও অবস্থান করে। সুখ হোক বা দুঃখ, কোনো পরিস্থিতিতেই আমাদের আচরণের পরিবর্তন কখনো হওয়া উচিত নয়। প্রাচুর্য বা অপ্রতুলতা দেখা দিলে আমাদের (মানসিক) অবস্থা একই হওয়া চাই। পরিবর্তিত কোনো পরিস্থিতি বা পরিবেশ যেন আমাদেরকে পাল্টে না ফেলে।

”অন্যদের দোষত্রুটি না খুঁজে আমাদের উচিত নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি তালাশ করা। অন্যান্য মুসলমানদের চেয়ে নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করাও আমাদের উচিত নয়। বরঞ্চ প্রত্যেক মুসলমানকে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা উচিত। কোনো মুসলমানের সাথে যখন আমাদের সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁর দোয়ার ওপর আমাদের সুখ-শান্তি নির্ভরশীল হতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস রাখা উচিত। যাঁদের প্রতি আমরা দায়বদ্ধ, তাঁদের সেবক হিসেবে নিজেদের বিবেচনা করা আমাদের কর্তব্য। একটি হাদীস শরীফে রাসূলে পাক (দ:) এরশাদ ফরমান, ‘**যে মুসলমান-ব্যক্তি এই তিনটি কাজ করবে, তার ঈমান পরিপূর্ণ: পরিবারের সেবা করা, গরিব মানুষের সাথে বসা (ভিক্ষুকের সাথে নয়!) এবং নিজের সেবকদের সাথে আহার গ্রহণ করা**।’ কুরআন মজীদে এই তিনটি বিষয়কে মো’মেন মুসলমানদের গুণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদেরকে সালাফ আস্ সালেহীনের আদব-কায়দা ও আচরণ শিক্ষা করতে হবে এবং তাঁদের মতো হবার চেষ্টা করতে হবে। কারো অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে মন্দ কথা বলা আমাদের উচিত নয়। এ রকম অসাক্ষাতে নিন্দুককে আমাদের বাধা দেয়া উচিত [**গীবত** বলা হয় কারো অসাক্ষাতে তার সম্পর্কে এমন নিন্দা করাকে যা তার সামনাসামনি করা হলে সে ব্যথিত হতো, যদিও বা তা সত্য হতো; আর তা মিথ্যে হলে সেটিকে বলা হয় **এফতিরা**; উভয়-ই মহা পাপ]। আল-আমরু বিল মা’রূফ ওয়ান্ নাহি আনিল মুনকার (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ) পালন আমাদের অভ্যাসে পরিণত হওয়া উচিত। মোহাম্মদ ইবনে আলএয়ান’আ (রহ:)-কে জিজ্ঞেস করা হয় আল্লাহতা’লা কাউকে ভালোবাসলে কীভাবে তা বোঝা যাবে। তিনি জবাবে বলেন, ‘যখন তা’আত (আনুগত্য) মিষ্ট এবং পাপ সংঘটন তেতো অনুভব হবে, তখন-ই তা বোঝা যাবে।’ গরিব হবার ভয়ে আমাদের উচিত নয় কৃপণ-স্বভাবী হওয়া। শয়তান মানুষকে এই বলে ধোকা দেয় সে গরিব হয়ে যেতে পারে; আর অবৈধ যৌনাচারের দিকেও সে মানুষকে প্রলুব্ধ করে থাকে। মহানবী (দ:) একটি হাদীস শরীফে এরশাদ ফরমান, ‘**যে (মুসলমান) ব্যক্তির পরিবার বড় কিন্তু খাবার অল্প; এবং যার নামায পরিপূর্ণ; অধিকন্তু, মুসলমানদের অসাক্ষাতে যে গীবত করে না, সে পুনরুত্থান দিবসে আমার সাথে অবস্থান করবে**’।” [শায়খ মা’সূম আল-ফারূকী আস্ সেরহিন্দী প্রণীত ‘**মকতুবাত**’, ২য় খণ্ড, ১১০তম পত্র]

ওপরে বর্ণিত সদগুণাবলীর অধিকারী মুসলমানকেই ধর্মীয় পদে আসীন আলেম বলা হয়। আমাদের বুঝতে হবে, যে ব্যক্তি ওই সমস্ত সদগুণের অধিকারী হওয়া তো দূরে, এমন কি ওই গুণের অধিকারীদের অপছন্দ বা হেয়-ও করে, সে কখনোই ধর্মীয় কর্তৃত্বশীল ব্যক্তি হতে পারে না; বরঞ্চ সে একজন ধর্মের শত্রু এবং তার কথাবার্তা ও লেখনীতে আমাদের বিশ্বাস করাও উচিত নয়।

৪৬/ – ‘**বেদআত**’ মানে কী? ’**মকতুবাত**’ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৫৪, ১৬৫, ১৮৬, ২৫৫, ২৬০ ও ৩১৩ নং পত্রে ইমাম-এ-রব্বানী আহমদ ফারূকী সেরহিন্দী (মোজাদ্দেদে আলফে সানী) বেদআত সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং এটি সংঘটনের ক্ষতি সম্পর্কেও লিখেছেন। আমরা বইটির ১ম খণ্ডের পুরো ৩১৩টি পত্র পারসিক থেকে তুর্কী ভাষায় এবং আংশিক ইংরেজি ভাষায়ও অনুবাদ করেছি। ১৩৮৭ হিজরী/১৯৬৮ সালে তা ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত হয়েছে। অধিকন্তু, মওলানা আবদুল গনী নাবলুসী (রহ:)-এর প্রণীত ‘**হাদিকাতুন্ নদীয়া**’ শিরোনামের আরবী গ্রন্থের ১ম খণ্ডে বেদআত সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা হয়েছে, যার অংশবিশেষ এখানে পেশ করা হলো:

বেদআত অর্থ (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের) সুন্নাহ’র সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো আকীদা-বিশ্বাস, কর্ম বা কথাবার্তা। আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁরই এবাদত-

বন্দেগীর উদ্দেশ্যে। এবাদত (আরাধনা) মানে হচ্ছে (খোদার প্রতি) বিনম্রতা ও অবনত হওয়া। আরেক কথায়, এর অর্থ হলো মানবের দ্বারা নিজ রব্ব তথা স্রষ্টা ও প্রভুর প্রতি নিজ বিনম্রতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করা। আর এরই ধারাবাহিকতায় মস্তিষ্ক, নফস বা বিভিন্ন প্রথানিয়ন্ত্রিত সুন্দর-অসুন্দরের ধারণাগুলো পরিহার করে স্রষ্টাপ্রদত্ত সুন্দর-অসুন্দরের দর্শনের কাছে আত্মসমর্পণ করা; আর সেই সাথে স্রষ্টার প্রেরিত মহানবী (দ:) ও ঐশীগ্রন্থ আল-কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও মান্য করা। কেউ যদি তার স্রষ্টার অনুমতির কথা বিবেচনায় না নিয়ে নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী কোনো কাজ করে, তাহলে সে খোদার প্রতি সমর্পিত নয় এবং মুসলমান হবার সমস্ত পূর্বশর্ত পূরণেও সে ব্যর্থ বলে সাব্যস্ত হবে। তার ওই কাজটি যদি আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত হয় এবং এমন বিষয় হয় যা'তে বিশ্বাস স্থাপন করাকে অত্যাবশ্যক বলে সর্বসম্মতভাবে ঘোষিত হয়েছে, তবে তার ওই ধারণাটি হচ্ছে '**কুফরী (অবিশ্বাস) সৃষ্টিকারী বেদআত**'। আর যদি তার সেই কর্ম (আমল) বিশ্বাস-সংক্রান্ত না হয়ে ধর্মের আমল (কথা বা কাজ)-এর সাথে সম্পর্কিত হয়, তবে সেটি হবে ফিসক্ তথা মহা পাপ। রাসূলুল্লাহ (দ:) একটি হাদীস শরীফে এরশাদ ফরমান, "**কেউ ধর্মে অনস্তিত্বশীল কোনো কিছু পরিবেশন করলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে**।" এই হাদীস পরিস্ফুট করে যে ইসলামে অস্তিত্বহীন কোনো আকীদাহ, কথা, কাজ বা আচরণ (প্রথা) ধর্মে পরিবেশন করা হলে এবং তা ধর্মে বিদ্যমান বা তা থেকে এবাদতের সওয়াব পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করা হলে, অথবা সওয়াবের আশায় ইসলামের আদেশ-নিষেধে সংযোজন-বিয়োজন করা হলে, এই ধরনের উদ্ভাবন বা পরিবর্তনকে '**বেদআত**' বলে চিহ্নিত করা হবে। এর দরুন ইসলাম ধর্মকে অমান্য ও অবমূল্যায়ন-ই করা হবে। যে সব নতুন বিষয় ইসলাম ধর্মে পালিত নয় কিন্তু সামাজিক প্রথার অন্তর্গত, অর্থাৎ, যেগুলোর বিনিময়ে সওয়াব আশা করা হয় না, সেগুলো বেদআত নয়। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের ধর্ম পানাহার গ্রহণ, ভ্রমণ, পরিবহন বা আবাসন ক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও পরিবর্তনকে প্রত্যাখ্যান করে না। [অতএব, একই টেবিলে বসে আলাদা আলাদা প্লেটে খাওয়া, চামচ-কাঁটাচামচ ব্যবহার করা, ইঞ্জিনের গাড়ি ও উড়ো জাহোজে চড়া, দালানের বাড়িঘর বা রান্নার সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার করাকে ইসলামে বেদআত বলে বিবেচনা করা হবে না। উপকারী খাতে এগুলোর ব্যবহার অনুমতিপ্রাপ্ত, এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে ফরযে কেফায়া-ও বটে। – আল্লামা হুসাইন হিলমী]

একদিন হযরত আনাস বিন মালেক (রা:)-কে তিনি কেন কাঁদছেন প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, "রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর কাছ থেকে আমি যতো এবাদত শিখেছি, তার মধ্যে শুধু নামায-ই (এ যাবত) অপরিবর্তিত ছিল। কিন্তু এখন আমি কাঁদছি এই দেখে যে এটিও পরিবর্তিত হয়েছে।" তিনি এ কথা বলে বুঝিয়েছেন যে তাঁর কাঁদবার কারণ হলো তাঁরই সময়কার বেশির ভাগ মানুষ নামাযের পূর্বশর্ত, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মোস্তাহাবগুলো পূরণ করছিল না এবং মকরুহ, মুফসিদ ও বেদআতগুলোও এড়িয়ে চলছিল না। এরাই সে সব লোক যারা আম্বিয়া (আ:), আউলিয়া (রহ:) বা পুণ্যবান খোদাভীরু মুসলমানদের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে অক্ষম ছিল। মহান বোযর্গবৃন্দের পথ ছেড়ে দিয়ে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে এবং নফসানী খায়েশ অনুযায়ী এবাদতের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে। সুখশান্তির পথ ফেলে রেখে তারা ধ্বংসের পথ বেছে নেয়। ওই সাহাবী (রা:)-এর কান্নার কারণ ছিল গোমরাহ লোকেরা নামাযের মধ্যে সংযোজন ও বিয়োজন করেছিল। ফলে তারা সুন্নাহ তথা ইসলাম ধর্মকে পরিবর্তন করে ফেলেছিল। আর সুন্নাহকে পরিবর্তন করাই হচ্ছে বেদআত।

মহানবী (দ:) একটি হাদীস শরীফে এরশাদ ফরমান, "**কোনো উম্মাহ যদি তাদের নবী (আ:)-এর বেসালের পরে ধর্মে একটি বেদআত পরিবেশন করে, তবে তারা ওর সদৃশ একটি সুন্নাহ হারিয়ে ফেলবে**।" অর্থাৎ, কুফরী সৃষ্টিকারক নয় এমন কোনো বেদআত তারা ধর্মে পরিবেশন করলে অনুরূপ ধরনের একটি সুন্নাহ তাদের মাঝ থেকে বিলুপ্ত হবে।

রাসূলুল্লাহ (দ:) আরও এরশাদ ফরমান, "**বেদআতী লোক বেদআত ত্যাগ না করা পর্যন্ত আল্লাহতা'লা তাকে তওবা করার সুযোগ দেন না**।" এর মানে হলো, কোনো ব্যক্তি বেদআত পরিবেশন করলে বা অন্য কারো পরিবেশিত বেদআত অনুশীলন করলে সে এর জন্যে তওবা করতে পারে না; কেননা, সে এটিকে মঙ্গলজনক বিবেচনা করে এবং এর থেকে সওয়াব পাবার আশা করে থাকে। আর ওই বেদআত, যা কুফরী পর্যন্ত তাকে পৌঁছে দিতে পারে, তার মন্দ ফলাফলের কারণে সে তার কোনো পাপেরই জন্যে তওবা করার সুযোগ পাবে না।
হুযূর পূর নূর (দ:) অপর এক হাদীসে এরশাদ ফরমান, "**বেদআত সংঘটনকারী ব্যক্তির কোনো (নেক) আমল আল্লাহতা'লা কখনোই কবুল (গ্রহণ) করেন না, যতোক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহর ওয়াস্তে (খাতিরে) ওই বেদআত ত্যাগ করে**।" আরেক কথায়, আকীদা-বিশ্বাস, আমল (কর্ম), কথা বা নৈতিকতায় বেদআত অনুশীলনকারী ব্যক্তি তা অব্যাহত রাখলে আল্লাহ পাক তার অনুরূপ কিসিমের এবাদত-বন্দেগী কবুল করেন না, যদিও বা সেগুলো সহীহ হয়। তার এবাদত কবুলের পূর্বশর্ত হলো তাকে খোদাভীরুতার খাতিরে, আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব পাবার আশায় এবং তাঁরই রেযামন্দি হাসিলের উদ্দেশ্যে বেদআত পরিত্যাগ করতে হবে।

রাসূলে করীম (দ:) একটি হাদীস শরীফে ঘোষণা করেন, "**আল্লাহতা'লা কোনো বেদআতীর রোযা, হজ্জ্ব, উমরাহ, জ্বেহাদ, পাপ হতে পরহেযগারি ও ন্যায়পরায়ণতাকে কবুল করবেন না। সে সহজেই ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে**।" অর্থাৎ, তার এবাদত-বন্দেগী সহীহ (বিশুদ্ধ, খাঁটি) হলেও তা গৃহীত হবে না; তাকে সওয়াব দেয়া হবে না। কেননা, সে কুফরী সৃষ্টিকারক নয় এমন বেদআত অহরহ-ই সংঘটন করে থাকে। আর কুফরী সৃষ্টিকর বেদআত পালনকারীর এবাদত-বন্দেগী কোনোক্রমেই সহীহ নয়। তার কোনো ফরয বা নফল এবাদত-ই কবুল করা হবে না। কারণ বেদআত নফস ও শয়তানকে অনুসরণ করেই সংঘটিত হয়; ফলে বেদআতী ইসলাম ধর্ম থেকে খারিজ হয়ে যায়, আল্লাহতা'লার আদেশ-নিষেধের প্রতি সমর্পণের গণ্ডি থেকেও বেরিয়ে যায়। ঈমান হলো অন্তরেরই একটি ক্রিয়া। ইসলামের (পাঁচটি নীতি) অান্তরিক ও মৌখিক ভাষ্য দ্বারা সমন্বিত। ঈমান অন্তরের জন্যেই যথাযথ (তথা খাস্)। কিন্তু ইসলামে অন্তর, মৌখিক ভাষ্য ও শারীরিক কর্মকাণ্ড, এই তিনটি-ই অন্তর্ভুক্ত। অন্তরে ঈমানের অস্তিত্ব এবং ইসলামের অস্তিত্ব সাদৃশ্যপূর্ণ। বেদআতীর কাছ থেকে যা তিরোহিত হয় তা হলো মৌখিক ভাষ্যে ও শরীরে অস্তিত্বশীল ইসলাম। যে লোক কোনো বেদআত বারংবার সংঘটন করতে থাকে, সে নিজ নফস ও শয়তানকে মান্যকারী ব্যক্তিতে পরিণত হয়। যে লোক পাপাচারে লিপ্ত হয়, সে অবাধ্য ও গুনাহগার/পাপী হিসেবে সাব্যস্ত হয়। তবে তাকে বেদআতী বলে সম্বোধন করা হয় না। কিন্তু বেদআতী লোক অবাধ্য ও পাপী এবং সে তার দ্বারা সংঘটিত বেদআতকে এবাদত মনে করে এবং তা থেকে সওয়াব-ও আশা করে। অথচ কোনো এবাদত পালনের পাশাপাশি গুনাহ করলে তা এবাদতটি কবুল হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করে না।

মহানবী (দ:) একটি হাদীস শরীফে এরশাদ ফরমান, "**আমার (বেসালের) পরে আমার উম্মতের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেবে। ওই সময় যারা পাবে তারা যেন আমার সুন্নাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে, এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকেও! ধর্মের মধ্যে পরিবেশিত বেদআতকে তারা যেন এড়িয়ে চলে! ধর্মে পরিবেশিত প্রতিটি নতুন বিষয়-ই বেদআত, আর সকল বেদআত-ই পথভ্রষ্টতা। বেদআতীদের গন্তব্য জাহান্নাম**।" এই হাদীস শরীফটি পরিস্ফুট করে যে উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে বিভিন্ন মতপার্থক্যের উদ্ভব হবে। এটি নির্দেশ দেয় আমরা যেন রাসূলুল্লাহ (দ:) এবং তাঁর চার খলীফার পথ ও মতের অনুসরণ করি। সুন্নাহ হলো তাঁর কওল (বাণী), সমস্ত এবাদত-বন্দেগী, আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিকতা, এবং তাঁর উপস্থিতিতে কৃত ওই সব বিষয় যা'তে তিনি নিশ্চুপ ছিলেন (মানে মৌন সমর্থিত বিষয়)।

অপর এক হাদীস শরীফে হুযূর পূর নূর (দ:) এরশাদ ফরমান, "**আমার উম্মতের মাঝে যখন গোমরাহী/পথভ্রষ্টতা/অনৈতিকতা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করবে, তখন যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে তাকে এক'শ জন শহীদের সওয়াব দান করা হবে**।" অর্থাৎ, মানবকুল যখন নফসানীয়াত, বেদআত ও আপন (অদূরদর্শী) মস্তিষ্কের আনুগত্য করতে গিয়ে ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তখন মহানবী (দ:)-এর সুন্নাতের অনুসারী ব্যক্তিকে পুনরুত্থান দিবসে এক'শ শহীদের সওয়াব দান করা হবে। কেননা, ফিতনা ও অনৈতিকতার যুগে ইসলাম ধর্মের অনুসরণ বা অনুশীলন (প্রাথমিক যুগের) অবিশ্বাসীদের সাথে জ্বেহাদের মতোই কঠিন বা কষ্টসাধ্য হবে।

রাসূলে আকরাম (দ:) একটি হাদীস শরীফে ঘোষণা করেন, "**ইসলামের আরম্ভ গরিব অবস্থায়; এর চূড়ান্ত সময়ও হবে গরিব। ওই সব গরিব মানুষের জন্যে সুসংবাদ! লোকদের দ্বারা বিকৃতি সাধিত আমার সুন্নাতকে তারা পরিশুদ্ধ করবে**।" অর্থাৎ, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মানুষেরা যেমন এই ধর্ম সম্পর্কে জানতো না এবং এটিকে অদ্ভূত মনে করতো, ঠিক তেমনি সর্বশেষ যুগেও ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানীদের সংখ্যা হবে যৎসামান্য। তাঁরা মহানবী (দ:)-এর সুন্নাতকে আবার প্রতিষ্ঠা করবেন, যা তাঁর (বেসালের) পরে দূষিত হয়েছিল। এই লক্ষ্যে তাঁরা 'আল-আমরু বিল মা'রূফ ওয়ান্ নাহী আনিল মুনকার' (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ) অনুশীলন করবেন। সুন্নাত তথা ইসলামের অনুসরণে তাঁরা হবেন অন্যান্যদের জন্যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁরা ইসলামী শিক্ষাসমূহ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করবেন এবং নিজেদের বইপত্র প্রচার-প্রসার করার চেষ্টা করবেন। সামান্য কিছু মানুষ তাঁদের কথা শুনবেন (মানে মান্য করবেন), আর তাঁদের থাকবে প্রচুর বিরোধিতাকারী। ওই সময় বহু সহানুভূতিশীল অনুসারীর নেতা হয়ে ধর্মীয় পদে সমাসীন ব্যক্তি সত্যের সাথে মিষ্টের আবরণে মিথ্যে কথাবার্তা সংমিশ্রণ করবে। কেননা, তখন খাঁটি সত্য কথা বলার মানুষের থাকবে অসংখ্য শত্রু।

হুযূর পাক (দ:) অপর এক হাদীস শরীফে এরশাদ করেন, "**বনূ ইসরাঈল বংশ বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে। আমার উম্মত বিভক্ত হবে তিয়াত্তর দলে। একটি দল ছাড়া বাকি সব দল-ই জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে। নাজাতপ্রাপ্ত দলটি তারাই, যারা আমার ও আমার সাহাবীদের আকীদা-বিশ্বাস ও রীতি-নীতির অনুসরণ করবে**।" আরেক কথায়, ধর্মীয় বিষয়াবলীতে বনূ ইসরাঈল বংশ বাহাত্তর দলবিভক্ত হয়েছিল। আর মুসলমান সম্প্রদায় তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। মানে (সঠিক দলটি ব্যতিরেকে) তারা অনেক ফেরকাবন্দি হবে। তারা কেউই অবিশ্বাসী (কাফের) হবে না বটে, কিন্তু তারা জাহান্নামের আগুনে দীর্ঘকাল শাস্তি পাবে। রাসূলুল্লাহ

(দ:) ও তাঁর সাহাবা-এ-কেরাম (দ:) যে আকীদা-বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করেছেন এবং (এবাদতে) যে রীতি-নীতি পালন করেছেন, তার অনুসারী দলটি-ই কেবল পরিত্রাণ পাবে। যে সমস্ত আলেম মহানবী (দ:) ও তাঁর সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে এজতেহাদ প্রয়োগ করে এবং এই কাজে সর্বসম্মতভাবে জ্ঞাত ও ধর্মে অপরিত্যাজ্য কোনো আকীদা-বিশ্বাসগত বিষয়ে ভুল করে, তারা অবিশ্বাসীতে পরিণত হয়। তাদেরকে '**মুলহিদ**' ['**বাহর**' ও '**হিনদিয়্যা**' গ্রন্থগুলোতে এদেরকে মুশরিক বলা হয়েছে] আখ্যায়িত করা হয়। আর যদি তারা এমন কোনো আকীদা-বিশ্বাসগত বিষয়ে ভুল করে যেটি সর্বসম্মতভাবে বর্ণিত নয় এবং অপরিত্যাজ্য-ও নয়, তবে তারা অবিশ্বাসী হয় না সত্য, কিন্তু আকীদা-বিশ্বাসগত বিষয়ে বেদআতীতে রূপান্তরিত হয়। তাদেরকেও 'আহল আল-কিবলা' (মুসলমান) বলা হয়। অধিকন্তু, এবাদত ও আমলের ক্ষেত্রে এজতেহাদ প্রয়োগের সময় (ইসলামে) অপরিত্যাজ্য বলে সর্বজনবিদিত বিভিন্ন এবাদত-আমলকে যারা অবিশ্বাস করবে, তারা অবিশ্বাসী বা মুলহিদ হয়ে যাবে। কিন্তু অপরিত্যাজ্য নয় অথবা সর্বসম্মতভাবে বর্ণিত নয় এমন এবাদতের ক্ষেত্রে (এজতেহাদ প্রয়োগে) ভুল করলে মুজতাহিদের পর্যায়ভুক্ত আলেমবৃন্দ সওয়াব পাবেন। মুজতাহিদ না হয়ে এ রকম এজতেহাদ প্রয়োগ করলে লা-মযহাবীতে পরিণত হতে হবে। কেননা, অ-মুজতাহিদের জন্যে এজতেহাদ প্রয়োগের কোনো অনুমতি-ই নেই। তাকে কোনো মুজতাহিদের অধীন মযহাবের অনুসরণ করতে হবে। একটি হাদীস শরীফে রাসূলে করীম (দ:) এরশাদ ফরমান, "**যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মুখে বলে, তাকে তার পাপের জন্যে কাফের অভিহিত করা যাবে না। যে ব্যক্তি তাকে কাফের আখ্যা দেবে সে নিজেই কাফের হয়ে যাবে**।" যে ব্যক্তি তার সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের কারণে জাহান্নাম হতে রক্ষাপ্রাপ্ত, সে হয়তো তার পাপের কারণে জাহান্নামে যেতেও পারে। তবে কোনো ব্যক্তি যদি সালেহ (সত্যপন্থী পুণ্যাত্মা) হন, মানে তিনি যদি নিজ পাপের জন্যে তওবা করেন বা ক্ষমা পেয়ে যান অথবা নবী (আ:)-ওলী (রহ:)-এর শাফায়াত/সুপারিশ লাভ করেন, তাহলে তিনি আর কখনোই জাহান্নামে প্রবেশ করবেন না। সর্বসম্মতভাবে বর্ণিত ও অপরিত্যাজ্য বলে গৃহীত কোনো আকীদা-বিশ্বাস কিংবা আমল, যা এমন কি অজ্ঞরাও জানে, তা কেউ অস্বীকার করলে যেহেতু কাফের (অবিশ্বাসী) বা মুরতাদ্দ (ধর্মত্যাগী)-এ পরিণত হবে, সেহেতু তাকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কলেমা-বাক্যে বিশ্বাসী ব্যক্তি বলে সম্বোধন করা হবে না, কিংবা 'আহলে কিবলা' বা 'আহলে বেদআত'-ও বলা হবে না, যদিও সে সকল ধরনের এবাদত-বন্দেগী পালন এবং পাপাচার বর্জন করে থাকে।

প্রশ্ন: আমাদের মহানবী (দ:) ঘোষণা করেছেন, '**সকল বেদআত-ই পথভ্রষ্টতা**।' কিন্তু ফেকাহবিদ উলামাবৃন্দ বলেছেন কিছু বেদআত মোবাহ (অনুমতিপ্রাপ্ত), আর কিছু বেদআত মোস্তাহাব (প্রশংসনীয়) এবং আরও কিছু বেদআত ওয়াজিব (অবশ্য করণীয়)। এই দু'টো বক্তব্যের মধ্যে সঙ্গতি কীভাবে পাওয়া যায়?

জবাব: 'বেদআত' শব্দটির দু'টি অর্থ বিদ্যমান। প্রথমটি হচ্ছে আভিধানিক, যা সার্বিক। এই অর্থে প্রথাগত হোক বা এবাদতের ক্ষেত্রেই হোক, যে কোনো নতুন বিষয়ের প্রবর্তন-ই বেদআত হিসেবে অভিহিত হবে। প্রথা হলো সে সব কাজ যা থেকে সওয়াব আশা করা হয় না এবং যা শুধু দুনিয়ার ফায়দা লাভের জন্যেই করা হয়। কিন্তু এবাদত এমন এক আমল, যা পালন করা হয় আখেরাতে সওয়াব লাভের আশায়। আভিধানিকভাবে বেদআত অর্থ '**আস্ সদর আল-আউয়াল**' তথা সাহাবা-এ-কেরাম (রা:), তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনের যুগের পরে পরিবেশিত সমস্ত নতুন বিষয়।

তাঁদের সময়কালে প্রবর্তিত বিষয়গুলো কিন্তু বেদআত নয়। তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনবৃন্দের পরবর্তীকালে প্রবর্তিত বিষয়গুলোই হচ্ছে বেদআত।
বেদআতের দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে আস্ সদর আল-আউয়ালের পরে ধর্মে পরিবেশিত নতুন বিষয়। এই সব পরিবর্তন আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হতে পারে, আবার এবাদতের ক্ষেত্রেও হতে পারে। কোনো নতুন এবাদত চালু করা কিংবা এবাদতের মধ্যে সংযোজন বা বিয়োজন করাই **এবাদতের ক্ষেত্রে বেদআত** বলে সাব্যস্ত। এ ধরনের বেদআতগুলোর মধ্যে শরীয়তের বিধানদাতা হযরতে রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর মৌখিক, ব্যবহারিক, প্রকাশ্য বা ইশারাকৃত অনুমতি ছাড়াই যেগুলো প্রবর্তন করা হয়েছে, সেগুলোকে '**বেদআতে সাইয়্যেয়াহ**' (মন্দ নতুন বিষয়) বলা হয়। প্রথা সংক্রান্ত বেদআতগুলোর কোনোটি-ই বেদআতে সাইয়্যেয়াহ নয়, কেননা এগুলো এবাদতের উদ্দেশ্যে পালিত হয় না, বরং বৈষয়িক বা পার্থিব লাভের জন্যে করা হয়। পানাহার, বস্ত্র পরিধান ও বসবাসের ক্ষেত্রে নতুন বিষয় প্রবর্তন হচ্ছে প্রথা-সংক্রান্ত বেদআত। বস্তুতঃ আকীদা-বিশ্বাসগত নতুন বিষয়গুলো-ই হচ্ছে '**বেদআতে সাইয়্যেয়াহ**'। বাহাত্তরটি গোমরাহ দলের আকীদা-বিশ্বাস বেদআতে সাইয়্যেয়াহ। কিন্তু এবাদতের ক্ষেত্রে চার মযহাবে পরিবেশিত নতুন বিষয়গুলো বেদআত নয়; কেননা, সেগুলো যুক্তি দ্বারা বের করা সিদ্ধান্ত নয়, বরং '**আদিল্লাত আশ্ শরীয়ত**' হতে গৃহীত ফয়সালা। সেগুলো 'নস' (শরীয়তের দলিল)-এর সাথে সংযোজন নয়, বরং 'নস'-এরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সালাত বা নামাযের প্রারম্ভে 'তাকবিরে এফতিতাহ' যদি অতিরিক্ত সওয়াব পাওয়ার আশায় কয়েকবার পড়া হয়, তবে তা বেদআত। মনে সন্দেহের দরুন অনবধানতাবশতঃ যদি পড়া হয়, তবে তা গুনাহ। আর যদি শরীয়তের বিধানদাতা রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর প্রকাশ্য বা ইশারামূলক অনুমতি দ্বারা এবাদতের ক্ষেত্রে বেদআতসমূহ পরিবেশিত হয়, তবে সেগুলোকে বলা হবে '**বেদআতে হাসানাহ**'; এগুলো মোস্তাহাব বা ওয়াজিব। মসজিদের জন্যে মিনারা নির্মাণ মোস্তাহাব। এগুলো নির্মাণ করা সওয়াবদায়ক, কিন্তু নির্মাণ না করা গুনাহ নয়। মিনারাকে '**মা'আযানা**'-ও বলা হয়। হযরত যায়দ ইবনে সাবেত (রা:)-এর মাতা (রা:) বলেন, "মসজিদে নববীর আশপাশে সর্বোচ্চ বসতঘর ছিল আমারটি। ইতিপূর্বে হযরত বেলাল (রা:) আমার ঘরের ছাদে উঠে আযান দিতেন। কিন্তু মসজিদে নববী নির্মিত হবার পরে তিনি ওই মসজিদের সর্বোচ্চ স্থানে উঠে আযান দেয়া আরম্ভ করেন।" এই বক্তব্যে প্রতীয়মান হয় মোয়াযযিনদের জন্যে মিনারায় উঠে আযান দেয়া সুন্নাত। মাদ্রাসা নির্মাণ এবং ধর্মীয় বইপত্র লেখা হচ্ছে বেদআত, যা ওয়াজিব বটে। এগুলো করা সওয়াব এবং না করা পাপ। এই একই নীতি প্রযোজ্য হবে অবিশ্বাস সৃষ্টিকর বেদআতের অনুশীলনকারী বেদআতী ও মুলহিদবর্গের কৃত সন্দেহ অপনোদনে সতর্ককারী দলিলাদি উপস্থাপন করার ক্ষেত্রেও।

ওপরে লিপিবদ্ধ বিভিন্ন হাদীস শরীফে উল্লেখিত বেদআত-ই হলো বেদআতে সাইয়্যেয়াহ, যা ইসলামের মধ্যে পরিবেশিত হয়েছিল। এগুলো এবাদতের ক্ষেত্রে উপকারী নয়। পক্ষান্তরে বেদআতে হাসানাহ, যা এবাদতের জন্যে সহায়ক এবং যা শরীয়তের বিধানদাতা (রাসূলুল্লাহ দ:)-এর অনুমতিক্রমে পালিত হয়, তা গোমরাহী নয়। '**আমার সুন্নাহকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো, এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকেও**' – মহানবী (দ:)-এর এই হাদীসের অর্থ 'তোমাদের মস্তিষ্ক ও নফসকে অনুসরণ করে তোমরা ইসলামের মধ্যে যে পরিবর্তন সাধন করেছ, তা বর্জন করো এবং আমার পথকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো।' হাদীসটি প্রতিভাত করে প্রথাগত বেদআতগুলো গোমরাহী নয়। কেননা, ধর্মীয় শিক্ষাসমূহ-ই রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর পথের আওতাভুক্ত। তিনি প্রথা সম্পর্কে কোনো কিছুই বলেননি। তিনি মানুষদেরকে তাদের ঈমান সম্পর্কে জানাতে আবির্ভূত

হয়েছিলেন। তাঁকে তাদের দুনিয়াদারী-সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষা দিতে প্রেরণ করা হয়নি। কেননা, মানুষেরা নিজেদের দুনিয়াদারীর বিষয় সম্পর্কে ভালই জানতো, যদিও তারা জানতো না আল্লাহতা'লার এরাদা (চূড়ান্ত ইচ্ছে) ও আদেশ-নিষেধ কী ছিল।

বর্তমানে 'বেদআত' বলতে আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত বেদআতকেই বোঝায়। এই ধরনের গোমরাহ ধারণা পোষণকারী লোকদের বলা হয় '**মোবতাদী**' ও '**আহল আল-হাওয়া**'। কারণ তারা তাদের নফসকে অনুসরণ করে, দ্বীন ইসলামকে নয়। বাহাত্তরটি গোমরাহ দল ওই পর্যায়ভুক্ত। তাদের কারো কারো ধ্যান-ধারণা কুফরী সৃষ্টিকর। যে সমস্ত লোক ইন্তেকালের পরে পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না, আল্লাহতা'লার সিফাত তথা গুণাবলী অস্বীকার করে, অথবা এ কথা বলে যে সৃষ্টিকুলের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতি চিরন্তন, তারা এই শ্রেণীভুক্ত। কুফরী তথা অবিশ্বাস সৃষ্টিকারী ধারণাগুলোকে '**এলহাদ**' বলা হয়। এই ধরনের ধারণা পোষণকারীদের বলা হয় '**মুলহিদ**'। এ রকম ধারণা কুফরী সৃষ্টিকর হবে না, যদি এর পোষণকারী অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক কোনো আয়াতে করীমা বা হাদীস শরীফ, যা তা'বিলযোগ্য তথা একাধিক অর্থের মধ্য হতে উপযুক্ত অর্থটি বাছাইযোগ্য, তা থেকে ভুল অর্থ বের করে। যারা কবর আযাব অথবা মে'রাজে বিশ্বাস করে না, তারা এই শ্রেণিভুক্ত। কিন্তু এই সব বেদআত যা কুফরী সৃষ্টি করে না, সেগুলো অন্যায়ভাবে মো'মেন মুসলমান হত্যা ও অবৈধ যৌনাচারের মতো গুরুতর অপরাধের চেয়েও জঘন্য পাপ। কুরআনুল করীম ও হাদীস শরীফ থেকে ধারণার ভিত্তিতে ভুল অর্থ বের করার দরুন তারা অবিশ্বাসীতে পরিণত হয় না। আজকে অনেক লোক এ সত্য অবিশ্বাস করে ভ্রান্ত তা'বিলের কারণে নয়, বরং এই অজুহাতে যে এগুলো না-কি যুক্তি ও বিজ্ঞানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। যে সব অবিশ্বাসী তাদের ধ্যান-ধারণা ইসলামের ওপর নয়, বরং যুক্তি ও বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে অন্তরে লালন করে, তারা মুরতাদ্দ (ধর্মচ্যুত) হয়ে যায়। মুলহিদ যাদের আকীদা-বিশ্বাস কুফরী সৃষ্টিকর, তারা নিজেদেরকে মুসলমান মনে করে, এবাদত পালন করে এবং পাপ-ও এড়িয়ে চলে। কিন্তু এ সব কাজের কোনোটি-ই বৈধ নয় বলে সাব্যস্ত হবে। এবাদতের ক্ষেত্রে বেদআতে সাইয়্যেয়াহ আকীদা-বিশ্বাসগত বেদআতে সাইয়্যেয়াহ'র মতো মন্দ বিষয় নয়; কিন্তু সেগুলো-ও অগ্রহণযোগ্য এবং গোমরাহীপূর্ণ। যে কোনো ধরনের পাপের চেয়েও সেগুলোকে এড়িয়ে চলা বেশি জরুরি। বিশেষ করে এবাদতের ক্ষেত্রে কোনো বেদআত যদি কোনো সুন্নাতে মোয়াককাদা পালনে অবহেলার হেতু হয়ে দাঁড়ায়, তবে সেই বেদআত আরও বেশি পাপের বোঝা হবে।

আকীদা-বিশ্বাসগত বেদআতের বিপরীতমুখি হচ্ছে '**আহল আস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আত**' নামের আকীদা-বিশ্বাস। আর এবাদতের ক্ষেত্রে বেদআতের বিপরীত হচ্ছে '**সুন্নাত আল-হুদা**'। প্রথমোক্তটি মহানবী (দ:)-এর আকীদা-বিশ্বাসকেই প্রতিফলন করে; আর দ্বিতীয়টি সেই সমস্ত এবাদতকে বোঝায়, যেগুলো তিনি ধারাবাহিকভাবে পালন করতেন কিন্তু কখনো কখনো বাদ দিতেন, অথচ যেগুলো বাদ দিতে তিনি কাউকে মানা করেননি। যেগুলো বাদ দিতে তিনি নিষেধ করেছিলেন, সেগুলোকে '**ওয়াজিব**' বলা হয়। কোনো ওজর ব্যতিরেকে একটি সুন্নাতে হুদাকে বাদ দেয়া পাপ নয়। তবে যে ব্যক্তি সেগুলোকে বারংবার বাদ দেয়, তাকে পুনরুত্থান দিবসে ভর্ৎসনা করা হবে। এগুলোর দৃষ্টান্ত হলো আযান, একামত, জামাআতে নামায আদায় এবং দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সুন্নাতসমূহ। কিন্তু কোনো এলাকা/মহল্লার সকল অধিবাসী যদি এগুলো বাদ দেয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।

প্রথা বা আচারে পরিবেশিত বেদআত গোমরাহী (দালালাত/পথভ্রষ্টতা) নয়। এগুলো চর্চা না করা ওয়ারা'র পরিচায়ক এবং উত্তম। প্রয়োজনের তুলনায় বাড়িঘর উঁচু করে নির্মাণ, অতি ভোজন, কফি ও চা এবং ধূমপান করা প্রথাগত বেদআত। এগুলো হারাম বা মকরূহ কি-না, তা আমরা বলতে পারি না। আল্লাহতা'লার আদেশ-নিষেধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো সুলতানের আদেশ-নিষেধ বৈধ বলে পরিগণিত হবে। কিন্তু তিনি নিজ নফস ও মস্তিষ্কের অনুসরণে যে আদেশ জারি করেন তা মান্য করা ওয়াজিব নয়; কিন্তু সেগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অনুমতি-ও নেই। উপরন্তু, কোনো নিষ্ঠুর সুলতানের অন্যায় ও শোষণ থেকে রেহাই পাবার বা নিরাপদ থাকার জন্যে তার আদেশ মান্য করা ওয়াজিব। কেননা, কারো পক্ষে নিজেকে বিপদে ফেলার কোনো অনুমতি-ই নেই। '**উলূল আমর**'-সম্পর্কিত আয়াতটি, যাঁদেরকে মানতে মুসলমানদের প্রতি তাতে আদেশ করা হয়েছে, তাঁরা হলেন মুসলমান শাসক বা বিচারক (উলেমা-মাশায়েখবৃন্দ-ও)। তাঁদের সঠিক ও ন্যায্য আদেশ মান্য করা ওয়াজিব। প্রথাগত বেদআতের বিপরীতে রয়েছে '**সুন্নাত আয্ যায়েদা**', যা'তে অন্তর্ভুক্ত রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর অভ্যাসগত কাজ-কর্ম। এর উদাহরণ সে সব মোস্তাহাব যেমন তাঁর পরিধেয় বস্ত্রের ধরন, যা পরিধান আরম্ভ হতো তাঁর জিসম (শরীর) মোবারকের ডানদিক থেকে, পানাহার, কোনো কিছু দেয়া বা নেয়া ডান হাতে, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার পর বাঁ হাতে শৌচ, এবং টয়লেটে যাওয়ার সময় বাঁ পায়ে প্রবেশ করা। [অতএব, এটি পরিদৃষ্ট হচ্ছে যে সময়ের পরিক্রমণে পুরুষ ও নারীদের জামাকাপড়ে পরিবর্তন এবং গুনাহগারদের মতো তাদের বস্ত্র পরিধান প্রথাগত বেদআতেরই অন্তর্ভুক্ত। নারীদের হাত ও মুখ ভিন্ন সারা শরীর ঢাকবার মতো বড় জামা পরিধান ধর্মীয় ক্ষেত্রে বেদআত নয়। সেগুলো পাপ-ও নয়। ওই ধরনের জামাকাপড় পরার সময় তাদেরকে অবশ্যই তাদের দেশের রীতি মেনে চলতে হবে। প্রথানুগ নয় এমন শরীর ঢাকার জামাকাপড় পরলে (বিত্তের) প্রদর্শনী ও ফিতনার সৃষ্টি হতে পারে। এই দুটোই হারাম।]

এ যাবত যা বলা হয়েছে তাতে উপলুব্ধ হয় যে বেদআত সাধারণতঃ আভিধানিক অর্থে দুই ধরনের হয়ে থাকে: প্রথাগত বেদআত ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বেদআত। শুধু 'বেদআত' শব্দটি যদি ব্যবহৃত হয়, তবে তা ধর্মীয় ক্ষেত্রে বেদআতকেই উদ্দেশ্য করে। আর ধর্মীয় ক্ষেত্রে বেদআত দুই রকম; আকীদা-বিশ্বাসগত এবং এবাদত-বন্দেগী সংক্রান্ত। আকীদা-বিশ্বাসগত সমস্ত নতুন প্রবর্তিত বিষয়-ই বেদআত-এ-সাইয়্যেয়াহ। আর এবাদতের ক্ষেত্রে বেদআত দুই ধরনের: বেদআতে সাইয়্যেয়াহ ও বেদআতে হাসানা। বেদআতে সাইয়্যেয়াহ হচ্ছে সে সকল বেদআত যেগুলো আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে বিরাজমান কিন্তু কুফরী (অবিশ্বাস) সৃষ্টিকর নয় এবং যেগুলো এবাদতের মধ্যে বিদ্যমান কিন্তু ইসলামের খেদমতে আসে না। যে বেদআত কুফরী সৃষ্টি করে, সেটি 'এলহাদ' হিসেবে রূপান্তরিত হয়। অপর পক্ষে, বেদআতে হাসানাহ সে সমস্ত নতুন প্রবর্তিত বিষয় যা ইসলামের খেদমতে আসে। এগুলো-ও দুই ধরনের হয়ে থাকে: মোস্তাহাব ও ওয়াজিব। (মসজিদের) মিনারা হলো বেদআতে হাসানা যা মোস্তাহাব। কেননা, মুয়াযযিনদের জন্যে উঁচুস্থানে উঠে নামাযের আযান দেয়া সুন্নাত। মিনারা এই সুন্নাতের পক্ষে খেদমত করে। বেদআতে হাসানা-সূচক নতুন বিষয়গুলো জায়েয (অনুমতিপ্রাপ্ত), এমন কি শরীয়তের বিধানদাতা মহানবী (দ:) কর্তৃক আদিষ্ট-ও বটে।

প্রশ্ন: মোস্তাহাব ও ওয়াজিব বেদআতে হাসানা বিষয়গুলো সাহাবা-এ-কেরাম (রা:), তাবেঈন ও তাবে' তাবেঈনবৃন্দ কেন অনুশীলন করেননি?

জবাব: এগুলোর কিছু কিছুর প্রয়োজন তাঁদের ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, তাঁরা মাদ্রাসা/বিদ্যালয় নির্মাণ করেননি, বইপত্র-ও লেখেননি। কেননা, তখন অনেক মুজতাহিদ আলেম তথা জ্ঞান বিশারদ ও বিদ্বান ছিলেন। সবার জন্যে জিজ্ঞাসা করে শেখা অত্যন্ত সহজ ছিল। অধিকন্তু, বিশালাকৃতির অট্টালিকা বা মিনারা নির্মাণের জন্যে পর্যাপ্ত অর্থ বা সম্পদ তাঁদের কাছে ছিল না। কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ হলো তাঁদের হাতে আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল, যার দরুন তাঁরা সময় পাননি। দিনরাত তাঁদেরকে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে, ইসলামের প্রচার-প্রসারে বাধাদানকারী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও একনায়কদের বিরুদ্ধে জ্বেহাদ করতে হয়েছে। নিজেদের সমস্ত অর্থসম্পদ-ই এই জ্বেহাদে তাঁরা ব্যয় করেন। বিভিন্ন দেশ ও নগরী জয় করে তাঁরা নিষ্ঠুর রাষ্ট্রযন্ত্রের নাগপাশ থেকে ওই অঞ্চলের নিপীড়িত জনগণকে রক্ষা করেন এবং তাদেরকে মহান ধর্মে দীক্ষা দিয়ে ইহ ও পরকালীন শান্তি অর্জনে সহায়তা করেন। তাঁরা আল্লাহর বান্দাদের কাছে ইসলামের আজ্ঞা ও নৈতিকতা পৌঁছে দেন। অন্যান্য কাজ করার সময় তাঁদের হাতে ছিলই না।

রাসূলূল্লাহ (দ:) এরশাদ ফরমান, "**কোনো ব্যক্তি ইসলাম ধর্মে সুন্নাতে হাসানা (সুন্দর রীতি) প্রবর্তন করলে সে এর সওয়াব পাবে এবং যারা এটি অনুশীলন করবে, তাদের সওয়াব-ও সে পেতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি সুন্নাতে সাইয়্যেয়াহ (মন্দ রীতি) প্রবর্তন করবে, সে এর শাস্তি তো পাবেই, উপরন্তু, যারা এটি অনুশীলন করবে, তাদের শাস্তিরও অংশীদার হবে সে**।" এই হাদীস শরীফে বর্ণিত 'সুন্নাতে হাসানা'র মধ্যে সমস্ত বেদআতে হাসানা-ই অন্তর্ভুক্ত। সকলের দ্বারা পৃথিবীর শেষ অবধি চর্চিত নতুন রীতির প্রবর্তনকারী ব্যক্তির পুরস্কৃত বা শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে তারই নিয়্যতের ওপর, যেটি দ্বারা সে অন্যান্যদের অনুশীলনের জন্যে উদ্দেশ্য করেছিল। অনুরূপভাবে, যদি কোনো (নামাযের) জামাআতে ইমাম সাহেব ইমামতি করার নিয়্যত না করেন, তাহলে তিনি শুধু একাকী নামায পড়ার সওয়াব অর্জন করবেন। কিন্তু তা ইমামতির (জন্যে বরাদ্দ) ২৭ গুণ বেশি সওয়াব হবে না। জামাআতে ইমামতি করার পুরো সওয়াব অর্জনের জন্যে তাঁকে অবশ্যই নিয়্যত করতে হবে।
বেদআতে সাইয়্যেয়াহ সংঘটনের ক্ষতি কোনো সুন্নাহ, এমন কি ওয়াজিব পরিত্যাগের ক্ষতিকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। আরেক কথায়, কোনো বিষয় সম্পর্কে যদি সন্দেহ থাকে যে সেটি সুন্নাত নাকি বেদআত, তবে তা পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন: ইসলাম ধর্মকে কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছে। এই দুটো মৌলিক উৎসে যে এবাদত পদ্ধতির অনুমতি নেই, তা-ই হচ্ছে বেদআত। এরই আলোকে এ কথা বলা কি বৈধ হবে যে আদীল্লাত আশ্ শরীয়ত (শরীয়তের দলিল) চারটি?

জবাব: আহল আস্ সুন্নাতের উলেমাবৃন্দ বলেছেন আদীল্লাত আশ্ শরীয়ত চারটি: কুরআন মজীদ, হাদীস শরীফ, কেয়াস আল-ফুকাহা এবং এজমা' আল-উম্মাহ। কিন্তু শেষোক্ত দু'টি প্রথমোক্ত দু'টি হতে নিঃসৃত। অতএব, বাস্তবে উৎস হলো দু'টি: আল-কুরআন ও হাদীস শরীফ। এজমা' তথা ঐকমত্যের ভিত্তিতে যে আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তা কুরআন বা সুন্নাহ'র ওপর ভিত্তিশীল কোনো দলিল থেকেই বের করা হয়েছিল। অধিকন্তু, এজমা'র জন্যে কেয়াস-ও প্রামাণ্য দলিল হতে পারে। হযরত আবূ বকর (রা:)-কে খলীফা নির্বাচনের সময় যে এজমা' (ঐকমত্য) হয়েছিল, তা এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা যায়। কোনো একজন রাবী (বর্ণনাকারী)-এর বর্ণিত হাদীস শরীফ-

ও (শরীয়তের) দলিল হিসেবে গৃহীত হতে পারে। কেননা, এজমা'র বৈধতার জন্যে সেটির দলিল নিশ্চিত হওয়া জরুরি নয়। এজমা' প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেই তা দলিলে পরিণত হয়। যদি এর দলিল নিশ্চিত হওয়া পূর্বশর্ত হতো, তবে এজমা'টি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়তো। দালিলিক প্রমাণ-ই হতো সেটির চূড়ান্ত দলিল। দলিল হিসেবে কেয়াসের ক্ষেত্রেও কুরআন বা সুন্নাহ'র নীতিমালা অনুসরণ করা জরুরি। কেননা, কেয়াস কুরআন মজীদ ও সুন্নাতে অন্তর্নিহিত কোনো গোপন বিধান প্রকাশ করে থাকে। এটি কোনো নতুন বিধান উৎস দুটোতে যোগ করে না। অর্থাৎ, এটি বিধি-বিধান উদ্ভাবন নয়, বরং প্রকাশ করে। এটি ফুরূ (ইসলামী জ্ঞানের আকীদা-বিশাসগত শাখার পাশাপাশি অনুশীলনীয় শাখাও)-এর সাধারণ নিয়মকানুন ব্যাখ্যা করে মাত্র। আর এজমা' হতে পারে কেয়াসের জন্যে একটি উৎস, বড় একটি সমর্থনসূচক দলিল। সুন্নাহ হলো আল-কুরআনেরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। অতএব, ইসলামের একমাত্র উৎস হচ্ছে কিতাবুল্লাহ (আল্লাহর কেতাব তথা আল-কুরআন)। আজকাল তথাকথিত কিছু ভণ্ডপীর ও ভুয়া সূফী (তাসাউফপন্থী) নিজেদের শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্যে অভিযুক্ত হলে বলে, "এগুলো যাহেরী (প্রকাশ্য) জ্ঞানে হারাম হলেও আমাদের বাতেনী (আধ্যাত্মিক) জ্ঞান বিদ্যমান। তাই এগুলো আমাদের জন্যে হারাম নয়।" এ ধরনের কথা বলা-ই হচ্ছে কুফরী (অবিশ্বাস)। যে ব্যক্তি এ রকম কথা বলে বা এ রকম বক্তব্যকে অনুমোদন করে, সে অবিশ্বাসী হয়ে যায়। এ সব কথাকে তা'বিল (ভিন্নতর ব্যাখ্যা প্রদান) করার বা অর্থ না জেনে এই ধরনের কথা বলার কোনো ওজর-ই নেই। ওই সকল যিনদিক্ক আরও বলে, "তোমরা জ্ঞান আহরণ করো বইপত্র পড়ে। কিন্তু আমরা তা আহরণ করি তার মালিক থেকে, মানে সরাসরি হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে। আমরা যদি তাতে সন্তুষ্ট না হই, তাহলে আমরা আল্লাহতা'লাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেই। আমাদের বইপত্র পড়ার দরকার নেই বা শেখার জন্যে মোর্শেদের শরণাপন্ন হওয়ারও প্রয়োজন নেই। আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ ও রেযামন্দি হাসিলের জন্যে যাহেরী জ্ঞান ত্যাগ করা জরুরি এবং ইসলাম সম্পর্কে না জানা-ই উচিত। আমাদের পথ ও মত যদি ভ্রান্ত হতো, তাহলে কি আমরা এতো উঁচু আধ্যাত্মিক মকামে উন্নীত হতে পারতাম এবং কারামত লাভ করতাম? আর এতো নূর (আধ্যাত্মিক জ্যোতি) ও আম্বিয়া (আ:)-বৃন্দের রূহকেও কি দেখতে পেতাম? আমরা কোনো পাপ করলে আমাদেরকে স্বপ্নে তা জানানো হয়। স্বপ্নে আল্লাহতা'লা আমাদেরকে সে সব কাজের অনুমতি দেন যেগুলোকে তোমরা হারাম মনে করো; আর আমরা জানি সেগুলো আমাদের জন্যে হালাল।" ইসলাম ধর্মকে বিনাশের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত এ ধরনের কথাবার্তা 'এলহাদ' ছাড়া কিছু নয়। অর্থাৎ, এগুলো কুরআন ও সুন্নাহ'র প্রকাশ্য অর্থকে পরিবর্তনের মানসে ব্যক্ত হয়। এগুলোই দালালাত, মানে ঈমানদারদের পথ হতে বিচ্যুতি। এগুলো দ্বারা ইসলামের সাথে তামাশা করা হয়। এ রকম হীন বক্তব্যে বিশ্বাস করাই উচিত নয়। এগুলো যে ভুল (গোমরাহী), তাতে সন্দেহ করাও কুফরী। এ ধরনের কথা যে ব্যক্তি বলে বা বিশ্বাস করে, তাকে '**যিনদিক**' বলা হয়। কেউ এ রকম কথা বলেছে বলে অন্য কারো কাছ থেকে শুনে কোনো ব্যক্তিকে যিনদিক আখ্যা দেয়া মোটেও উচিত নয়। এ ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে প্রথাগতভাবে দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রয়োজন হবে। যিনদিক অর্থ 'দাহরী', মানে আল্লাহতা'লা ও আখেরাতে অবিশ্বাসী বস্তু ও প্রকৃতির পূজারী কোনো ব্যক্তি।

'এলহাম' (আউলিয়াকে প্রদত্ত ঐশী প্রেরণা) দ্বারা ইসলামী আইনকানুন শেখা যায় না। তাই আউলিয়া কেরামকে প্রদত্ত এলহাম অন্যান্যদের জন্যে প্রামাণ্য দলিল হতে পারে না। '**এলহাম**' মানে আল্লাহতা'লার তরফ থেকে অন্তরে আগত (আধ্যাত্মিক) জ্ঞান। হ্যাঁ, আউলিয়ার কাছে আগত এলহাম অবশ্যই সত্য। ওগুলোর সত্যতা বিচার্য হয় ইসলামী শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে।

কিন্তু ওলী হতে হলে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ ও তা মান্য করা শর্ত। ‘**আল্লাহ তা’লা তাকওয়া-সম্পন্ন মানুষের প্রতি জ্ঞান মঞ্জুর করেন**’ – আয়াতটি এই বিষয়ের পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে না এবং বেদআত বর্জন করে না এমন ব্যক্তির অন্তরে এলহাম আগমন করে না। তার কথাবার্তা সবই নফস ও শয়তানের গোমরাহী। আমাদের এই বক্তব্য কিন্তু আবার হযরত মূসা (আ:) ও খিযির (আ:)-এর মধ্যকার কথোপকথনের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়, কেননা দ্বিতীয়জন প্রথমজনের উম্মত ছিলেন না। তবে মহানবী (দ:) হলেন সমগ্র দুনিয়ার শেষ সময় অবধি আগত সকল মানব ও জ্বিন জাতির পয়গম্বর। যাঁরা রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেন, শুধু তাঁদেরই প্রতি ‘**আল-এলম আল-লাদুন্নী**’ এবং ’**এলহাম**’ মঞ্জুর হয়ে থাকে। আর এই নেয়ামত লাভকারী পুণ্যাত্মাবৃন্দ কুরআন-হাদীস ভাল বোঝেন। ইসলামী শিক্ষা স্বপ্ন দ্বারাও বোঝা যায় না। যে স্বপ্ন ইসলামের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ, তাকে শয়তানী হিসেবে বিবেচনা করতে হবে (যেমন ইলিয়াস মেওয়াটীর স্বপ্নে প্রাপ্ত ৬ উসূলি তাবলীগ – অনুবাদক)।
আউলিয়াকুল শিরোমণি হযরত জুনায়দ আল-বাগদাদী (বেসাল: ২৯৮ হিজরী/৯১০ খৃষ্টাব্দ, বাগদাদ) বলেন, “আল্লাহ পাকের রেযামন্দি হাসিলের একমাত্র পথ হচ্ছে মহানবী (দ:)-এর অনুসরণ।” তিনি আরও বলেন, “যে ব্যক্তি কুরআনুল করীম বা হাদীস শরীফ মানে না, সে মোর্শেদ (পথপ্রদর্শক) হতে পারে না” [অ-মুজতাহিদ ব্যক্তিবর্গ কুরআন-হাদীস বুঝতে অক্ষম। বাহাত্তরটি ভ্রান্ত দলের মোল্লা-পুরোহিত অ-মুজতাহিদ হওয়ার কারণেই কুরআন-হাদীস বোঝেনি। তারা লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে পথভ্রষ্ট করেছে। কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফকে মান্য করতে হলে চার মযহাবের যে কোনো একটিকে অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক। – আল্লামা ইশিক]। হ্যাঁ, কুরআন ও হাদীস পড়েননি বা শেখেননি এমন কোনো নিরক্ষর ব্যক্তি হয়তো আ’রিফ (খোদা সম্পর্কে জ্ঞানী) হতে পারেন এবং আল-কুরআনের অর্থ বুঝতেও পারেন, কিন্তু তিনি অন্যদের জন্যে মোর্শেদ হতে পারবেন না। মোর্শেদ (পীর বা শায়খ) হতে হলে কুরআন ও সুন্নাহতে নিহিত বিধিবিধান তাঁকে কোনো শায়খের কাছ থেকেই শিখতে হবে। কেননা, সালাফ আস্ সালেহীন ও তাঁদের উত্তরসূরীদের পথ ও মত-ই হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহ’র প্রদর্শিত পথ।

আউলিয়াকুল শিরোমণি ও হযরত মা’রূফ কারখী (রহ:)-এর শিষ্য এবং শায়খ জুনায়দ বাগদাদী (রহ:)-এর মামা ও পীর-মোর্শেদ হযরত সিররী সাকাতী (বেসাল: ২৫১ হিজরী/৮৬৫ খৃষ্টাব্দ, বাগদাদে) বলেন, “তাসাউফ তিনটি অর্থের সমষ্টি: ‘ওয়ারা’র অধিকারী হওয়া; কুরআন-সুন্নাহ-বিরোধী কোনো কথা উচ্চারণ না করা; এবং কারামত (প্রদর্শন)-সূত্রে কোনো হারাম সংঘটন না করা” [যে অলৌকিক কর্ম দ্বারা কেউ হারাম সংঘটন করে, তাকে ‘মকর’ বা ‘এসতেদরাজ” বলে]। ‘**ওয়ারা**’ মানে সন্দেহজনক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা। ইমাম গাযযালী (বেসাল: তুস/মাশাদ, ইরান ৫০৫ হিজরী/১১১১ খৃষ্টাব্দ) তাঁর ‘**মেশকাতুল আনওয়ার**’ গ্রন্থে বলেন, “কলব্ তথা অন্তর (হৃদয়) হলো ফেরেশতামণ্ডলীর একটি গৃহ। আর ক্রোধ, কাম, হিংসা-বিদ্বেষ ও দম্ভের মতো বদ অভ্যাসগুলো ঘেউ ঘেউ করা কুকুরের মতোই। কুকুর যেখানে অবস্থান করে, সেখানে ফেরেশতাবৃন্দ প্রবেশ করেন না। একটি হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (দ:) এরশাদ ফরমান, ‘**ফেরেশতামণ্ডলী এমন গৃহে প্রবেশ করেন না, যেখানে কুকুর বা কোনো ছবি বিরাজমান**।’ আমি এ কথা বলি না যে এই হাদীসে বিবৃত ‘গৃহের’ মানে হলো ‘অন্তর’ কিংবা ‘কুকুরের’ মানে ‘বদ অভ্যাস’। আমার এই কথাটি বেদআতী বাতেনীয়্যা গোষ্ঠী হতে আহল আস্ সুন্নাত ওয়াল জামা’আতকে পৃথক করেছে। কেননা, বাতেনীয়্যা চক্র প্রকাশ্য অর্থগুলোকে এড়িয়ে গোমরাহীপূর্ণ

অর্থ আরোপ করে থাকে। যদি কোনো আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ অন্যান্য আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের পরিপন্থী হয়, তবে এর প্রকাশ্য অর্থকে ছেড়ে দিতে হবে এবং একে তা'বিল তথা ভিন্নতর ব্যাখ্যা দিতে হবে; অর্থাৎ, আরোপযোগ্য সমস্ত অর্থ হতে সবচেয়ে প্রযোজ্য অর্থটি খুঁজে নিতে হবে। তা'বিল যখন প্রয়োজন তখনো যারা প্রকাশ্য অর্থটি গ্রহণ করতে চায়, তাদেরকে বলা হয় '**হিশউয়ী**'। এই কারণেই বলা হয়ে থাকে যে কুরআন মজীদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অর্থ বিদ্যমান। যারা সদাসর্বদা প্রকাশ্য অর্থগুলো গ্রহণ করে তারা হিশউয়ী। আর যারা সবসময়ই অপ্রকাশ্য, ভিন্নতর অর্থগুলো বেছে নেয়, তারা বাতেনী। পক্ষান্তরে, যাঁরা প্রয়োজন মোতাবেক দুটো অর্থ-ই আরোপ করেন, তাঁরা প্রকৃত মুসলমানে পরিণত হন।" তাসাউফের (সূফীবাদী) কোনো বিদ্বান ব্যক্তির কথাবার্তা ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না তা বুঝতে পারেন একমাত্র যাহেরী (প্রকাশ্য) ও বাতেনী (অপ্রকাশ্য) জ্ঞানের অধিকারী বিশেষজ্ঞ আলেম-এ-হক্কানী। তাসাউফের বোযর্গ আলেমবৃন্দের ব্যবহৃত কথার মানে যারা জানে না, তারা তা বোঝেও না। কামেলীয়ত তথা পূর্ণতাপ্রাপ্ত নয় এমন লোকেরা (যাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ইবনে তাইমিয়্যা ও মোহাম্মদ ইবনে আব্দিল ওয়াহহাব) ধারণা করে যে হযরত বায়যিদ (রহ:)-এর উচ্চারিত 'সোবহানী মা আ'যামা শানী' (পবিত্রতা আমারই, আমার মর্যাদার চেয়ে বড় আর কিছু নেই) বাণীটি ইসলামের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু শায়খ মহিউদ্দীন ইবনে আরবী (রহ:) এটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে যেয়ে বলেন যে এই মন্তব্য 'কামাল-এ-তানযিহ'। ইসলাম অমান্যকারী ব্যক্তিবর্গ অত্যাশ্চর্যজনক কর্ম সংঘটন করতে পারে। এগুলোকে 'কারামত' বলা হয় না, বরং '**এস্তেদরাজ**' বলা হয়। হযরত বায়েযীদ বোস্তামী (রহ:) ওলী হিসেবে পরিচিত এক লোককে কিবলা (কাবা শরীফ)-এর দিকে থুতু ফেলতে দেখে বলেন, "এই লোক রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর একটি সুন্দর আচরণকে অবজ্ঞা করেছে; (তাই) সে ওলী হতে পারে না।" [অনুবাদকের নোট: তরীকত মানে যে আদব, এ কথায় তা স্পষ্ট প্রমাণিত]

হযরত বায়েযীদ বোস্তামী (রহ:) বলেন, "কোনো ব্যক্তি পানিতে হাঁটা, মুহূর্তে দূরবর্তী স্থানে গমন ও আকাশে ওড়ার মতো অত্যাশ্চর্যজনক ক্রিয়া সংঘটন করলেও যদি সে ইসলামকে না মানে, তবে তাকে ওলী হিসেবে বিবেচনা করবে না।" ইসলাম ধর্মকে মান্য করার জন্যে প্রয়োজন চার মযহাবের যে কোনো একটির অনুসরণ। এ কথা সর্বসম্মতভাবে ঘোষিত হয়েছে যে অ-মুজতাহিদ ব্যক্তিবর্গের জন্যে (সরাসরি) সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর অনুসরণ করার কোনো অনুমতি-ই নেই (কেননা তাঁদের মযহাবগুলো অজ্ঞাত)। এজতেহাদ পৃথিবীর শেষ সময় পর্যন্ত প্রয়োগযোগ্য হতে পারে [কিন্তু এজতেহাদ প্রয়োগের এই যোগ্যতা খুব কম সংখ্যক আলেমেরই আছে। উপরন্তু, তাঁদের পক্ষে নতুন এজতেহাদ প্রয়োগের কোনো প্রয়োজনীয়তা এখন আর অবশিষ্ট নেই। প্রলয় দিবস পর্যন্ত যতো বিষয়ের উদ্ভব হতে পারে, সবগুলোরই সমাধান চার মযহাবের বইপত্রে প্রদান করা হয়েছে – আল্লামা হুসাইন হিলমী]। আল্লাহ পাক যে এবাদতটি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন, তা হলো ফরয-সমূহ। আর নফল এবাদতের মধ্যে মূল্যবান সেগুলোই, যা ফরযের সাথে পালিত হয় এবং ফরযেরই অন্তর্ভুক্ত ও তারই পরিপূরক।
শায়খ মোহাম্মদ ইবনে ফযল বলখী (বেসাল: ৩১৯ হিজরী/৯৩১ খৃষ্টাব্দ) বলেন, "চারটি বিষয় অন্তর থেকে ইসলামের নূর (আধ্যাত্মিক জ্যোতি)-কে দূর করে দেয় এবং অন্তরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে: নিজস্ব এলম (জ্ঞান)-এর অনুশীলন না করা; না জেনে ধর্মচর্চা করা; না জানা বিষয় জানতে চেষ্টা না করা; এবং অন্যান্যদের জানার পথে বাধা সৃষ্টি করা।" কিছু লোক 'আলেম' হিসেবে পরিচিতি পাওয়ার জন্যে এবং অর্থসম্পদ ও উচ্চপদ লাভের জন্যে এলম অর্জন করে থাকে [তারা নিজেদের

ধর্মীয় পদগুলো জীবিকার জন্যে ও রাজনীতি করার লক্ষ্যে ব্যবহার করে – আল্লামা ইশিক]। কিন্তু নিজেদের জীবনে প্রতিফলনের জন্যে তারা তা অনুশীলন করে না। বস্তুতঃ তারা নামমাত্র ধর্মের পদধারী আলেম। তারা যে পথ অনুসরণ করে তা অজ্ঞমূর্খদেরই পথ। আল্লাহ পাক দয়াশীল এবং তিনি ক্ষমা করতে পছন্দ করেন, এ কথা বলে তারা মহাপাপ সংঘটন করে। তারা নিজেদেরই বিবেচনা ও ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে থাকে। অন্যদেরকেও তারা একই রকম হতে দেখতে চায়। তারা তাদের পথ অনুসরণ না করার কারণে সত্যিকার মুসলমানদেরকে দোষারোপ করে। অধিকন্তু, তারা মনে করে তারাই সঠিক পথের পথিক এবং নাজাতপ্রাপ্ত। আহল আস্ সুন্নাহ'র উলেমাবৃন্দের লেখা গ্রন্থাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসমৃদ্ধ বইপত্র পড়াকে তারা বর্জন করে এবং নিজেদের সন্তানদেরকেও সেগুলো পড়তে দেয় না। তাদের অন্তরগুলো বদমাইশিপূর্ণ এবং কথাবার্তাও মিথ্যে ও ধোকাপূর্ণ! প্রতিদিনই তারা নিত্যনতুন ছদ্মবেশে আবির্ভূত হয়। মানুষের সামনে হাসিমুখ হলেও তাঁদের আড়ালে তারা তাঁদের কুৎসা রটনায় ব্যাপৃত থাকে। সত্য, সঠিক বইপত্র যেগুলো বেদআত দ্বারা কলুষিত হয়নি, সেগুলো ব্যাপকভাবে পঠিত হওয়া থেকে তারা বাধা দেয় [তারা বলে, 'এ বইপত্র পড়ো না, কারণ এগুলো ক্ষতিকর' – আল্লামা ইশিক]। যাঁরা এগুলো প্রকাশ করেন ও পড়েন, তাঁদেরকে তারা ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। ধোকাবাজি-ভরা অপপ্রচারের মাধ্যমে তারা লা-মযহাবীদের ক্ষতিকারক বইপত্রের প্রশংসা করে থাকে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে তারা হেয় প্রতিপন্ন করার অপপ্রয়াস পায়। তাদের অদূরদর্শী মস্তিষ্ক দ্বারা যা তারা লেখে, সেগুলোকেই জ্ঞান-বিজ্ঞান হিসেবে যুব সম্প্রদায়ের সামনে পেশ করা হয়। এ যাবত যা লেখা হয়েছে তা থেকে বোঝা যায়, ইসলামী বোযর্গ উলেমাবৃন্দ ও তাসাউফের মাশায়েখ আল-কেরাম সবাই ইসলামকে আঁকড়ে ধরেছিলেন, যার ফলশ্রুতিতে তাঁরা সুউচ্চ মকামে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এটি বোঝা উচিত যে যারা তাঁদের গালমন্দ করে, তারা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। ওই ধরনের গণ্ডমূর্খদের কথাবার্তায় বিশ্বাস করা আমাদের উচিত নয়। তারা ঈমান-চোরের দল। তারা চিরকল্যাণের পথে বাধাস্বরূপ লা-মযহাবী/'সালাফী' বা যিনদিক গোষ্ঠী।

যে ব্যক্তি বলে কবরের আযাবে সে বিশ্বাস করে না, সে কাফের হয়ে যায়; কারণ তার এই বক্তব্য কোনো রেওয়ায়াত (বর্ণনা) বা তা'বিল বা ইসলাম-ধর্মসম্পর্কিত নয়, বরং এতে দ্বীন ইসলামের প্রতি তার অবজ্ঞা-ই ব্যক্ত হয়।

কদরীয়্যা তথা মো'তাযেলা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত লোকেরা কাফের তথা অবিশ্বাসীতে পরিণত হয়, কেননা তারা বলে, 'আল্লাহ কোনো মন্দ বা গুনাহ সৃষ্টি করেন না। মানুষই নিজের কর্মের স্রষ্টা।'

বাতেনীয়্যা গোষ্ঠীর লোকেরা কাফের হয় এই কারণে যে তারা রূহ তথা আত্মাসমূহের পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে; আর তারা বলে, মানুষ ইন্তেকালের পরে সে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে; তারা এ-ও বলে, আল্লাহর আত্মা বারো ইমামের মধ্যে প্রবেশ করেছেন, আর বারো ইমামের পুনর্জন্ম না হওয়া পর্যন্ত ইসলাম ধর্মের অনুসরণ করা অপ্রয়োজনীয়; অধিকন্তু, তারা বলে, হযরত জিবরাইল আমীন (আ:)-কে হযরত আলী (ক:)-এর কাছে ওহী (ঐশী বাণী) নিয়ে আসার আদেশ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি ভুলক্রমে মহানবী (দ:)-এর কাছে তা নিয়ে আসেন।

খারেজী সম্প্রদায়ের লোকেরা যারা কোনো তা'বিলের ওপর নির্ভর না করে মুসলমান সর্বসাধারণকে কাফের (অবিশ্বাসী) আখ্যা দেয়, কিংবা যারা সর্ব-হযরত আলী (ক:), উসমান (রা:), তালহা (রা:), যুবায়ের (রা:) ও আয়েশা (রা:)-এর প্রতি কুফরীর দোষারোপ করে, তারাও অবিশ্বাসীতে পরিণত হয়।

এয়াযিদিয়্যা সম্প্রদায়ের লোকেরাও কাফেরে রূপান্তরিত হয়, কারণ তারা বলে জনৈক পারসিক 'নবী' আসবে এবং মহানবী (দ:)-এর ইসলাম ধর্মকে রদ করবে।

নাজারিয়্যা ও মো'তাযেলা সম্প্রদায়গুলোর লোকেরাও অবিশ্বাসী, কেননা তারা আল্লাহতা'লার বিভিন্ন সিফাত তথা বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাস করে না।

জাবারিয়্যা চক্র কাফের হয় এ কারণে যে তারা বলে, মানুষ কোনো কিছু করতে অক্ষম; সে আরজি পেশ করুক বা না-ই করুক, আল্লাহ পাক-ই সব কিছু সৃষ্টি করে দেন; আর এই কারণেই পাপীদের পাপ ক্ষমার যোগ্য।

মো'তাযেলা গোষ্ঠীর কেউ কেউ কাফের হয় এই কারণে যে তারা বলে, আল্লাহ পাক সর্বদ্রষ্টা নন এবং তাঁকে বেহেশতে দেখা যাবে না।

কদরীয়্যা গোষ্ঠী অবিশ্বাসীতে পরিণত হয়, কেননা তারা আল্লাহতা'লার সর্বজ্ঞানী হবার বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করে এবং বলে যে পরম করুণাময় কিছুই জানেন না।

মুরজিয়্যা সম্প্রদায়ের মধ্যে কারো কারো অবিশ্বাস জন্মে এই কারণে যে তারা বলে, আল্লাহপাক নিজ ইচ্ছায় কিছু অবিশ্বাসীকে মাফ করে দেবেন; আবার কিছু ঈমানদারকে চিরকাল জাহান্নামে শাস্তি দেবেন। এই সম্প্রদায়ের কেউ কেউ আরও বলে, তাদের এবাদত-বন্দেগী অবশ্যই কবুল হবে এবং গুনাহ-ও মাফ হবে। অথবা এরা বলে, সমস্ত ফরয এবাদত-ই নফল এবাদত এবং এগুলো তরক করলে পাপ হবে না।
খারেজী সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা বেদআতী, কেননা তারা বলে যে আমল ও এবাদত-বন্দেগী (মূল) ঈমানের অন্তর্ভুক্ত; আর তাই কোনো ব্যক্তি ফরয পালন না করলে কাফের হয়ে যাবে। অধিকন্তু, তাদের মতে যে ব্যক্তি কোনো বড় গুনাহ সংঘটন করে, সে বেঈমান হয়ে যায় এবং তার ঈমানদারী ফিরে আসে পাপ সংঘটন শেষ হলে পরে। [**অনুবাদকের নোট**: এই ধারণা বর্তমানের ওহাবী/মওদূদী/'সালাফী' গোষ্ঠীর মধ্যেও প্রবল]

বেদআতী ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব করার কোনো অনুমতি ইসলামে নেই। একটি হাদীস শরীফে রাসূলে করীম (দ:) এরশাদ ফরমান, "**কোনো বেদআতী লোকের সংস্রব/সংসর্গ থেকে কেউ দূরে থাকলে আল্লাহ পাক তার অন্তরকে ঈমান ও আমান (নিরাপত্তা, শান্তি) দ্বারা পূর্ণ করেন। কেউ বেদআতী লোকদের প্রতি অশ্রদ্ধা রাখলে আল্লাহতা'লা তাকে পুনরুত্থান দিবসের ভীতি থেকে রক্ষা করেন**।"

কোনো মুসলমানের প্রাথমিক কাজ হলো আহল আস্ সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা-বিশ্বাস সঠিকভাবে শিক্ষা করা এবং তাঁর পরিবার-সদস্যবৃন্দ ও বন্ধুবান্ধবও যাতে তা শিখতে পারেন সেই লক্ষ্যে সাধ্যমতো চেষ্টা করা। তাঁরা যাতে আহল্ আস্ সুন্নাহ'র আকীদা-বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন, সে জন্যেও আল্লাহর কাছে তাঁর দোয়া করা উচিত। শয়তানী খেয়ালের লোকজন ও জ্বিন, বদমাইশ বন্ধুবান্ধব ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিকর লেখনী থেকেও তাঁর অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত।

মহানবী (দ:) একটি হাদীস শরীফে এরশাদ ফরমান, "**সেরা মানব হলো সে সব মুসলমান যারা আমার জমানায় (দুনিয়াতে) এসেছে; তাদের পরে যারা আসবে তারাই পরবর্তী শ্রেষ্ঠ; আর যারা তাদের পরে আসবে, তারাই হবে এর পরের শ্রেষ্ঠ মানব। অতঃপর মিথ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে**।" এই হাদীস শরীফ স্পষ্ট প্রতীয়মান করে যে মিথ্যে কথাবার্তা (মতবাদ), আচরণ ও কর্ম (আমল) ইসলামী তৃতীয় শতকের শেষদিকে আবির্ভূত হবে। মানুষজনকে আর বিশ্বাস করা যাবে না, কেননা তাদের মাঝে বেদআত ক্রমবর্ধমান হবে। ওই সময় আকীদা-বিশ্বাস ও আমল তথা অনুশীলনে সালাফ আস্ সালেহীনের পথ ও মত হতে এ ধরনের লোকেরা হয়ে পড়ে বিচ্যুত। তাসাউফের মহান মাশায়েখবৃন্দ ও ফেকাহবিদ ইমামমণ্ডলী যাঁরা ছিলেন মুসলমানদের কাছে বরেণ্য, তাঁরাই সালাফ আস্ সালেহীনের আদর্শকে প্রচার-প্রসার করেন।
'**তাতারখানিয়্যা**' শীর্ষক ফতোওয়ার গ্রন্থে লেখা আছে, "যে ব্যক্তি বলে সর্ব-হযরত উমর (রা:), উসমান (রা:) ও আলী (ক:) সাহাবা ছিলেন না, সে বেদআতী গোমরাহ'তে পরিণত হয়। কোনো একজন মাত্র রাবী (বর্ণনাকারী) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়াত তথা বর্ণনায় কেউ বিশ্বাস না করলে সে কাফের হবে না বটে, তবে বেদআতী হবে। কিন্তু কেউ যদি দাবি করে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা:) সাহাবী ছিলেন না, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে; কেননা সে (সংশ্লিষ্ট) আয়াতে করীমা অস্বীকার করবে।" '**যাহেরীয়্যা**' শীর্ষক ফতোওয়ার কেতাবে বলা হয়, "এ কথা সত্য যে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা:) বা হযরত উমর ফারূক (রা:)-এর খেলাফতের প্রতি যে ব্যক্তি অবিশ্বাস করবে, সে কাফের (অবিশ্বাসী) হয়ে যাবে। কেননা, তাঁদের মনোনয়নের সিদ্ধান্ত (সাহাবীদের) এজমা' তথা ঐকমত্যের ভিত্তিতে নেয়া হয়েছিল। [আহল্ আস্ সুন্নাহ'র মতে, এজমা' তথা ঐকমত্য একটি শরয়ী দলিল। যে ব্যক্তি এতে বিশ্বাস করে না, সে কাফেরে পরিণত হয়। যেহেতু খারেজী, শিয়া ও ওয়াহহাবীদের কাছে এজমা' কোনো শরয়ী দলিল নয়, সেহেতু তারা দাবি করে এজমা'র ভিত্তিতে গৃহীত কোনো বর্ণনায় কেউ অবিশ্বাস করলে সে কাফের হবে না। – আল্লামা হুসাইন হিলমী]

ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (রহ:) তাঁর বিখ্যাত '**রাদ্দুল মোহতার**' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে 'মুলহিদ' বিষয়ে লেখেন, "দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল অমুসলমান দেশবাসীকে বলা হয় '**যিম্মী**'। যিম্মীদের অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য বা দেশভ্রমণে আগত ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জান, মাল বা ইজ্জতের ক্ষতি সাধনের কোনো অনুমতি-ই আমাদের ধর্মে দেয়া হয়নি। মুসলমানদের মতো তাঁরাও একই স্বাধীনতা ভোগ করবেন। কিন্তু মুলহিদ ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। যে সব মুলহিদ মুসলমানদেরকে ধোকা দেয়, তাদেরকে তওবা করতে বলা হয়। তারা তাতে অস্বীকার করলে রাষ্ট্রপ্রধানের আদেশে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। আর যদি তারা তওবা করে, তাহলে তাদের অনুশোচনা গ্রহণ করা হয়। কুফরীর পর্যায়ে উপনীত নয় এমন বেদআতী লোকদেরকে প্রথমে উপদেশ দেয়া হয়। তারা তা অস্বীকার করলে এবং তওবা না করলে রাষ্ট্রপক্ষ তাদেরকে তা'যির (শাস্তি) দেয়। প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলে তাদেরকে কারাগারে আটক বা প্রহারের মাধ্যমে তওবা করতে বাধ্য করা হয়। কারাগারে আটক ও প্রহারের পরেও মুসলমানদের সাথে

ধোকাবাজিতে জড়িত মুলহিদদের নেতা যদি তওবা না করে, তাহলে রাষ্ট্রপক্ষ তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার এখতিয়ারপ্রাপ্ত। যদিও আহল্ আস্ সুন্নাহ'র মযহাব থেকে বিচ্যুতির মাধ্যমে লা-মযহাবী গোমরাহ বানানোর ও ফলশ্রুতিতে বেদআত প্রসারের অপচেষ্টাকারী ব্যক্তি কাফের (অবিশ্বাসী) হয় না, তবুও মানুষের মধ্যে ঐক্য ও শান্তি রক্ষার্থে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান রাষ্ট্রপক্ষের জন্যে অনুমতিপ্রাপ্ত।"

উপসংহার

রশীদ রেযার '**মুহাওয়ারাত**' শীর্ষক বইয়ের আদ্যোপান্ত পড়ে বোঝা যায়, সে কোনো সুদৃঢ় ঈমান বা যুক্তিসঙ্গত মতামতের অধিকারী নয়। আহল্ আস্ সুন্নাহ ও চার মযহাবের প্রতি কীভাবে কলঙ্ক লেপন করা যায় সেই উপায়ই সে খুঁজে বেড়িয়েছে এবং ঘুরে-ফিরে একই কথা বলেছে। তার ফ্রী-মেইসন গুরুর ধূর্ত নীতি অবলম্বন করে এবং নিজ মাতৃভাষা আরবীতে রচিত বইপত্র থেকে অযৌক্তিক উদাহরণসমূহ পেশ করে সে নিজেকে একজন ইসলামী পণ্ডিত হিসেবে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছে। আমাদের ধর্মীয় পদে অধিষ্ঠিত তরুণ বয়সী আলেম-উলেমা এবং নির্মল আত্মার সরল বিশ্বাসী মুসলমানবৃন্দ যাতে আহল্ আস্ সুন্নাহ'র এই ধূর্ত শত্রুর প্রচারিত মিথ্যে ও কুৎসায় বিশ্বাস না করেন, সে জন্যে আমরা এই বইটি প্রণয়ন করেছি।

সংক্ষেপে, '**ইসলামের এক শত্রুর প্রতি জবাব**' শিরোনামের এই বইটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা ব্যাখ্যা করা যে আহল্ আস্ সুন্নাহ'র চার মযহাবের নিয়মকানুন কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফ থেকেই বের করা হয়েছে। সমসাময়িককালে বিদ্যমান সমস্ত ফেকাহ'র কেতাবে এমন কোনো এজতেহাদ নেই যা হাদীসের খেলাফ। দৃশ্যতঃ একে অপরের বিরোধী চার মযহাবের এজতেহাদগুলোর মধ্যে কেবল একটি-ই সঠিক; তবু যাঁরা ভুল এজতেহাদের অনুসরণ করবেন, তাঁদেরকেও হাদীসের বাণী মোতাবেক সওয়াব দেয়া হবে। অতএব, চার মযহাবের ইমামবৃন্দ কর্তৃক ঐকমত্যের ভিত্তিতে বর্ণিত বিষয়গুলো পালন করা যেমন সহীহ (বৈধ) ও মকবুল (আল্লাহর কাছে গৃহীত), তেমনি তাঁরা যে সব বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন সেগুলো পালন করাও সহীহ ও মকবুল। তাই অ-মুজতাহিদ মুসলমানবৃন্দ চার মযহাবের যে কোনো একটিকে পছন্দ করে সেটির নিয়মকানুন অনুযায়ী নিজেদের সকল বিষয়ে আমল পালন করা একান্ত আবশ্যক; আর এতে তাঁদের দ্বারা ইমামুল মযহাবের দলিলের খোঁজ করার কোনো প্রয়োজন-ই নেই। কেননা, তাবেঈনদের মধ্যে নও-মুসলিমবৃন্দ সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর অনুসরণ করতেন প্রামাণিক দলিল তালাশ না করেই। প্রত্যেক মুসলমানের নিজস্ব পছন্দ করা মযহাবের নিয়মানুযায়ী আমল পালনের সময় তাঁকে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে তিনি আল-কুরঅান ও হাদীস শরীফকেই অনুসরণ করছেন।

আজকে আর কোনো (নতুন) মুজতাহিদের প্রয়োজন নেই। কারণ, ইসলামী শিক্ষাসমূহে কোনো কিছু আর অ-ব্যাখ্যাকৃত নেই। এই ধর্মে যোগ করার মতো কিছুই নেই, কারণ এই ধর্ম ইতোমধ্যে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রলয়দিবস পর্যন্ত যা ঘটবে তার বিধিবিধান মহানবী (দ:) কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে এবং আইম্মা-এ-মযাহিব কর্তৃক ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। মুজতাহিদ নন এমন আলেম-উলেমা দৈনন্দিন জীবনে সেগুলোর প্রয়োগ করতে সক্ষম। মোজাদ্দেদ (ধর্ম নবায়নকারী)-মণ্ডলী যাঁরা প্রতিটি শতকে আগমন করবেন, তাঁরা এ কাজ করতে সক্ষম; তবে যেহেতু এটি এখন আর

প্রয়োজনীয় নয়, সেহেতু তাঁরা আর এজতেহাদের মাধ্যমে নতুন আইনকানুন বের করবেন না। প্রতিটি হালাল, হারাম এবং শরয়ী দলিল-ই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বর্তমানে যাঁরা অনন্ত কল্যাণ লাভ করতে চান তাঁদের উচিত আহল্ আস্ সুন্নাহ'র আকীদা-বিশ্বাস সংক্ষেপে শিক্ষা করা এবং তাতে বিশ্বাস করা; অতঃপর নিজেদের কাছে সহজে পালনযোগ্য ও পছন্দনীয় চার মযহাবের কোনো একটির বইপত্র পড়ে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের এবাদত-বন্দেগী ও বৈষয়িক কাজকর্মে সেই অনুযায়ী অনুশীলন করা। প্রতিটি দেশেই মযহাবের শিক্ষাসমূহ প্রচারকারী প্রকৃত 'এলম-এ-হাল' বইপুস্তক সহজলভ্য। এই সুযোগটি উম্মতে মোহাম্মদীয়্যার প্রতি আল্লাহতা'লার খাস্ এক রহমত। মহান প্রভুর এই করুণার জন্যে তাঁর দরবারে অসংখ্য শোকরিয়া জানাই। তবে গোমরাহ লা-মযহাবী/'সালাফী' ধর্ম সংস্কারকদের এবং অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে কৃত অজ্ঞ বক্তা ও লেখকদের মিথ্যে কথাবার্তা ও লেখনীর ধোকায় যাতে আমরা পড়ে না যাই, সেদিকে আমাদের সতর্কদৃষ্টি রাখতে হবে।
আস্ সালামু আ'লা মান এত্তাবা'আল হুদা।